বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

নড়াইল

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

নড়াইল

প্রধান সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

নির্বাহী সম্পাদক
মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী
মো. রওশন আলী

সংগ্রাহক
সুরঞ্জন রায়
শামীমূল ইসলাম

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
নড়াইল

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২০/ জুন ২০১৩

বাএ ৫০৯৪

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০ কপি

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
কর্মসূচি পরিচালক
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
দুইশত ষাট টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SONSKRITI GRONTHAMALA : NARAIL (Present state of Folklore in Narail District). Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Executive Editor : Md. Altaf Hossain.. Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Subject Specialist : Professor Syed Jamil Ahmed, Dr. Firoz Mahmud, Shahida Khatun, Publication : *Lokojo Sonskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : April 2013. Price : Tk. 260.00 only. US$: 10

ISBN-984-07-5113-1

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমী তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখাপ্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমী থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমীর ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ,

www.pathagar.com

সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমীতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমী ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের

www.pathagar.com

ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যেসব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

www.pathagar.com

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।
৩. জেলা/উপজেলার নদনদী, পুকুরদিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।
৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষপার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।
৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।
৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাটবাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।
৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন্ শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।
খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।
গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।
ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।
ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।
চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।
ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।
জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন্ ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শকশ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/ মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

www.pathagar.com

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহি ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খালবিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন : গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান

www.pathagar.com

(সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাগুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মানিক পির (সাতক্ষীরা), পিরবাড়ি (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাটবাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহি), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহি), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ),

www.pathagar.com

ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), নড়াইলের কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ, নড়াইল, বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকাবাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহররমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস :** একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।**

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যেসমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান।

www.pathagar.com

২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যেসব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদনদী ও খালবিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছডি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকাবাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/সুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/ঝাঁকা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা সরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীর সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক, পরিকল্পনা উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব এ.কে.এম. মাহবুবুল আলম, প্রেস ব্যবস্থাপক সমীর কুমার সরকার ও ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান নড়াইল জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে নড়াইলের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ১-৪২

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল ১
খ. ভৌগোলিক অবস্থান ৩
গ. সামাজিক ইতিহাস ৫
ঘ. সাংস্কৃতিক ইতিহাস ৭
ঙ. সীমানা, শিক্ষার হার ও জনসংখ্যা ১১
চ. নদনদী ও খালবিল ১৩
ছ. ব্যবসা বাণিজ্য ও যাতায়াত ১৭
জ. প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদ ১৮
ঝ. ঐতিহাসিক স্থাপনা ২০
ঞ. হাটবাজার ২২
ট. মুক্তিযুদ্ধ ২৪
ঠ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৮

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ৪৩-৮৬

ক. লোকগল্প/কাহিনি//কিস্‌সা ৪৩
খ. কিংবদন্তি ৪৯
গ. লোকপুরাণ ৫৩
ঘ. লোককবিতা ৫৫
ঙ. ভাটকবিতা ৫৭
চ. লোকছড়া ৬৩
ছ. কবিগান ৭১
জ. পুথিসাহিত্য ও পুথিপাঠ ৮২

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ৮৭-৯৮

লোকশিল্প ৮৭
১. মৃৎশিল্প ৮৭
২. বাঁশ-বেতশিল্প ৯১
২. দারুশিল্প ৯৪
৪. পাখাশিল্প ৯৫
৫. নকশিকাঁথা ৯৫
৬. লক্ষ্মীর সরা ৯৭
৭. পটচিত্র ৯৭

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume & folk ornaments) ৯৯-১০০

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১০১-১০২

লোকসংগীত (folk song) ১০৩-১৬৮

১. সারিগান ১০৩
২. মেয়েলি গীত ১০৬
৩. বাউল গান ১১৪
৪. ধুয়োগান ১২৫
৫. বারাসে/বারোমাসি গান ১২৮
৬. ভাটিয়ালি ১৩০
৭. পল্লিগীতি ও আঞ্চলিক গান ১৩১
৮. অষ্টক গান ১৩২
৯. পটের গান ১৩৪
১০. হালুই গান ১৩৯
১১. তলই হরির লুট বা বাঁধুটি গান ১৪২
১২. বালা বা শ্লোক গান ১৪৪
১৩. হ্যাঁচড়া পূজার গান ১৪৫
১৪. কর্মসংগীত ও উৎসব-অনুষ্ঠানের গান ১৪৬
১৫. জারিগান ১৪৮
১৬. পালা কীর্তন ১৬৪
১৭. গাজির গান ১৬৪

লোকবাদ্যযন্ত্র ১৬৯-১৭২

লোকউৎসব (folk festival) ১৭৩-১৮৮

১. নবান্ন ১৭৩
২. চৈত্রসংক্রান্তি ১৭৪
৩. পৌষপার্বণ ১৭৫
৪. বৈশাখি মেলা ১৭৭
৫. হালখাতা ১৭৮
৬. অন্যান্য মেলা ১৭৯
৭. রথযাত্রা ও রথমেলা ১৮৩
৮. গাসসি উৎসব ১৮৪
৯. ওরস ১৮৬
১০. বিয়ে ১৮৬

আচার-অনুষ্ঠান ১৯৮-১৯৬

www.pathagar.com

লোকখাদ্য (folk food) ১৯৭-২০৬

১. পিঠাপুলি ১৯৯
২. বৈশাখি খাবার ২০০
৩. কার্তিক কুণ্ডুর ক্ষীরের চমচম ২০২

লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance) ২০৭-২১৬

ক. লোকনাট্য ২০৭
১. পালাগান ২০৭
২. রামায়ণ গান ২১০
৩. পদাবলী-কীর্তন গান ২১২
৪. লোকযাত্রা ২১৩
খ. লোকনৃত্য ২১৪

লোকক্রীড়া (folk games) ২১৭-২২৬

১. হাডুডু ২১৯
২. দাড়িয়াবান্ধা ও লাফ ২১৯
৩. গুলতাড়া ২১৯
৪. গুলি বা মার্বেল ২২০
৫. লাঠিখেলা ২২০
৬. ঘোড়দৌড় ২২১
৭ নৌকাবাইচ ২২১
৮. ষাঁড়ের বা এঁড়ে লড়াই ২২৩
৯. গোল্লাছুট ২২৩
১০. কুস্তি ২২৪
১১. ঘুড়ি উড়ানো ২২৪
১২. কানামাছি ২২৪
১৩. কুতকুত ২২৪
১৪. সাত ধাপ্পা ২২৫
১৫. পলাপলি ২২৫
১৬. সিন্দুর টোক্কাটুক্কি ২২৫
১৭. ঢাল সড়কি খেলা ২২৬

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ২২৭-২৩৪

১. চুনারি ২২৭
২. গাছি ২২৯
৩. বাদ্যকর ২৩১

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) ২৩৫-২৩৮
ক. কবিরাজি চিকিৎসা ২৩৬
খ. তন্ত্রমন্ত্র ২৩৭

ধাঁধা (riddle) ২৩৯-২৪২

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) ২৪৩-২৪৮

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) ২৪৯-২৫২

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ২৫৩-২৫৮

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল

সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সামাজিক প্রেক্ষাপট তথা প্রতিবেশগত বিবরণী নির্মাণে স্থান নামকরণের গুরুত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ, নামকরণের মাধ্যমে একটি এলাকার জনপদসমূহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রকাশ পায়। প্রাচীনকাল হতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামসমূহের নামকরণ স্থানীয়ভাবে কোনো নদনদী, কিংবদন্তি কিংবা কোনো অলৌকিক বিষয়কেন্দ্রিক অথবা জনপদে আগমনকারী প্রথম মানুষের নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিংবা ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে মিল রেখে স্থানের নামকরণ হয়। সুতরাং কালে কালে বৃহত্তর জনকল্যাণে মানুষের সংস্কার কার্যক্রমগুলিই ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড। তবে এ সকল নামকরণ খুঁজে পেতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনশ্রুতি কিংবা জনমতামতের উপর প্রায় শতভাগ নির্ভর হতে হয়। নড়াইল-এর নামকরণ নিয়েও বিভ্রাট কম নেই। কথিত আছে বাংলার সুবেদার আলীবর্দী খাঁ'র শাসনামলে প্রায় সর্বত্র পাঠান ও বর্গি বিদ্রোহীরা উৎপীড়ন শুরু করে। মুঘল বাহিনী তাদের সম্পূর্ণভাবে শায়েস্তা করতে ব্যর্থ হয়। ফলে দস্যুদের অত্যাচারী কর্মকাণ্ড আরও বৃদ্ধি পায় এবং সুবা বাংলার পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকায় পালাতে থাকে। সে সময় মদন গোপাল দত্ত নামে সুবাদারের এক কর্মচারী নড়াইলের রূপগঞ্জ এলাকার কিসমত কুড়িগ্রাম খালের মাঝ দিয়ে নৌকাযোগে সপরিবারে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি ঐ খালের মাঝে কচুরিপানার তৈরি শক্ত ধাপের উপর একজন ফকিরকে সামনে একটা নড়ি বা লাঠি পুঁতে রেখে যোগাসনে বসা দেখতে পান। বিষয়টি তাঁর কাছে অলৌকিক মনে হয় এবং তিনি ভক্তি ভরে ঐ ফকিরকে প্রণাম জানান। মদন গোপাল দত্তের ভক্তিরসে আপ্লুত ফকির নিজের নড়িখানা তাকে দান করেন। জনশ্রুতি আছে ঐ নড়িটি পাবার ফলেই মদন গোপাল দত্ত ক্রমাগত অর্থ-যশ-খ্যাতি ইত্যাদি পেয়ে প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে এলাকায় শ্রেষ্ঠ হন এবং এরই ধারাবাহিকতায় কুড়িগ্রামের একটা স্থান কিসমত-এর নামকরণ ফকিরের নড়ি বা লাঠির মর্যাদা সমুন্নত করতে নড়াল রাখা হয়। ক্রমে কিসমত নামকরণ বাতিল হয় এবং নড়াল বহুল প্রচলিত হয়। প্রাচীন আমলের জমাজমির দলিলে নড়াল নামটি পাওয়া যায়। কালক্রমে মদন গোপাল দত্তের পৌত্র রূপরাম দত্ত নড়ালের জমিদার হন এবং নড়ালের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য তিনিই সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধাবসত তিনি পূর্বপুরুষ কর্তৃক নামকরণকৃত 'সাধক ফকিরের' স্মৃতিস্বরূপ নড়াল নামকরণ স্থায়ী করেন। এক পর্যায়ে নীল বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে নড়ালে মহকুমা স্থাপনের আবশ্যকতা দেখা যায় এবং ইংরেজি ১৮৬৯ সালে ইংরেজ সরকার মহিষখোলা মৌজায় মহকুমার প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে। কালক্রমে ইংরেজ আমলেই নড়াল নড়াইল নামে খ্যাতি পায়। বর্তমানে তিনটি উপজেলা নিয়ে গঠিত হয়েছে এই জেলা।

www.pathagar.com

নড়াইল জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

নবগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত কালিয়া গ্রামটির নামে উপজেলার নাম হলেও কালিয়া নামটির সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হয় এ নামটি নদীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এক সময় কালিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে প্রবাহিত হওয়া কালিগঙ্গা নদীর পলিপড়া জমিতে যে জনবসতি গড়ে উঠেছিল তার নাম কালিয়া।[১] অর্থাৎ কালিগঙ্গার কালি-র পরে 'আ' প্রত্যয় যোগে হয়েছে কালিয়া। এরকম অনুমানই প্রসিদ্ধি পেয়েছে।

লোহাগড়ার নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। জনশ্রুতি রয়েছে বর্তমান লোহাগড়া থানার কাছে কুমারকান্দা মহল্লায় প্রাচীনকালে প্রচুর পরিমাণ লোহাগড়া নামে এক প্রকার ফুল পাওয়া যেতো। পাঠান আমলে মুসলিম প্রশাসকগণ জলদস্যুদের দমনের জন্য এ কুমারকান্দায় মধুমতি নবগঙ্গার ভাঙনস্থলে একটি ঘাঁটি স্থাপন করেন। তাঁদেরই উদ্যোগে এ এলাকায় লোহাগড়া ফুল গাছের জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে জনবসতির গোড়াপত্তন হয়। সে সময় থেকে এ এলাকার নামকরণ হয় লোহাগড়া। আবার জানা যায়, প্রাচীনকালে বর্তমান লোহাগড়ায় লৌহকরদের আবাস ছিল। এখানে অনেক উন্নতমানের লোহার জিনিসপত্র তৈরি করা হতো। তারা প্রাত্যহিক বিভিন্ন প্রকার লোহার জিনিস তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। এসব জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয়ের জন্য দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এখানে আসতো। সেই থেকে এ এলাকাটি লোহাগড়া নামে পরিচিতি পায়। আবার লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে, মুঘল আমলের শেষের দিকে ভূষণের রাজা সীতারাম এই লোহাগড়াতে লোহা দ্বারা একটি গড় নির্মাণ করেন। আর এ জন্যই এ লোকালয়টি লোহাগড়া নামে পরিচিতি লাভ করে। খাতা কলমে এলাকাটি লোহাগড়া হিসেবে লেখা হলেও স্থানীয় অনেকেই এলাকাটিকে লোহাগাড়া বলেন।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

নড়াইল ৯৯০.২৩ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ছোট জেলা। প্রায় ৮৯.৩১ দ্রাঘিমা এবং ২৩.১১ অক্ষাংশে ও কর্কটক্রান্তির দক্ষিণে অবস্থিত জেলার অবস্থান। জেলার উত্তরে মাগুরা জেলার শালিখা ও মহম্মদপুর থানা। পশ্চিমে যশোর জেলার বাঘারপাড়া ও অভয়নগর এবং যশোর সদর থানা। পূর্বে মধুমতি নদীর ওপারে গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর। দক্ষিণে খুলনা জেলার তেরখাদা, দিঘলিয়া থানা এবং বাগেরহাট জেলার মোল্লার হাট। লোহাগড়া, কালিয়া, নড়াইল সদর তিনটি উপজেলা ও নড়াগাতি নামে একটি পুলিশি থানা নিয়ে নড়াইল জেলা গঠিত।

১৮৬১ সালে গঠিত নড়াইল মহকুমা ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ জেলায় রূপান্তরিত হয়। ভূপ্রকৃতি অনুসারে নড়াইল জেলাকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়।

১. উত্তর-পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত উঁচুভূমি। সমগ্র নড়াইল সদর ও লোহাগড়া উপজেলার নলদী, কাশিপুর এবং লক্ষ্মীপাশা ইউনিয়নের উত্তর–পশ্চিমাংশ অঞ্চলের অন্তর্গত। চিত্রা ও নবগঙ্গা নদীর তীরে এ অঞ্চল অবস্থিত।

২. উত্তর এবং পূর্ব অঞ্চলের মধুমতি ও নলিয়া নদী তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ অপেক্ষাকৃত নিচু। লোহাগড়া উপজেলার অর্ধেকাংশ ও কালিয়া উপজেলার এবং নড়াগাতি থানার সমগ্র পূর্বভাগ এ অঞ্চলের অন্তর্গত।

www.pathagar.com

৩. আর আছে বিল অঞ্চল। জেলার বৃহত্তম বিল, বিল চাঁচুড়ী, পাটেশ্বরী বিল, ছিলিমপুর বিল, ইছামতি বিল, সলুয়া বিল ইত্যাদি। জেলার ভূমি দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বদিকে ঢালুর কারণে সমগ্র নদীগুলি দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব দিকে প্রবাহিত। মধুমতি, চিত্রা, নবগঙ্গা, কাজলা, নলিয়া, বানকানা (অধুনা মৃত) এবং মৃত কালিগঙ্গা নদী বেষ্টিত নড়াইল জেলা। প্রাকৃতিক নিয়মে নদীগুলি বার বার দিক পরিবর্তন করায় সৃষ্টি হয়েছে বিল-বাওড়-জলাশয় এবং নদীর তীরে গড়ে উঠেছে নতুন জনপদ। ভূগঠনের প্রক্রিয়া মধুমতি তীরবর্তী অঞ্চলে এখনও অব্যাহত আছে। মাটির স্তর বিবেচনা করলে দেখা যায়, উপরের স্তরে রয়েছে কাদা, পলিমাটি ও বালি। এ স্তরের গভীরতা হবে প্রায় ৪০ ফুট থেকে প্রায় ১৫০ ফুটের মতো। সমতল ভূমি গঠনের জন্যে নদীগুলোর বিশেষ অবদান আছে। নদীগুলোর মধ্যে মধুমতি, নবগঙ্গা, চিত্রা, নলিয়া, কালিগঙ্গা ও ঘোড়াখালী প্রধান।

কালিয়া উপজেলাটি যে স্থানে অবস্থিত সেটি বড় কালিয়া ও ছোট কালিয়া নামে দুটো মৌজায় বিভক্ত। কালিয়া উপজেলার আয়তন ৩১৭.৬৪ বর্গকিলোমিটার। এ উপজেলায় ১টি পৌরসভা ১৪টি ইউনিয়ন আছে। মৌজা সংখ্যা ১১১টি। আর গ্রাম আছে ২২৯টি। জনসংখ্যা ২০৮০২৪; পুরুষ ১০৫১৫৮, মহিলা ১০২৮৬৬। মুসলমান ১৬৯১৬০, হিন্দু ৩৮৮১১, বৌদ্ধ ৪৩, খ্রিষ্টান ০৫, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ১৪৮ ও অন্যান্য ০৫ জন।[২]

কালিয়া থানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ সালে। আর উপজেলায় রূপান্তরিত হয় ১৯৮৪ সালে (১৫ ডিসেম্বর)। জলবায়ু সমভাবাপন্ন।

লোহাগড়া উপজেলা জেলার পূর্বে অবস্থিত। নড়াইল জেলার ভূমি পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে ঢালু। নদীগুলি উত্তরের উজান থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। এখানকার মধুমতি ও নবগঙ্গা নদী অসংখ্যবার এক পাড় ভেঙেছে এবং অপর পাড় গড়েছে। পলি সমৃদ্ধ উপজেলার ভূমিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। উচ্চভূমি, সমতল ভূমি ও নিম্ন ভূমি। বৈশিষ্ট্য হলো ভূমিতে এক ফসল, দুই ফসল কিংবা তিনটি ফসল ফলে। গড়পড়তা ভূমির বৈশিষ্ট্য পলি সমৃদ্ধ উৎপাদনক্ষম। কৃষি কাজে প্রধানত ভূমি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে মৎস্য চাষের জন্য প্রচুর ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে ধান, পাট, বাদাম, নারিকেল, সুপারি, আখ, পান, রবিশস্য ইত্যাদি অন্যতম। অনেকেই এসব প্রাকৃতিক ক্ষেত্রসহ মৎস্য, পোলট্রিসহ বিভিন্ন খামারে শ্রম বিক্রি করছেন। এখানে কোনো শিল্পকারখানা নেই।

সমগ্র জেলার মাটির স্তর পরীক্ষা করলে বোঝা যায় উপরের স্তরে রয়েছে কাদা ও পলিমাটি। এছাড়া আছে শুষ্ক বালুমাটি। নড়াইল জেলার গড় তাপমাত্রা ৮৮.৮৩° ফারেনহাইট এবং গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬৮.৮৯° ফারেনহাইট। প্রচণ্ড গরম কিংবা প্রচণ্ড শীত কখনও অনুভূত হয় না। জলবায়ু সমভাবাপন্ন। শীতকাল শুষ্ক এবং আরামপ্রদ এবং গ্রীষ্মকাল আর্দ্র ও উষ্ণ ভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব বেশি থাকে এবং জলবায়ু আর্দ্র হয়। ফলে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত দেখা যায়। এছাড়া কালবৈশাখির সঙ্গেও প্রচুর বৃষ্টিপাত দেখা যায় যা শস্য ফসলের জন্য উপকারী। শীতকালে শুষ্কবায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হয় না। জেলার গড় আর্দ্রতা ৭৮% এবং গড়

www.pathagar.com

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৯৬.৫৬ ইঞ্চি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ২৫.৫৯ ইঞ্চি প্রায়। অবশ্য প্রকৃতির তারতম্য হেতু এ পরিমাণ কমবেশি হয়।

জেলার অধিকাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বনজ বৃক্ষ বর্তমানে যা পাওয়া যায় তা হলো : অশ্বত্থ, বটপাকুড়, শিরিষ, বাবলা, কালিবাবলা, কৃষ্ণচূড়া, মেহগনি, বকুল, শিমুল, রয়না, জিওল ইত্যাদি। ফলবান বৃক্ষের মাঝে আম, জাম, নারিকেল, সুপারি, তাল, তেঁতুল, করমোচা, বেল, লিচু, জামরুল, পেয়ারা, সবেদাফল, কুল, কলা, পেঁপে, ডালিম, আঁশফল, আতাফল, মেওয়াফল, চালতা, ডেওফল, দেশিকুল, কাঁঠাল ইত্যাদি দেখা যায়।

নড়াইল জেলায় জলজ, আকাশচারী, বন্যপ্রাণী, গৃহপালিত যে সকল প্রাণী দেখা যায় সেগুলি হচ্ছে পর্যায়ক্রমে : ১. কুমির, ২. কামোট, ৩. কচ্ছপ, ৪. ব্যাঙ, ৫. কাঁকড়া, ৬. সাপ, ৭. ভোদড়; মাছের মধ্যে রয়েছে : ১. শোল, ২. গজার, ৩. রুই, ৪. কাতল, ৫. পুঁটি, ৬. টেংরা, ৭. রয়না, ৮. শিং, ৯. মাগুর, ১০. খলিশা, ১১. টাকি, ১২. জিয়া, ১৩. ট্যাপা, ১৪. বাইন, ১৫. বিদেশি পুঁটি, ১৬. তেলাপিয়া, ১৭. সিলভার কার্প, ১৮. আমেরিকান রুই, ১৯. বেলে, ২০. চিংড়ি, ২১. কাল্লে, ২২. গুতে, ২৩. শুশুক (বিলুপ্তপ্রায় ডলফিন), ২৪. গাড়ো, ২৫. চ্যালা, ২৬. পাংগাশ, ২৭. মায়া, ২৮. দেশি সরপুঁটি, ২৯. ফলই, ৩০. চিতল, ৩১. মৃগেল, ৩২. তেলো টাকি, ৩৩. চাপিলা ইত্যাদি।

আকাশচারী অনেক প্রাণী কিছুদিন আগেও ছিল বলা যায়। কিন্তু এখন নেই। বর্তমানে দেখা যায়– ১. মাছরাঙা, ২. কাঁদাখোচা, ৩. লালচিল, ৪. গাংচিল, ৫. কাক, ৬. কুচিবক, ৭. ঢালিবক, ৮. কানা বক, ৯. পাতি বক, ১০. চড়ুই, ১১. বুনো কবুতর, ১২. দোয়েল, ১৩. শালিক, ১৪. শ্যামা, ১৫. বুনো কোকিল, ১৬. টুনটুনি, ১৭. বাদুড়, ১৮. বনটিয়া, ১৯. কাঠঠোকরা, ২০. বাবুই, ২১. ধনেশ, ২২. চাতক, ২৩. ফিংগে, ২৪. বউ কথা কউ, ২৫. বিশেষভাবে ২/১টা সারস দেখা যায়; বন্যপ্রাণীর মধ্যে রয়েছে : ১. গুইসাপ, ২. রামগতি, ৩. কাকলাস, ৪. কাঠবিড়াল, ৫. বনবিড়াল, ৬. বাঘডাশা, ৭. শিয়াল, ৮. বেজি, ৯. খরগোশ, ১০. খাটাস, ১১. ইঁদুর, ১২. সারেল, ১৩. শুকর, ১৪. বিষাক্ত সাপ প্রভৃতি।

গৃহপালিত প্রাণীর মাঝে দেখা যায় : ১. গরু, ২. ঘোড়া, ৩. মহিষ, ৪. ছাগল, ৫. বিড়াল, ৬. কুকুর এবং কিছু আকাশচারী পাখি।

গ. সামাজিক ইতিহাস

ভূতাত্ত্বিকদের মতে আনুমানিক ১০ লাখ বছর আগে গঙ্গানদী প্রবাহিত পলি, হিমালয় পর্বতমালা হতে বয়ে চলা ঝর্নাধারা ও পদ্মার পলিবাহিত উজানস্রোতে সৃষ্ট গাঙ্গেয় ব-দ্বীপসমূহের অন্যতম অংশ দক্ষিণবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ ভূখণ্ডের একটি অঞ্চলের জনপদ হলো নড়াইল। এক সময়ে সমগ্র নড়াইল জেলা, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, গোপালগঞ্জ অঞ্চলের অতি নিকটে সুন্দরবন অবস্থিত ছিল। ৭০-৮০ বছর আগে কোথায়ও কোথায়ও পুকুর খননকালে সুন্দর বনাঞ্চলের সুন্দরী-গরান গাছ কিংবা বাঘ-হরিণের

www.pathagar.com

দেহাবশেষ পাওয়া যেতো, বর্তমানেও পাওয়া যায়। সে কারণে সহজে অনুমান করা যায়—এ অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনভূমি বিদ্যমান ছিল।

এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর কোনো পৃথক নৃতাত্ত্বিক সত্তা আছে বলে মনে হয় না। বহুকাল ধরে এ সকল জনগোষ্ঠী বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে।

নদীনালা, বৃক্ষ সম্পদ, উর্বর ভূমি সমৃদ্ধ নড়াইলের জীবন-জীবিকা অত্যন্ত সহজ বলেই বহু প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে জনপদ গড়ে উঠেছে। নড়াইল উপজেলার মোট অধিবাসীর ৭৪ ভাগ মুসলমান এবং ২৬ ভাগ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মোগো, আদিবাসী বা বুনো সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। মুসলমানদের মাঝে কারিগর বা জোলা, দাই, হাজাম, বাজনদার, বাউতি, কাহার বা বেহারা, কলু, বেদে বা বেপারি সম্প্রদায়ের কিছু লোক আছে। উপজেলার বিভিন্ন প্রান্তে এ সকল লোক দেখা যায়। হিন্দুদের মাঝে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কুমার, চামার, বৈশ্য, নমশূদ্র, ধোপা, পরামানিক, কাপালি, সাহা, মুচি, বাগদি, জেলে, মালো, কড়াল, স্বর্ণকার, সূত্রধর, পাটনি, বুনো বা সর্দার, মালি, কুণ্ডু, মেথর, কামার বা কর্মকার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে।

চিত্রা, কাজলা ও আফ্রা নদীর তীরে নড়াইল উপজেলা গড়ে উঠেছে। নদী তীরের মানুষগুলি স্বাভাবিকভাবে সংগ্রামী প্রকৃতির হয়। নদীভাঙন ও চরজাগা জমাজমি দখলকে কেন্দ্র করে অতীতকাল হতে নদী তীরবর্তী মানুষগুলির মাঝে খুনজখম মারামারি নৈমিত্তিক ব্যাপার হিসেবে লক্ষ করা যায়। তবে বর্তমান সময় পারস্পরিক বিরোধের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন এসেছে। কারণ, উপজেলার পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীগুলি বর্তমানে মৃতপ্রায় হওয়ার কারণে স্রোতপ্রবাহ ক্ষীণতর হয়েছে এবং নদী তীরবর্তী জনপদগুলি এখন আর ভাঙনের কবলে পড়ছে না। বরং দেখা যায় কিছু কিছু জায়গায় নদীর মাঝে চর জেগেছে এবং ধান উৎপন্ন হচ্ছে।

নড়াইলে বিচিত্র স্বভাব ধরনের লোক দেখা যায়। কারণ নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষকগণ মনে করেন অস্ট্রিক নরগোষ্ঠী থেকে বাঙালিদের বড় অংশের উদ্ভব। প্রাচীনকালে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে এ বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং পূর্ববর্তী নেগ্রিটোদের উৎখাত করে। এরা কোল-ভীল সাঁওতাল, মুণ্ডাহো প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত। বাঙালির রক্তে এদের প্রভাব আজও বিদ্যমান। বাংলার সংস্কৃতি ও শব্দভাণ্ডারে এদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। অনেকাংশে উন্নত সভ্যজাতি হিসেবে পরিচিত দ্রাবিড় জাতি এর কিছুকাল পর বাংলায় আসে এবং অস্ট্রিকদের পরাভূত করে। বাঙালির চেহারা ও ভাষায় দ্রাবিড় রক্তধারার প্রভাব বিদ্যমান। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে অসংখ্য পাঠান, জীবন-জীবিকার তাগিদে বাংলামুখী হয়। দিল্লিতে সুলতানি শাসনের অবসানে মুঘলবিরোধী পাঠান বীরেরা দলে দলে বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন বাংলা পাঠান মুসলমানদের আড্ডায় পরিণত হয়েছিল।

অষ্টম শতাব্দীর পর আরবরা ইসলাম প্রচারে ও বাণিজ্য প্রসারে বাঙালি জাতির সংস্পর্শে আসে এবং দুটি জাতির রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে। এভাবে প্রায় দেড় হাজার বছরের বর্জন ও গ্রহণের ধারাবাহিকতায় বর্তমান জনগোষ্ঠীতে রূপলাভ করেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ লগ্নে এসে এখনও নড়াইলে কোনো বড় মাপের শিল্প কলকারখানা গড়ে ওঠেনি। ধান ছাঁটাইকল, যান্ত্রিক ঘানি বা তেলকল, যব-গম-মুগ-মুসুরি

www.pathagar.com

ছাঁটাইকল, মশলা ভাঙানো কল, করাতকল, বরফকল ইত্যাদি নড়াইলের অন্যতম কলকারখানা।

মূলত কৃষি ও জমাজমি চাষাবাদ করাই অধিকাংশ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন। অর্থাৎ জমাজমি ও কৃষিকে কেন্দ্র করেই জনমানস প্রাচীনকাল হতে আবর্তিত। এক সময় একই গ্রামের পাড়ায়-পাড়ায় ছিল সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গ—যাঁদেরকে মাতব্বর নামে ডাকা হতো, তারাই স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং বিরোধ মীমাংসা করতেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধাভক্তি হেতু সামাজিক শৃঙ্খলা ছিল সুন্দর ও মার্জিত এবং সামাজিক আইন ছিল কঠিন। বিশেষ করে মাতব্বরগণ ছিলেন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ। মাতব্বরি ছিল বংশানুক্রমিক। এক্ষেত্রে মহল্লা বা গ্রামের অন্য কোনো লোক মাতব্বরি পদ নেবার আগ্রহী হলে তাঁকে গ্রামবাসী তরফের সকল লোককে ভূরিভোজ দিয়ে মাতব্বরি পদবি গ্রহণ করতে হতো। সমাজে প্রচলিত পূর্ববর্তী ধারা প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে মাতব্বরি কোনো বংশানুক্রমিক বিষয় নয়ই। জনশক্তি সম্পন্ন বংশের লোক অর্থাৎ যার অর্থ আছে সেই-ই গ্রামের মান্যজন কিংবা মাতব্বর। তাতে তার সততা, ন্যায়পরায়ণতার প্রশ্ন অর্থহীন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনায় বা দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রামের মাতব্বর নির্বাচিত হন। যোগ্যতা এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় নয়। দলীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ যথা : সংসদ সদস্য, জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের নেতা, কিংবা ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক কৃপা দৃষ্টিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ সরকারি দলের ছত্রছায়ায় গ্রামাঞ্চলে বর্তমান সময় মাতব্বরি করে থাকেন। পূর্বেকার যৌথ একান্নবর্তী পরিবার প্রথা বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে গেছে। সামগ্রিক শান্তির চিন্তা না করে বর্তমান মানুষ স্বার্থপরের মতো স্ত্রীপুত্র নিয়ে আলাদাভাবে যৌগিক সুখ সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে এতবেশি তৎপর যে, পিতামাতার জীবদ্দশায় তারা সকল সেতুবন্ধনকে অবহেলা করে পৃথক সংসারে বসবাসের ব্যবস্থা নিচ্ছে। চাকরিজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যবসায়িক প্রসার, নগরায়নের প্রতিযোগিতায় অপরিকল্পিতভাবে শহর গড়ে উঠার কারণে ক্ষুদ্র পরিবারকেই মানুষ আদর্শ বিবেচনা করছে। উদার মানসিকতা, সহমর্মী-মনোভাবে পরিবর্তন হয়ে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থসর্বস্ব মনোবৃত্তির প্রসার দ্রুততর হচ্ছে।

বিনোদনের রঙিন ভুবন তৈরি এবং নবতর বিলাস সামগ্রীর উদ্ভাবন মানুষের মনোজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। জীবনকে যথেষ্ট উপভোগের প্রতিযোগিতা সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে সমানভাবে সংক্রমিত হচ্ছে।

ঘ. সাংস্কৃতিক ইতিহাস

আবার মানুষের মনোজগতে আরেক সৃষ্টির লীলা চলেছে ও চলছে, তার চিন্তাধারা, জ্ঞানবুদ্ধি বিচার-বিবেচনা, কল্পনা-অনুভূতির প্রকাশ নানাভাবে প্রতিফলিত হয় শিল্পলোকে; সৃষ্টিকলায়। প্রথমটি ব্যবহারিক জীবন ব্যবস্থায় সহায়ক বস্তু উপকরণ, দ্বিতীয়টি অন্তর্লোকের উৎকর্ষ বিধায়ক মানস-উপকরণ। অর্থাৎ সংস্কৃতি জীবন সম্পৃক্ত, বস্তুসংলগ্ন ও মানস সম্ভূত। সংস্কৃতি হলো জীবনযাত্রার নিয়মপদ্ধতি। যথা : আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, উৎসব অনুষ্ঠান ধর্মকর্ম, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষাদীক্ষা, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত

www.pathagar.com

জীবনযাপনের যাবতীয় বস্তু ও উপকরণ যথা- ঘরবাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, অলংকার ইত্যাদি। তৃতীয়ত মানস ফসল যথা- সাহিত্য-সংগীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য ভাস্কর্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি। এতো সব মিলেই সংস্কৃতি। গণমানুষের একক প্রকাশের জন্য 'লোক' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যদিও বিবর্তনের মাঝে জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ অন্য অংশকে নাগরিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি বহির্ভূত অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত, বিশ্বাসপ্রবণ, প্রাচীন সংস্কার ও প্রথাচালিত জনসমষ্টিকে 'লোক' শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করে। তবুও তাবৎ নিম্নবর্ণের জনগণের জীবনাচরণই লোকসংস্কৃতির অংশ। মূলত লোক-সংস্কৃতিই জাতীয় সংস্কৃতির শেকড়। সংস্কৃতির বিভাজন জাতির ঐতিহ্যমণ্ডিত কর্মকাণ্ড সমূহকে বিলুপ্তির যাত্রাপথে নিয়ে এসেছে। সংস্কৃতি হলো চিৎপ্রকর্ষের জাগতিক ও বাহ্যিক কর্মসমষ্টি। এগুলি জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্নতর বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হয়। প্রকটিত হয় যথা- সংগীত, চিত্রকলা, ক্রীড়া এবং নৈমিত্তিক জীবনাচরণ ও জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় উপাদান উপকরণের মাঝে। পৃথিবীর অন্য জনপদের ন্যায় বাংলাদেশেও সাংস্কৃতিক পদযাত্রা একইভাবে শুরু হয়েছে। বাংলা ভূখণ্ডের প্রাচীন জনপদ হিসেবে নড়াইলেও এর ব্যত্যয় দেখা যায় না।

সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ যথা- ক্রীড়া, সাহিত্য, সংগীত ও লোকঐতিহ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহের বিবেচনায় বিশেষ করে ক্রীড়া ও লোকসংগীতের ক্ষেত্রে নড়াইলের অবস্থান ঈর্ষণীয় পর্যায়ে বলা যায়। পর্যায়ক্রমিক আলোচনায় প্রথমে ক্রীড়া বিষয়কে তুলে আনবো।

ফুটবল দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। দেশবিভাগের আগে লোহাগড়া ও কালিয়া উপজেলায় বিখ্যাত ফুটবল তারকার খোঁজ পাওয়া যায়। তবে দেশবিভাগের পরবর্তী সময়ে মনিরুজ্জামান (চুনখোলা- সিংগাশোলপুর), আলতাফ হোসেন (মির্জাপুর-বিছালী), নকুল বিশ্বাস (বড়কুলা-সিংগাশোলপুর), গোরা মিঞা (মির্জাপুর-বিছালী), আজিবর রহমান (বাঁশগ্রাম) প্রমুখ জননন্দিত ফুটবলারগণ ফুটবলকে এলাকায় আরও জনপ্রিয় পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন।[৩]

ক্রিকেট বর্তমান সময় বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় খেলা। বাংলাদেশ ক্রিকেটের অবস্থানও বিশ্ব আসরে নন্দিত পর্যায়ে। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলার নড়াইল এক্সপ্রেস নামে খ্যাত মাশরাফি-বিন-মোর্তজা কৌশিক নড়াইল উপজেলার বাসিন্দা।

টেবিল টেনিসের ক্ষেত্রে নড়াইল উপজেলা গৌরবময় অধ্যায়ের ধারক। খন্দকার আল-মোস্তফা বিল্লাহর ১৯৯১ সালে সাফ গেমস-এ অভিষেক। ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিসে অংশগ্রহণ এবং এশিয়ান টেবিল টেনিসের খেলায় অংশগ্রহণ। খন্দকার আল-মাহাবুব বিল্লাহ ২০০০ সালের আন্তর্জাতিক দলগত টেবিল টেনিসে অংশগ্রহণ (মালয়েশিয়া) ও ২০০০ সালের (কাতার) এশিয়া টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেন। এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ ১৯৯৬ (সিঙ্গাপুর) এ অংশগ্রহণ। সাফ গেমস এর জন্য চিনে ১৯৯৩ সালে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। এছাড়া চিন, কোরিয়া, জাপান, ইন্ডিয়ান প্রশিক্ষকের অধীনে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত (১৯৯১)। টেবিল টেনিস খেলতে চিন, ইন্ডিয়া, নেপাল, ইরান, কাতার, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করেন।[৪]

www.pathagar.com

লোকখেলার মাঝে হাডুডু, কুস্তি, বুড়িচি, লাঠিখেলা, গোল্লাছুট, ঢাল সড়কি খেলা, আচাখুটি, লুডু, পলাপলি (লুকোচুরি) চাড়াগুট ইত্যাদি খেলা আছে। সংগীতের বিভিন্ন শাখা বিশেষ করে লোকসংগীতের ক্ষেত্রে উপজেলার অবস্থান মর্যাদাপূর্ণ। বিখ্যাত কবিয়াল ভাটিয়ালি গীত সম্রাট বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী বা বিজয় সরকার এবং জারিসম্রাট চারণকবি মোসলেম উদ্দিন নড়াইলের লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

এছাড়া জারিগানের প্রখ্যাত শিল্পী গোলাম কিবরিয়া, আকরাম হোসেন, মোবারক বয়াতি, ফজর বিশ্বাস এবং কবিগানের রওশন আলী শুকদেব সরকার, বিনোদ সরকার, সমীরণ সরকার লোকজ সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় অবদান রেখেছেন।[৫] লোকজীবনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে হিন্দু রমণীদের মাঝে প্রাচীনকাল হতে সংগীতের চর্চা দেখা যায়। তবে মুসলিম রমণীদের মাঝে সংগীতের চর্চা খুব বেশি জায়গা করে নিতে পারেনি কেবল ধর্মীয় বিধিনিষেধের জন্য। তবু লোকজীবনে বিয়ের গীত সকল শ্রেণির মেয়েরাই গেয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন পূজাপার্বণে হিন্দু রমণীগণ নানাবিধ গান পরিবেশন করেন। তবে বর্তমান সময়ে হিন্দু মুসলিম উভয় শ্রেণির মেয়েরা লোকসংগীত, নজরুলসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, আধুনিক সংগীতসহ নৃত্য শিক্ষা গ্রহণে খুব বেশি উৎসাহী হয়েছে বলে লক্ষ করা যায়।

নড়াইলে সবচেয়ে জনপ্রিয় গান হলো জারিগান এবং কবিগান। তাছাড়া পদাবলি কীর্তন, ভাবগান, ভাটিয়ালি, ধুয়ো, বারাসিয়া, হালুই, অষ্টক, পটগান, গাজির গান, সারিগান, রামায়ণ, নামযজ্ঞ, হরিসংগীত, ত্রিনাথের ভজন প্রায়শই গীত হতে দেখা যায়। যাত্রাগান নিকট অতীতে খুব প্রচলিত ছিল এবং নড়াইলে ৩-৪টা যাত্রাদল ছিল। কিন্তু যাত্রাশিল্পের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করায় যাত্রাশিল্পের সঙ্গে জড়িত অভিনেতা, অভিনেত্রীগণ জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে পেশা পরিবর্তন করে নিজেদেরকে অন্যত্র নিয়োজিত করেছেন। তবে নড়াইল শহরে চিত্রা থিয়েটার, গ্রেভ শিল্পীগোষ্ঠী, মূর্ছনা সংগীত একাডেমীসহ কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে বছরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাটক করতে দেখা যায় এবং অতি সম্প্রতি কোথায়ও কোথায়ও গ্রামীণ জনপদে সখের বসে ২/১ রাত যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে শিল্পীরা কেউ পেশাদার শিল্পী নন। ধর্মীয় প্রভাবে হিন্দু রমণীগণ জাগরণের গান, মানতের গান, কুলোস্নানের গান, অ্যাচড়া পুজোর গানসহ শুভ চণ্ডির ব্রত, খাড়াপুলির ব্রত, লক্ষ্মীর ব্রত, বৈঠাকুলির ব্রত প্রভৃতি ব্রত পালনে সংগীত পরিবেশন করেন।[৬]

ভাস্কর্য ও অলংকার শিল্পে বৈচিত্র্যময় বিবর্তন নড়াইলে লক্ষণীয়। নড়াইল জমিদার বাড়ির বিভিন্ন প্রাসাদ বা দালানকোঠার দরজার কাঠে নকশা করার ক্ষেত্রে উঁচুমূল্য মানের কাঠের ভাস্কর্য আজও প্রাচীন ঐতিহ্যের এবং সাংস্কৃতিক রুচিবোধের পরিচয় বহন করে। জমিদার বাড়ির মন্দির ও শেখহাটি বিজয়তলা মন্দিরের কষ্ঠিপাথরে নির্মিত বিগ্রহ (বর্তমান রাজশাহির বরেন্দ্র সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত) দেশের প্রত্নসম্পদ হিসেবে মর্যাদার দাবিদার। রামরতন রায়-এর জমিদারির সময়কালে নীলচাষ এ অঞ্চলে মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এলাকার বিভিন্ন জায়গায় নীলকর সাহেবদের কুঠিবাড়ি নির্মিত হয় এবং প্রত্নসম্পদে নীলকুঠিও একটা মর্যাদার অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত।

দেবদেবী, ফুলপাখি, প্রাকৃতিক বিচিত্র দৃশ্য কিংবা নৈসর্গিক মনোহর চিত্রের কারুকাজ ও নানাবিধ নকশা অঙ্কিত অলংকার প্রাচীনকাল হতে হিন্দু মুসলিম উভয়

www.pathagar.com

শ্রেণির রমণীগণ ব্যবহার করে আসছেন। যেমন- পায়ের মল, খোপার কাঁটা, কামরাঙা হার, ঝুমকোপাশা, কোমরবিছা, সিঁথিপাটি, টিকলি, ঝুরচুড়ি ইত্যাদি। তবে ইদানীং মেয়েদের নানাবিধ ইমিটেশনের চোখ ধাঁধানো অলংকার ব্যবহার করতে দেখা যায়।

চিত্রশিল্পে বিশ্ব দরবারে নড়াইলের অবস্থান বর্তমানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে। আন্তর্জাতিকভাবে বরেণ্য চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতান লালমিয়া সদর উপজেলার পৌরসভার অন্তর্গত মাছিমদিয়া গ্রামে জন্ম নিয়ে বেড়ে উঠেছেন। গদবাধা শিক্ষার প্রতি সুলতানের আগ্রহের ঘাটতি শিশুবেলা হতে লক্ষ করা যায়। সুলতানই বোধহয় একমাত্র শিল্পী যিনি আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও সর্বপ্রথম কলকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ লাভ করেন এবং তিনি তার প্রতি প্রতিষ্ঠানসহ পরিচালকদের সহানুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে কার্পণ্য করেননি।[৭]

রিয়েলিস্টিক শিল্পী হিসেবে আন্তর্জাতিক বিশ্বে সুলতানের সমাদর চরম ও পরম পর্যায়ে রয়েছে। সুলতান তাঁর চিত্রে সুন্দর ও সত্যের প্রতীক হিসেবে নির্লোভ, নির্মোহ, শিশুদের প্রতীকী রূপে চিত্রিত করেছেন। তিনি তাঁর জাতিকে দেখতে চেয়েছেন আত্মনির্ভরশীল কর্মঠ ও স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে। তাইতো শক্তি ও সাফল্যের প্রকাশকে তিনি তাঁর চিত্রে পেশিবহুল করেছেন। শিশুর কলকুজনে ভরা পবিত্র ও বাসযোগ্য নির্মল পৃথিবীই সুলতানের স্বপ্নের পৃথিবী। তাইতো সুলতান সৃষ্টি করেছেন শিশুস্বর্গ, কোমলমতি শিশুদের হৃদয়বৃত্তি চর্চার মাধ্যমে চিত্তবিনোদন ও চিত্র অঙ্কন ও বিবিধ নন্দন শিল্পের প্রতি শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টির আনুষ্ঠানিক শিক্ষা "শিশু স্বর্গে" প্রদান করা হয়। বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের বড় রকম আর্থিক আনুকূল্য এবং স্থানীয় দাতাদের আর্থিক সহায়তায় নড়াইলে এস. এম. সুলতান আর্ট কলেজ ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুলতানের শিষ্য প্রশিষ্যদের মাঝে আর্ট বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা এর শিক্ষক বিমানেশ চন্দ্র বিশ্বাস এবং দুলাল চন্দ্র সাহা, সমীর মজুমদার, কাজল মুখার্জি, বলদেব অধিকারী, নিখিল চন্দ্রের নাম অন্যতম এবং এরা সবাই নড়াইলের লোক।[৭]

ধর্ম মানুষের প্রাণের আবেগে চর্চিত কর্মসমষ্টি। সুতরাং ধর্মীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশেষ দিনগুলি নির্দিষ্ট জনপদের ধর্মানুসারী মানুষগুলির মাঝে নিত্য জীবনাঙ্গিনায় অতি আবশ্যকীয় কার্যের তালিকায় থাকে বলেই পৃথিবীর সকল দেশে সকল কালে ধর্মীয় উৎসব আনন্দ বৈচিত্র্যময় ভাবেই অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। নড়াইলের কোমলমতি ভাবুক হৃদয়ের মানুষগুলির মাঝেও ধর্মীয় নির্মল চেতনা বর্তমান থাকায় উৎসব আনন্দে তাদের বিমুগ্ধ হতে দেখা যায়। এখানে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে শারদীয় দুর্গোৎসব, কালিপূজা, বাসন্তিপূজা, জগন্নাথপূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠান সর্বজনীন উৎসব মুখরভাবে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মাঝে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, শব-ই-বরাত, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী এবং কিছু কিছু অঞ্চলে আশুরার উৎসব জোরেসোরে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এছাড়া প্রাচীনকাল হতে ধর্ম সংক্রান্ত মেলাগুলি যথা- কোরানখানি বা তাফছির মাহফিল, ওয়াজ মাহফিল, ওরস বা ইছালে ছওয়াব এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে নামযজ্ঞ, মহোৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি সারা বছরই এলাকার মানুষের মাঝে উদ্‌যাপিত হয়।[৮]

www.pathagar.com

বিবর্তনের ধারায় অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষের চেতনার মাঝে লৌকিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির স্রোতধারা প্রবহমান থাকলেও নগরসংস্কৃতি ও আকাশ সংস্থার প্রভাব থেকে মুক্ত নয় এ অঞ্চলের মানুষও।

ঙ. সীমানা, শিক্ষার হার ও জনসংখ্যা

নড়াইল সদর উপজেলার সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যা

নড়াইল সদর উপজেলার মানচিত্রে মোট ১৩টি ইউনিয়ন এবং ১টি পৌরসভা আছে। ইউনিয়ন পরিষদগুলি হল– ১. আউড়িয়া, ২. ভদ্রবিলা, ৩. বাঁশগ্রাম, ৪. চণ্ডিবরপুর, ৫. মুলিয়া, ৬. সিংগাশোলপুর, ৭. বিছালী, ৮. কলোড়া, ৯. শাহাবাদ, ১০. হবখালী, ১১. মাইজপাড়া, ১২. তুলারামপুর এবং নড়াইল পৌরসভা নামে একটি পৌরসভা নড়াইলে আছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে ১৮৬১ সালে নড়াইল থানার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৪ সালে তা উপজেলায় রূপান্তরিত হয়। নব্বই-এর দশকে পুনরায় উপজেলা নামকরণ বিলুপ্ত হয় এবং থানা নামকরণ হয়। ১৯৯৮ সালে আবারও থানাগুলিকে উপজেলা নামকরণে রূপান্তরিত করা হয়।

নড়াইল সদর উপজেলার আয়তন ৩৮১.৫৬ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে লোহাগড়া ও শালিখা উপজেলা, দক্ষিণে কালিয়া ও অভয়নগর উপজেলা, পূর্বে লোহাগড়া উপজেলা এবং পশ্চিমে বাঘারপাড়া ও যশোর সদর উপজেলা।

শিক্ষার হার

শিক্ষার গড় হার : ৪৫.২৪%। পুরুষ শিক্ষার হার : ৫৪.৪%। মহিলা শিক্ষার হার : ৫০.২%।[৯]

জনসংখ্যা

উপজেলার জনসংখ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শত বিপদেও নিজের এলাকায় অবস্থান করা এবং পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্প্রীতির মাঝে বেঁচে থাকা। মানুষগুলি তুলনামূলক অলস ও ঘরকুনো প্রকৃতির। পেশার ভিত্তিতে জনগণের তালিকা প্রদান করা হলো। যথা– কৃষি ৫৩.৩৯%, মৎস্য ২.০৪%, কৃষি শ্রমিক ১৮.১৮%, অকৃষি শ্রমিক ২.১৮%, পরিবহণ শ্রমিক ২.৭%, শিল্প ১.১৯%, চাকরি ৬.২৭%, ব্যবসা ৮.০৮%, অন্যান্য ৫.৯৭%।[১০]

কালিয়া উপজেলার সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যা

কালিয়া উপজেলার আয়তন ৩১৭.৬৪ বর্গকিলোমিটার। অবস্থান : ২২°৫৭- ২৩°০৭ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৮৯°৩০- ৮৯°৪৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা : উত্তরে নড়াইল সদর ও লোহাগড়া উপজেলা, দক্ষিণে তেরখাদা, মোল্লাহাট ও দিঘলিয়া উপজেলা, পূর্বে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা, পশ্চিমে অভয়নগর উপজেলা ও নড়াইল সদর উপজেলা অবস্থিত।

www.pathagar.com

শিক্ষার হার : গড় হার ৪৬.০৪%, পুরুষ ৪৮.৫%, মহিলা ৪৪.৫৮%। পৌরসভায় শিক্ষার হার ৫০%।

কালিয়া উপজেলার মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ ছিল ১২টি। পরবর্তী কালে একটি বেড়ে ১৩টি হয়। সাম্প্রতিক কালে আরও একটি ইউনিয়নের সৃষ্টি হওয়ায় বর্তমান সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪টি। ইউনিয়ন পরিষদগুলো হলো : বাবরা-হাচলা ইউনিয়ন পরিষদ, পুরুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, বেন্দা ইউনিয়ন পরিষদ (বর্তমান নাম হয়েছে হামিদপুর ইউনিয়ন পরিষদ), মাউলি ইউনিয়ন পরিষদ, সালামাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ (আগের নাম ছিল কালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ), খাশিয়াল ইউনিয়ন পরিষদ, জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদ, কলাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, বাঐসোনা ইউনিয়ন পরিষদ, পহরডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ, পেড়োলী ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁচুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ, বড়নাল ইলিয়াসাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ, পাঁচগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ।

জনসংখ্যা ও জনবসতি

কালিয়া উপজেলার আপামর জনগণের মানবিক বৈশিষ্ট্য এক বাক্যে বলা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা যায় বহু সম্প্রদায়ের মানুষ এ অঞ্চলে বসবাস করলেও তাদের মধ্যে সম্প্রীতি অটুট আছে। একে অপরের বিপদাপদে সাহায্য করে। এক সময় কথায় কথায় ছোটোখাটো ঝগড়ায়ও ঢাল সড়কি নিয়ে লাফিয়ে পড়তো। এখনকার দিনে সেই প্রবণতা যথেষ্ট পরিমাণে কমে গেছে। এর কারণ শিক্ষা। এক সময় হিন্দু-মুসলমানের যে কাজে (মারামারি) হয়েছিল তাতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ কিছু মানুষের অকাল প্রয়াণ ঘটে। এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে উভয় সম্প্রদায় মিলেমিশে বসবাস করছে। তবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে হিন্দু জনসমষ্টিকে মাঝে মাঝে হেনস্তা হতে হচ্ছে। বিষয়টি এমন পর্যায়ে গেছে যে, কোনো কোনো অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিরুপায় হয়ে দেশত্যাগী হচ্ছে।

এ উপজেলার লোকেরা জীবন ধারণের তাগিদে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। এই পেশার ভিত্তিতে এ উপজেলার জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যান হলো : কৃষিকাজে নিয়োজিত আছেন প্রায় ৪৩.৬৪%, মাছ ধরা, বিক্রি, চাষের কাজে আছেন ২.৪৮%, কৃষি শ্রমিক ১৯.৩৯%, অকৃষি শ্রমিক ২.১৫%, শিল্পে ১.৫৭%, চাকরিজীবী প্রায় ৬৬.৯৮%, পরিবহণে আছেন ২.০২%, ব্যবসায় নিযুক্ত আছেন ১৩.৪২% ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত আছেন প্রায় ৮.৩৫%।

কালিয়া উপজেলার এইসব মানুষ প্রাচীনকাল থেকে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করছেন। গ্রামগুলো কখনো গায়ে গায়ে লেগে আছে, কখনো নদী বা খাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। শুরুতে বাড়িগুলো ছিল ফাঁকা ফাঁকা ছোটো ছোটো টিলার মতো। বংশবৃদ্ধির ফলে যেমন ঘর বৃদ্ধি হয়েছে, তেমনি মাঝে মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে বাড়ির পাশে তৈরি হয়েছে নতুন বাড়ি। এ বাড়ির ঘরগুলো তৈরি হয়েছিল কাঁচা পোঁতার উপরে বাঁশ দিয়ে। প্রথম দিকে অধিকাংশ ঘরে ছিল শন, গোলপাতা ও নাড়ার ছাউনি। কখনো কখনো তালপাতাও ছাউনি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। টিনের প্রচলন হলে সঙ্গতি সম্পন্ন

www.pathagar.com

মানুষেরা টিন দ্বারা বাড়ি নির্মাণ করেছে। একটু প্রাচীনকালে কালিয়া পৌরসভায় ইট, চুন, সুরকি সহযোগে বেশ কিছু ইমারত তৈরি হয়েছিল। এদের কয়েকটি এখনো বর্তমান। সরকারি ভবনগুলো ইটের নির্মিত ও মোটামুটি কারুকাজ করা।

লোহাগড়া উপজেলার সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যা

লোহাগড়া উপজেলার আয়তন ১১৭ বর্গমাইল। এই উপজেলার বর্তমান জনসংখ্যা আট লাখ। শিক্ষার হার ৪৪%। এ উপজেলার পূর্বে রয়েছে ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা ও গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলা, দক্ষিণে নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলা, পশ্চিমে জেলার নড়াইল সদর এবং উত্তরে মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর উপজেলা। লোহাগড়া উপজেলা সৃষ্টির তারিখ ১৯৮২ সালের ১৫ ডিসেম্বর।

লোহাগড়া উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত মধুমতি, নবগঙ্গা, বানকানা ও কালিগঙ্গা নদীর দুই তীর জুড়ে রয়েছে বহু আউলবাউল, যোগী, সন্ন্যাসীদের পুণ্যভূমি এবং ইতিহাস বিখ্যাত বহু মনীষীর জন্মভূমি। তবে সেই প্রাচীনকাল থেকে মধুমতি ও নবগঙ্গা নদীর গতি পরিবর্তন ও ভাঙাগড়ার খেলায় প্রতি বছরই কোথাও না কোথাও চর জাগছে এবং ভাঙছে। এভাবে নদীগুলো গতি পরিবর্তনের ফলে অসংখ্য বাওড় ও বৃহৎ বিলের সৃষ্টি হয়েছে। কালের প্রবাহে এসব বিল, বাওড় ক্রমান্বয়ে পলি পড়ে ভরাট হওয়ায় গভীরতা হ্রাস পেয়ে চরাঞ্চল ও ফসলের মাঠে পরিণত হয়েছে এবং জেগে ওঠা চরে গড়ে উঠছে নতুন বসতি। বার বার নদী ভাঙন এবং ঘরবাড়ি পরিবর্তনের কারণে এখানকার মানুষের সংস্কৃতিও পরিবর্তিত হয়েছে। এজন্য এখানকার মানুষ যথেষ্ট সংগ্রামী জীবনযাপনে অভ্যস্ত। আবার এক শ্রেণির মানুষ অলসও বটে। জেগে ওঠা চরের জমির দখল এবং ফসল উৎপাদন নিয়ে কখনও কখনও সংঘর্ষ, খুন জখমের ঘটনাও ঘটে। নদীভাঙন ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্তমানে চাষাবাদে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

চর অঞ্চলে বাদাম ও তামাকের চাষ হচ্ছে এবং ঐতিহ্যবাহী আউশ ও আমন ফসল কমে যাচ্ছে। আগের সেই মিষ্টি ঢেপো, দিঘে, মনোহর, কবিলাস ধান, কাইলে ধানসহ দেশীয় প্রজাতি হারিয়ে যেতে বসেছে। এখানকার মানুষের মধ্যে সামাজিক ঐক্য বিরাজমান। রাজনৈতিক সংঘাতের মতো ঘটনা ঘটে না বললেই চলে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেই সহাবস্থান করছে। এখানে কখনও কোনোদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটেনি। পারস্পরিক আচার-আচরণে সবাই অংশগ্রহণ করে থাকেন।[১১]

চ. নদনদী ও খালবিল

কালিয়া উপজেলার নদনদী

কালিয়া উপজেলার নদীগুলি হলো : ১. নবগঙ্গা ২. কালীগঙ্গা ৩. মধুমতি ৪. আঠারোবাঁকি ৫. নলিয়া, ৬. ঘোড়াখালী ও ৭. হ্যালিফ্যাকস ক্যানেল।

www.pathagar.com

নবগঙ্গা নদী

নবগঙ্গা নদীর উৎস হলো পদ্মা নদী। মাগুরা জেলার মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নড়াইল জেলার হাড়িগড়া গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এ নদী। অতঃপর লোহাগড়া উপজেলা থেকে উত্তর দিক হয়ে পূর্বদিকে প্রবাহিত হতো এবং কালনার কাছে মধুমতির সঙ্গে মিলিত হতো। কিন্তু বাদ সাধলেন নীলকর ব্যান্ড সাহেব। তিনি লোহাগড়া থেকে প্রবাহিত একটি খালকে সংস্কার করেন। নবগঙ্গা তার আগের গতি হারিয়ে ছাতরার খালে পরিণত হয়। ব্যান্ড সাহেবের খননকৃত নবগঙ্গাকে এখানে বলা হয় 'বানকানার খাল'। এই বানকানার খাল পূর্বগামী হয়ে মহাজনের কাছ থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে পাটনা, নাওরা, কালিয়া, গাজীর হাট হয়ে পেড়লীর কাছে চিত্রা নদীর স্রোতধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে ভৈরব নদীতে পড়েছে। অনেক দিন আগে থেকে আজও মহাজন, বড় কালিয়ার ঘোষপাড়া, চাঁদের চর, নাওরা, কাঞ্চপুর স্থানগুলোর ভাঙার কাজ অব্যাহত রেখেছে। এ নদী আবার বারই পাড়ার ভেঙে যাওয়া জায়গায় বিশাল চর উপহার দিয়েছে। লোকজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এ নদী এ অঞ্চলের ভাঙাগড়ার সঙ্গী স্বরূপ।

কালীগঙ্গা নদী

কালীগঙ্গা বলতে চরপড়া বা ভরাট হয়ে যাওয়া নদীকে বোঝায়। যশোর-খুলনার ইতিহাস প্রণেতা সতীশ চন্দ্র মিত্র তেমনই বলেছেন। কালিয়াতে দুটো কালীগঙ্গা নদীর সন্ধান পাওয়া যায়। একটি কালীগঙ্গা নড়াইলের চণ্ডিবরপুর ইউনিয়নের পাইকমারী গ্রাম থেকে রামচন্দ্রপুর, মুলদাইড়, রঘুনাথপুর, বল্লারটোপ, দরিয়াপুর, দিঘলিয়া, বাঁশগ্রাম, কালডাঙ্গা, চাঁচুড়ি, আমতলা, বাবরা, নোয়াগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো। এই কালীগঙ্গাকে চিত্রা নদীর একটি ভিন্ন শাখা নদী বলা হতো। নদীটিতে চর পড়ে গেলে কালীগঙ্গা নামে অভিহিত হয়েছে।

আরেকটি কালীগঙ্গা লোহাগড়ার দরিয়াপুর, কুমড়ী হয়ে কালিয়া উপজেলার মাউলী গ্রামের মধ্য দিয়ে শুক্ত গ্রামের কাছে নবগঙ্গা অতিক্রম করে কালিয়া জনপদের উপর দিয়ে জয়পুর, মির্জাপুর, চালনা হয়ে দক্ষিণমুখী হয়ে বড়নালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো। কালীগঙ্গার এই শাখাটির তীরে বৈদ্যদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। এই কালীগঙ্গা নদী কোনো কোনো জায়গায় অস্তিত্বহীন হলেও কোনো কোনো জায়গায় এখনও তার অস্তিত্ব বর্তমান।

মধুমতি নদী

গঙ্গা-পদ্মার দীর্ঘতম শাখা নদী মধুমতি একদা লোহাগড়া উপজেলায় উত্তরগামী হয়ে কালিয়া উপজেলার বড়দিয়া চাপুলিয়া গ্রামগুলির কাছ দিয়ে প্রবাহিত হতো। এরপর পূর্বগামী হয়ে টোনা, খাশিয়াল, পাকুড়িয়া, জয়নগর গ্রামের পাশ দিয়ে যোগানিয়া, সরসপুর, পহরডাঙ্গা, সিংগাতি হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হতো। কিন্তু হ্যালিফ্যাক্স ক্যানেল খনন করার পর টোনা, খাশিয়াল, গ্রামের উত্তর দিয়ে যোগানিয়ায় মধুমতি প্রবাহিত হয়। মধুমতি নদী কালিয়া উপজেলা ও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার সীমানা নির্ধারণের কাজ করছে।

www.pathagar.com

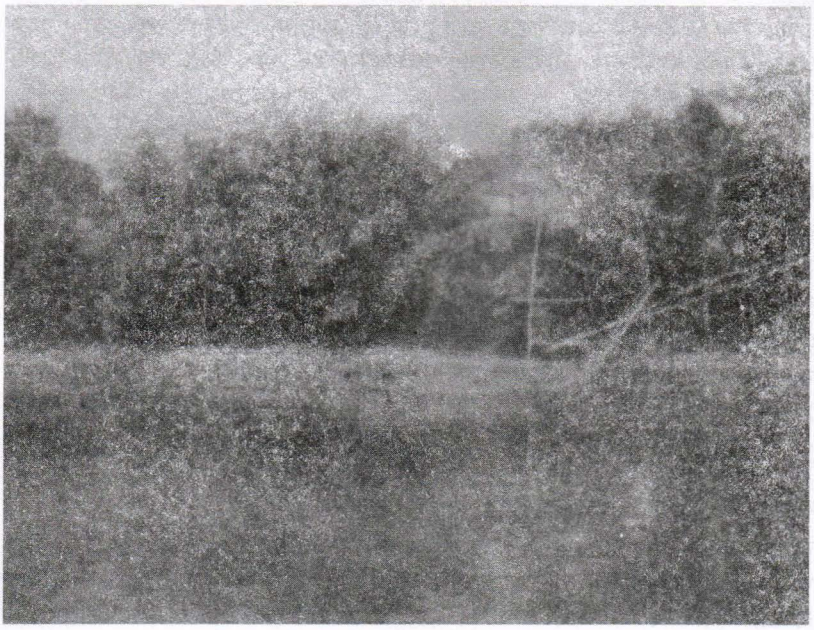

নবগঙ্গা নদী

আঠারোবাঁকি নদী

আঠারোটি বাঁক ছিল বলেই এ নদীর নাম আঠারোবাঁকি। মধুমতি পূর্ব-দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় কালিয়া উপজেলার সিংগাতি গ্রামের কাছে একটি শাখা নদীর জন্ম হয়। এই শাখা নদীটির নাম আঠারোবাঁকি। এক সময় নদীটি প্রবাহিত হয়ে খুলনা জেলার আলাইপুরের কাছে ভৈরব নদীর সঙ্গে মিলিত হতো। তখন নদীটির আঠারোটি বাঁক থাকলেও পরবর্তীকালে নদীটির গতি পরিবর্তন হলে বাঁকের সংখ্যা বেড়ে যায়। কালিয়া উপজেলার পাখিমারা গ্রামের কাছে আঠারোবাঁকি নদী ঘোড়াখালী নামে একটি শাখা নদীর সৃষ্টি করে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

ঘোড়াখালী নদী

ঘোড়াখালী আঠারোবাঁকি নদীর একটি শাখা নদী। নদীটি পাখিমারা, দুধকুরা, পদ্মবিলা গ্রামের মধ্য দিয়ে ঘোড়াখালী নামে প্রবাহিত হতো। এক সময় নদীটি ছিল খরস্রোতা। ঘোড়াখালী নদীর খাতে একটি গ্রাম গড়ে উঠেছে। নদীটি এখন মজে গেছে।

নলীয়া নদী

কোনো কোনো নদী কোনো এক সময় খাল হিসেবে গণ্য হতো। পরবর্তী কালে সেই খাল বড় হয়ে নদীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার চর পড়ে হারিয়েছে তার অস্তিত্ব।

www.pathagar.com

এরকম একটি নদী নলীয়া। নবগঙ্গার শাখা নদী নলীয়া হ্যালিফ্যাক্স খাল খননের পর তার নলের মতো সরু দেহ বিস্তার করে ধুসাহাটি, কালিনগর, কলাবাড়িয়া, আইচপাড়া প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার কাছে চিত্রার স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়। এ নদীতে প্রচুর ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। আজ এ নদী মৃত্যুর প্রহর গুণতে গুণতে ধেনো জমিতে পরিণত হয়েছে।

হ্যালিফ্যাক্স ক্যানেল

কালিয়ার বেন্দা গ্রামের কালাচাঁদ সেন নড়াইলের জমিদারের পদস্থ মোক্তার ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় নড়াইলের জমিদার কালিয়া বাজার থেকে একটি খাল কেটে নিয়ে বারুইপাড়ার কাছে চিত্রা নদীতে সংযোগ করান। এ জন্যে খালটিকে বলতো কালাচাঁদ সেনের খাল।[১২] যশোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হ্যালিফ্যাক্স একটি ছোটো খাল কেটে মধুমতি ও নবগঙ্গার মধ্যে সংযোগ সাধন করানোর জন্যে নবগঙ্গার স্রোত বেড়ে যায়। ১৯১৮ সালে হ্যালিফ্যাক্স খালটি খনন করান বলে তাঁর নামে খালটির নাম হয়েছে হ্যালিফ্যাক্স ক্যানেল।

কালিয়া উপজেলার খালসমূহ

কালিয়া উপজেলায় নদীর চেয়ে খালের সংখ্যা বেশি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি অনেক খাল বড় হয়ে এক সময় নদী হয়েছে। আবার নদী মরে খাল হয়েছে। এখন যে খাল অবশিষ্ট আছে তাও মজে যাওয়ার পথে। আমরা কয়েকটি খালের তালিকা তুলে ধরছি মাত্র।

১. শুক্তগ্রাম খাল, ২. গাছবাড়িয়ার খাল, ৩. সুন্দরির খাল, ৪. চাঁচুরির খাল, ৫. বনগ্রাম খাল, ৬. কালুখালির খাল, ৭. মির্জাপুরের খাল, ৮. বেন্দার খাল, ৯. বড়নালের খাল, ১০. বালিচার খাল, ১১. নড়াগাতির খাল, ১২. ভূতির খাল, ১৩. মাধবপাশার খাল, ১৪. পেড়োলির খাল, ১৫.নলামারার খাল, ১৬. ঘোষের খাল, ১৭. খড়রিয়ার খাল, ১৮. কাঞ্চনপুরের খাল, ১৯. পানিপাড়ার খাল, ২০. লোহারগাতির খাল প্রভৃতি।

লোহাগড়া উপজেলার নদনদী ও খালবিল

জেলার উপর দিয়ে ছোটো-বড়ো কয়েকটি নদী প্রবাহিত। এর মধ্যে জেলার পূর্ব সীমান্ত অর্থাৎ লোহাগড়ার মধ্য দিয়ে মধুমতি নদী প্রবাহিত। পদ্মা হতে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালির নিকট গড়াই নামে শাখা নদীটি দক্ষিণাভিমুখী হয়ে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার মধ্য দিয়ে এই গড়াই মধুমতি নাম ধারণ করে লোহাগড়ার পূর্ব সীমান্ত দিয়ে দক্ষিণাভিমুখী কালিয়া হয়ে খুলনা জেলায় প্রবেশ করেছে। লোহাগড়ায় মধুমতির একমাত্র শাখা নদী বানকানা মধুমতি তীরস্থ এককালের নদীবন্দর কালনার উত্তরপার্শ্ব হতে পশ্চিমাভিমুখী হয়ে মোচড়া ও ছাতরার মধ্য দিয়ে দক্ষিণাভিমুখী হয়ে লোহাগড়ার পশ্চিমপার্শ্ব দিয়ে পূর্বাভিমুখী নবগঙ্গার সাথে মিলিত হয়। বানকানা আজ মরা খালে পরিণত হয়েছে। নবগঙ্গা নদী মাগুরা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নড়াইলের উত্তর প্রান্তে সিঙ্গিয়া হাড়িগড়া গ্রামের কাছে এই উপজেলায় প্রবেশ করে এবং দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে নদীবন্দর নলদী হতে পূর্বাভিমুখী হয়ে ব্রাহ্মণডাঙ্গা, রায়গ্রাম,

www.pathagar.com

কলাগাছি, এড়েন্দা, লক্ষ্মীপাশাকে তীরে রেখে লোহাগড়ার সন্নিকটে মধুমতির শাখা নদী বানকানার সাথে মিলিত হয়ে দক্ষিণাভিমুখী হয়ে মহাজন, কালিয়া, গাজীরহাটের কাছে চিত্রার সাথে মিলিত হয়ে দক্ষিণাভিমুখে খুলনার উত্তরে ভৈরব নদের সাথে মিলিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯১৮ সালে মহাজন বড়দিয়ার নিকট মধুমতি হতে একটি খাল কেটে নবগঙ্গার সাথে যুক্ত করে দেওয়াতে নবগঙ্গার বর্তমান জলধারা পরিপুষ্ট হয়ে বিশাল আকার ধারণ করলেও গতি পরিবর্তনের কারণে লোহাগড়া হতে মহাজন পর্যন্ত নবগঙ্গা মৃত হয়ে গেছে। শুষ্ক মৌসুমে এখানে চাষাবাদ হয়ে থাকে। নবগঙ্গার একটি শাখা কালীগঙ্গা নামে এ উপজেলার এড়েন্দা বাজারের পশ্চিম দিয়ে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়ে বুড়িখালী, শালিখা, কামালপ্রতাপ, কুমড়ি, মাউলী গ্রামের মধ্য দিয়ে শুক্তগ্রামের নিকট নবগঙ্গায় পড়ত। এই নদী এখন সম্পূর্ণ মৃত।

লোহাগড়ার ওপর দিয়ে প্রবাহিত বানকানা, কালীগঙ্গা, নবগঙ্গা ও মধুমতি নদী অসংখ্যবার এক পাড় ভেঙেছে এবং অপর পাড় গড়েছে। এভাবে নদীগুলো গতি পরিবর্তনের ফলে একাধিক বাওড় ও বৃহৎ বিলের সৃষ্টি হয়েছে। খালবিলের কারণে এখানে জেলেরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। কালের প্রবাহে এসব বিল, বাওড় ক্রমান্বয়ে পলি পড়ে ভরাট হওয়ায় গভীরতা হ্রাস পেয়ে চরাঞ্চল ও ফসলের মাঠে পরিণত হয়েছে এবং জেগে ওঠা চরে গড়ে উঠছে নতুন বসতি। নদীভাঙন ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদেও পরিবর্তন আসছে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতের ফসলের উৎপাদন হচ্ছে। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখানকার মানুষ যথেষ্ট সংগ্রামী জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এ উপজেলার বড়দিয়া, মল্লিকপুর, করফা, ইতনা, কালনা, শিয়েরবর, জয়পুরসহ ২০টির মতো গ্রামের মানুষ প্রায় প্রতি বছর মধুমতি ও নবগঙ্গা নদীর ভাঙনের শিকার হয়ে সহায় সম্বল হারিয়ে স্থানান্তরে বাধ্য মানুষ নতুন করে জীবন শুরু করছেন।[১৩]

ছ. ব্যবসা বাণিজ্য ও যাতায়াত

ব্যবসা-বাণিজ্য

লোহাগড়া প্রাচীনকাল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। কোম্পানি আমল এবং ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে নীলচাষের জন্য বাংলাদেশের কয়েকটি জেলার মধ্যে নড়াইল বিশেষ করে লোহাগড়া ছিল অন্যতম। এখানে ইউরোপীয় কোম্পানি বেশ কয়েকটি এলাকায় কুঠি নির্মাণ করে নীল ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিল। এর মধ্যে উলা, মাউলী, নোয়াগ্রাম, আমডাঙ্গা, লক্ষ্মীপাশা, মল্লিকপুর, কুমারডাঙ্গা, রাধানগর, ইতনা, আখড়াবাড়ি, লাহুড়িয়া, এড়েন্দা নীলকুঠি অন্যতম।

যাতায়াত

প্রাচীনকালে মানুষ পায়ে হেঁটে বেশি যাতায়াত করতেন। তারপর অর্থবান মানুষেরা পালকিতে করে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে, পরবর্তীকালে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদিতে করে যাতায়াত করতেন। যখন স্টিমার হলো, রেলগাড়ি হলো তখন তো মানুষের পোয়াবারো। জলযান সেদিনও ছিল, আজও আছে। সেদিন জলযান ছিল

www.pathagar.com

নৌকা, বিশেষ করে টাবুরে নৌকা। তারপর এসেছে লঞ্চ। এক সময় B.A.D.C অর্থাৎ Bangladesh Agricultural Development Corporation-এর সৌজন্যে মাঠে পানি সেচের জন্যে যে পাম্প মেশিন এসেছিল সেই মেশিন দিয়ে পরবর্তীকালে ট্রলার তৈরি হয়। এবং সেই ট্রলারই যাতায়াতের দ্রুততর মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়। স্থলপথে চলার জন্যে সাইকেল এসেছে। এরপর মোটর সাইকেল। এখন যোগাযোগের নতুন মাধ্যম হিসেবে গ্রামীণ যাতায়াত ও সংস্কৃতিতে যোগ হয়েছে নছিমন, গ্রাম বাংলা অটোভ্যান, ব্যাটারি চালিত বাইক ইত্যাদি।

জ. প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদ

নড়াইল উপজেলার অন্যতম খাদ্যশস্য হলো ধান ও গম। নড়াইলে জনপদ সৃষ্টির পর হতে মুসলমান শ্রেণির অধিকাংশ মানুষ চাষাবাদের সঙ্গে জড়িত। কারণ প্রাচীন আমলে এমনকি সুদূর ও নিকট অতীতে মুসলমান সম্প্রদায় বিদ্যাশিক্ষার প্রতি উৎসাহী ছিল না। মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করতো লেখাপড়া শিখে চাকরি করার অর্থ হলো পরের গোলামি করা। সুতরাং চাকর হবো না। শখ করে শিক্ষিত জনদের কটূক্তি ভরে একটা শ্লোক নড়াইল অঞ্চলে প্রচলিত আছে যথা- "আই,এ/বি,এ/ম্যাট্রিক পাস- কাঁচি, কোদাল, থোড়াবাঁশ।" অন্য দিকে নিম্ন শ্রেণির হিন্দুগণ মুসলমানদের ন্যায় লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ছিল না। ফলে অশিক্ষিত মুসলমান ও নমশূদ্র শ্রেণির হিন্দুরা জমাজমি ও চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। বছরে একবার দুই ধরনের ধান চাষ ও উৎপাদিত হতো । যথা- চৈত্র, বৈশাখ মাসে জমাজমিতে পরিপূর্ণ বর্ষার জল শুকিয়ে গেলে লাঙল গরুর সাহায্যে হালচাষ করে আউশ ধান বুনে দেওয়া হতো এবং শ্রাবণ ভাদ্র মাসে আউশ ধানসমূহ এবং কার্তিকের শেষ ও পুরা অগ্রহায়ণ মাস ভরে আমন ধান, কাটা, মাড়াই করা ইত্যাদির ধুম পড়ে যেতো। অন্যদিকে আশ্বিন মাসের শেষের দিকে কার্তিক মাসের শুরু হতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত বিলের উপরি অংশের জমা জমি যেখানে বর্ষাকালে সাধারণত পানি ওঠে না এমন অঞ্চলে গম, যব ইত্যাদি খাদ্যশস্য বুনন করে তা ফাল্গুন চৈত্র মাসে ঘরে তুলতে দেখা যেতো। আগে নড়াইলের অধিকাংশ বিলের পানি সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যেতো না। অনেক বিলে দুই তৃতীয়াংশ জমা জমি অনাবাদি থেকে যেত। কিন্তু নদীর নাব্য কমে যাবার ফলে স্রোতের গতি হারিয়ে নদীগুলি চর পড়ে মরে গেছে। ফলে বর্ষাকালে পানির তোড়ে নদী ভাঙনসহ উজানের ঢলে ভেসে আসা পলি জমে জমে বিলগুলি ভরাট হয়ে গেছে। বর্তমানে বর্ষার পানি প্রায় নেই বললেই চলে। তারপরও যদি কোনো বছর প্রচুর বর্ষা হয় তা হলেও অগ্রহায়ণ মাস শেষ না হতেই পানি শুকিয়ে যায়। তবে জনসংখ্যার মারাত্মক বৃদ্ধিজনিত কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বেশি হয়েছে। এ সকল কারণে বর্তমানে অধিক উৎপাদনের প্রত্যাশায় বাংলাদেশি প্রজাতির আউশ, আমন ধানের বীজ প্রায় লুপ্ত হয়ে বিদেশে উদ্ভাবিত হাইব্রিড জাতীয় ইরি ধানের বীজ আমদানি করে ইরিধান রোপণ করা হয়। বর্তমান সময় জমাজমি চাষাবাদ ও ধান মাড়াইয়ের জন্য অতীতের ন্যায় লাঙল ও গরু ব্যবহার করা হয় না। বরং পাওয়ার ট্রিলার দ্বারা চাষাবাদ করা হয়। বর্তমানে বীজবপন, ধান মাড়াইয়ের জন্য মেশিন ব্যবহৃত হয়। তবে বছরে ২ বার ইরি

www.pathagar.com

ধান এবং দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে একবার বোরো ধান, দুইবার ইরি ধান উৎপন্ন হতে দেখা যায়। তবে নড়াইলে শীতকালে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে একবার রোপণ করা হয় এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে ধানকাটা ও মাড়াই করা হয়। অন্যদিকে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে আষাঢ়ের প্রথমদিকে একবার ধান রোপণ করা হয় এবং আশ্বিন কার্তিক মাসে ধান কাটা ও ধান মাড়াই করা হয়। বিলের উপরি অংশের জমাজমিতে শীতকালে একবার গম, যব বুনন করা হয় এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে তা কাটা হয় ও মাড়াই করা হয়। অতীতের চেয়ে বর্তমানে উৎপাদন বেশি হয়। অতীতকালে রাসায়নিক সার মোটেই ব্যবহৃত হত না। ধান বুনন বা রোপণ এবং ধানকাটা বা মাড়াইয়ের ক্ষেত্রে চাষিদের মাঝে নতুন প্রাণের জোয়ার লক্ষ করা যায়। গাতায় (৫-৭ জন চাষি একত্রে কাজ করে পালাক্রমে পরস্পরের কাজ সম্পন্ন করে। তবে কোনো ধরনের আর্থিক অনুদান গ্রহণ করে না। নড়াইল অঞ্চলে এ ব্যবস্থাকে গাতা বলে।) কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধান বুনন বা রোপণ এবং ধান কাটা বা মাড়াইয়ের ক্ষেত্রে 'বেগার' নিতেও দেখা যায়। বেগার হলো কিছু লোক একত্রে মিলেমিশে কাজ করা। কিন্তু বিনিময়ে ঐ মানুষগুলি শ্রমের মজুরি টাকায় গ্রহণ করে না। বরং মাছ, মাংস, মিষ্টিসহ ভূরিভোজের মাধ্যমে শ্রমের মজুরি প্রাপ্ত হয়। নড়াইল অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী এ ব্যবস্থাকে 'বেগার' নামে আখ্যায়িত করা হয়। গ্রামগঞ্জের মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য ধান বুনন, মাড়াই, ধানকাটা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ মানুষগুলির প্রাণে বিপুল আশার আলো সৃষ্টি হয়। প্রাপ্তির আনন্দ এবং উৎপাদনের সফলতায় সাধারণ মানুষগুলি আনন্দের প্লাবনে ভেসে যায়। ফলে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রায় একই ধরনের উৎসব আয়োজন দেখা যায়। বাঙালির লোকজীবনে আনন্দ প্রাপ্তির অন্যতম উপাদানই হলো নবান্ন উৎসব, পিঠা উৎসব, পৌষপার্বণের সংক্রান্তি উৎসব, বৈশাখি উৎসব ইত্যাদি বাঙালি জীবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উপজীব্য বিষয়।[১৪]

সারা দেশের মতো এ অঞ্চলের প্রধান খাদ্য ভাত মাছ। এর সঙ্গে গমেরও প্রচলন আছে। প্রধান খাদ্য হলেও ভাতের বিভিন্ন রকমারি আছে। যেমন ভাতের জাউ, পান্তাভাত, গরমভাত ও ফেনাভাত। গত শতাব্দীর আশির দশকের আগেও সকালের খাবার ছিল পান্তাভাত। এর সঙ্গে থাকতো কাঁচা মরিচ-পেঁয়াজ, শুকনো বা পোড়া কিংবা ভাজা মরিচ ও বাসি তরকারি। কোনো কোনো পরিবার জাউভাতের সঙ্গে পোড়া মরিচ, ঝোলা গুড়, কখনো আলু ভর্তা ইত্যাদি; কোনো কোনো পরিবার ফেনাভাতের সঙ্গে আলু ভর্তা, বেগুন ভাজা, কদাচিৎ এক চামচ ঘি সহযোগে সকালের খাবার হিসেবে খেতো। অনেক সময় গাছের নারিকেল কোরা, সঙ্গে ঝোলা গুড় খেতে দেখা গেছে। তবে সামর্থ্য অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া ভিন্ন রকম হয়ে থকে। চাষের মৌসুমে পান্তাভাত অনিবার্য প্রসঙ্গ। দুপুর বেলা গরমভাতে মাছের ঝোল, ডাল, ভাজি, দুধ-মিষ্টি, তেঁতুল কিংবা আমড়ার টক ইত্যাদির চল ছিল এবং আছেও। রাতে গরমভাতের সঙ্গে মাছের ঝোল, দুধ-গুড়, ডাল ইত্যাদি খায়। এছাড়াও উপজেলার মানুষেরা বিভিন্ন তরকারি ভর্তাও খায়। তরকারির মধ্যে বেগুন, শিম, আলু, কুমড়া ইত্যাদি। মাঝে মাঝে গোরুর মাংস, হাঁসের মাংস, মুরগির মাংস, ছাগলের মাংস, ডিমের বহু রকমের পদ করে খায়। তবে নারিকেলের দুধ দিয়ে ডিম রান্না এদের বেশি পছন্দ।

www.pathagar.com

মাছের মধ্যে চিংড়ি, টাকি, শোল, রুই, কাতলা, মাগুড়, শিঙ, গজার, পাবদা, টেংরা, গলদা, মায়া, নলা, ঢেলা, মৃগেল, পুঁটি প্রভৃতি মাছ এদের প্রিয় খাবার। তবে চিংড়ি, টাকি, শোল দিয়ে শাপলা ভাজি এদের প্রিয় খাবার। ইলিশ মাছও এদের প্রিয় খাবার হলেও বেশি দাম, ফরমালিনযুক্ততা ও দুষ্প্রাপ্যতার কারণে তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে।

পিঠা-পায়েস, ছানার মিষ্টি, দই, মাখন এদের প্রিয় খাবার। পিঠা এ অঞ্চলে একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে। পৌষপার্বণ ও বিভিন্ন পর্ব ছাড়াও এ অঞ্চলে তৈরি হয় নানা পদের পিঠা। শীতকালে তৈরি হয় ভাপ পিঠা, কুলিপিঠা, রসপাকানপিঠা, পাটিসাপটা, চালের গুঁড়া দিয়ে হাতে কাটা সিমাই পিঠা ইত্যাদি। ভাদ্র মাসে তালবড়া। এছাড়া বিয়ের অনুষ্ঠানে মেহমানদের আপ্যায়নের জন্যে তৈরি হয় বহুমাত্রিক পিঠা।

ঝ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

তরফদার বাড়ি জামে মসজিদ

মসজিদ এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষ তার ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ ঘটায়। কারণ মসজিদ কিংবা মন্দিরে স্বতন্ত্রভাবে মানুষ উপাসনা বা এবাদতে মশগুল হয়। সৎকর্ম করার নৈমিত্তিক অভ্যাস সৃষ্টি ও মানুষের মনে সততা তৈরিতে ধর্মীয় পবিত্র ভবনগুলি অবদান রাখে এবং পরোপকার ও সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করায় মানসিকতা মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়।

ধর্মীয় গৃহসমূহ পবিত্রতম স্থান বলে সকল ধর্মানুসারী মানুষ তাদের পবিত্র এবাদত গৃহগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে যেমন উৎসাহী তেমনি ঐ গৃহগুলিকে শোভামণ্ডিত করার ক্ষেত্রেও সবশ্রেণির মানুষের আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যায়। ফলে নানারকম সৌকর্য্যমণ্ডিত স্থাপনা শিল্পীয় নিদর্শনে সমুজ্জ্বল থাকে। তাছাড়া ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের নৈমিত্তিক জীবনের সামাজিক ও মানবিক আচরণগুলিকে সু-সংহত করে। তুলারামপুর ইউনিয়নের তুলারামপুর গ্রামে ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে তরফদার বাড়ির এলাকায় 'তরফদার বাড়ি জামে মসজিদ' নামে আছির উদ্দিন তরফদার নামক জনৈক ধর্মপ্রাণ মুসলমান নিজস্ব উদ্যোগে সাধারণ মুসলমানদের এবাদত সম্পন্ন এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়নের প্রেক্ষাপটকে চিন্তায় নিয়ে একটা দরজা, দুইটা জানালা, এক গম্বুজ বিশিষ্ট ৪০ ইঞ্চি পুরো দেয়ালের মসজিদ নির্মাণ করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অযত্ন এবং বিশেষ করে লবণাক্ত আবহাওয়া বৃদ্ধির কারণে ঐ মসজিদটি সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। অতঃপর ২০০৫ সালে সাবেক অর্থনৈতিক উপদেষ্টা তরফদার রবিউল ইসলাম নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে ঐ মসজিদটির সংস্কারকার্য সম্পাদন করেন। সংস্কারে নির্মিত মসজিদটি বর্তমান সময় পর্যন্ত অবিকল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একটা জনপদে যত বেশি বেশি মসজিদ মন্দিরের প্রাচীনত্ব লক্ষ করা যায় ঐ অঞ্চলটি তত বেশি সভ্য জনপদের আওতায় পড়ে। সাধারণ অনুসন্ধানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ ধর্মীয় পীঠস্থানসমূহ লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বিষয়।[১৫]

www.pathagar.com

গোয়াল বাথান মসজিদ

রথ মন্দির

www.pathagar.com

নড়াইল উপজেলার মাঝে অনেকগুলি মসজিদ এবং মন্দির দেখা যায়। তবে প্রাচীনত্বের বিচারে চণ্ডিবরপুর ইউনিয়নের গোয়ালবাথান গ্রামের মসজিদ নড়াইল জেলার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। গোয়ালবাথান মসজিদটি ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত বলে ধারণা পাওয়া যায়। "প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে মুন্সী হযরাতুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।"[১৬]

শেখহাটি ইউনিয়নের বিজয় তলায় উপজেলা ও জেলার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির দেখা যায়। বিজয় তলার মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে সংস্কারের অভাবে। এলাকার সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টায় এক পাশে মন্দিরটির সংস্কার অংশ দেখা যায়। এ মন্দিরটি বল্লাল সেনের সময়ে নির্মিত বলে ধারণা করা হয়। কারণ বল্লাল সেনের বসন্তকালীন রাজধানী এই শেখহাটি পূর্বনাম শঙ্খনট-এ স্থাপিত ছিল বলে ধারণা পাওয়া যায়।[১৭]

মন্দিরে অবস্থিত কষ্টি পাথরের নির্মিত একটা বিগ্রহ চুরি হয়ে যায় এবং একটা বিগ্রহ সরকারিভাবে সংরক্ষণের জন্য রাজশাহির বরেন্দ্রশালায় স্থানান্তরিত করা হয়। এ মন্দিরকে কেন্দ্র করে যেমন সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় চর্চা অব্যাহত ছিল। ঠিক তেমনি করে বাৎসরিকভাবে এখানে পূজায় বড় ধরনের মেলা উদ্‌যাপিত হয়। মেলা, বাঙালি জীবনের লোকজ সংস্কৃতির অন্যতম বড় উপাদান। অন্যদিকে নড়াইল জমিদার বাড়িতে জমিদারদের নির্মিত মন্দিরটিও প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করে। এ মন্দিরের ভাস্কর্য চোখে পড়ার মতো এবং এখানে নানাবিধ পূজা অর্চনা ছাড়াও মেলা বসে। প্রাণ হতে প্রাণে হাজার প্রাণের মিলনে মেলা এক মিলনের মোহনায় রূপান্তরিত হয়।

ঞ. হাটবাজার

বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান একটি দেশ। সুতরাং দেশের উন্নয়ন গ্রামীণ উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল এবং গ্রামীণ জনপদের উন্নয়নের মাধ্যমেই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব। দেশের ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে এবং কৃষিকাজ করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন আর্থিক সঙ্গতি এবং গ্রামের মানুষ তাদের কায়িক পরিশ্রমে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করেই অর্থপ্রাপ্ত হয়। গ্রামের মানুষের উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের একমাত্র জায়গা হলো হাটবাজার। সুতরাং ক্রেতা পণ্য পেয়ে প্রয়োজন মিটায়, বিক্রেতা পণ্য বিক্রি করে অর্থপ্রাপ্ত হয়ে তার পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য মালামাল হাটবাজার হতে প্রাপ্ত হয়। হাটবাজারের সঙ্গে সরাসরি ক্রেতা, বিক্রেতা, দোকানদার, ফড়িয়া বা পাইকারগণ জড়িত থেকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বচ্ছন্দ নিশ্চিত করে। অন্যদিকে গ্রামের এ সকল পণ্য স্থানীয় চাহিদা মেটায় এবং পাইকারদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রির জন্য পণ্য পরিবহণের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং গ্রামের হাটবাজার বৃহৎ জনজীবনের সঙ্গে নানাভাবে সার্বক্ষণিক সংযুক্ত। হাটবাজার কেবল পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যম নয় বরং প্রতিদিন একই স্থানে একই অঞ্চলের মানুষ উপস্থিত হওয়ার ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক অনায়াসে সৃষ্টি হয়। আর পারস্পরিক সম্পর্ককে উপলক্ষ্য করেই মানুষ–মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, আশাভরসা, পাওয়া-হারানো, বিরহ-আনন্দ ইত্যাদির সঙ্গে

www.pathagar.com

সম্পৃক্ত হয়। অর্থাৎ হাটবাজার মানবিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কর্মব্যস্ত মানুষগুলি যে কোনো ভাবেই হোক না কেন নির্মল আনন্দ পাবার প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়। ব্যাকুলপ্রাণ মানুষগুলি কাঙ্ক্ষিত সুখ পেতে কর্মহীন আড্ডায় সময় কাটায়। আড্ডায় মানুষের চারিত্রিক নির্মলতা বিস্তৃত হয়। মানুষ সমাজকে দেখে দেখে পরোপকারী হবার অভ্যাস রপ্ত করতে শেখে এবং মানুষের কল্যাণে সমাজ, সংসারে সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– অধিকাংশ মহৎ কাজকর্মগুলি আড্ডাবাজি ও আবেগতাড়িত পাগলামির মাধ্যমে সৃষ্টি ও সফলভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে। হাটবাজার গ্রামীণ মানুষের আড্ডাখানার অন্যতম পাদপীঠ। গ্রামের হাটবাজারকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ শিক্ষায়তন গড়ে ওঠে সুতরাং শিক্ষার অন্যতম প্রধান জায়গা তৈরিতে হাটবাজারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সাধারণত হাটবাজারের পাশে ক্লাব গড়ে ওঠে এবং হাটবাজারকে কেন্দ্র করে গ্রামের আনন্দ বিনোদন খেলাধুলাসহ নানাবিধ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেমন- নৌকাবাইচ, নদী তীরবর্তী হাটবাজার স্থানেই হয়। বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীত স্বাভাবিকভাবেই হাটবাজারকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সময় বিশেষ করে শীতকালের শুরুতে গ্রামের মানুষ নানাবিধ লোক খেলাধুলা, যথা- হাডুডু, কুস্তি, লাঠিখেলা, ঢালসড়কি খেলা, লোক উৎসব যথা- রাসমেলা, গাসসির মেলা, নৌকাবাইচ, ষাঁড়ের লড়াই, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি হাটবাজারকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত করে। অর্থাৎ গ্রামীণ জনপদে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের আনন্দ উপকরণের সকল বিষয়গুলিই হাটবাজারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ফলে হাটবাজার লোকজীবনের খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধপথ্য কেনাবেচাসহ আনন্দ উপভোগের অন্যতম পীঠস্থান এবং এগুলির সমন্বিত ফলাফল লোকসংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। সুতরাং লোকসংস্কৃতিতে হাটবাজারের ভূমিকা অপরিসীম।[১৮]

কালিয়া উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় অনেক হাটবাজার অবস্থিত। এ হাট শুধু দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যে নয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই হাটবাজারের আছে আলাদা গুরুত্ব। আমরা প্রথমে বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত হাটবাজারের নাম উল্লেখ করবো। ১. টোনার হাট, ২. নড়াগাতি হাট ও বাজার, ৩. বড়দিয়া হাট ও বাজার, ৪. চাঁচুড়ি হাট ও বাজার, ৫. কালিয়া হাট ও বাজার, ৬. যোগানিয়া হাট, ৭. কলাবাড়িয়া হাট, ৮.বাঐসোনা হাট, ৯.পদ্মবিলা হাট, ১০. মাধবপাশা হাট, ১১. শুক্তগ্রাম হাট, ১২. মহাজন হাট ও বাজার, ১৩. পেড়লি হাট, ১৪. জামরিলডাঙ্গা হাট, ১৫. খড়রিয়া হাট ও বাজার, ১৬. মাথাভাঙ্গা হাট, ১৭. বিলদূরিয়ার হাট, ১৮. মাউলির হাট, ১৯. পাটনার হাট, ২০. মুলশ্রী হাট, ২১. হামিদপুর হাট, ২২. বলাডাঙ্গার হাট, ২৩. ফুটোই নগরের হাট ও ২৪. শরিফপুরের হাট প্রধান। এছাড়া প্রতিদিন সকালে-বিকালে বিভিন্ন জায়গায় কত যে বাজার বসে তার ঠিকানা নেই।

লোহাগড়া উপজেলায় উপজেলায় প্রাচীনকাল থেকেই অসংখ্য হাটবাজারের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বর্তমানে নদী, মিঠাপুর, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, বড়দিয়া, লোহাগড়া, ইতনা, দিঘলিয়া, শিয়েরবর, লাহুড়িয়া, এড়েন্দা, রায়গ্রাম, কলাগাছি, ছোটো-বড়োসহ মোট ১৫টি হাটবাজার বসে। কোনো কোনো হাট সপ্তাহে দু'দিন বসে। আর বাজার প্রতিদিনই বসে। এসব হাটবাজারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রামের মানুষের মধ্যে ভাবের

www.pathagar.com

আদান-প্রদান হয় এবং একে অপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা সামাজিক বন্ধন ও সংহতি বাড়াতে সাহায্য করে। গ্রামাঞ্চলে বিনোদনের আর তেমন কিছু না থাকায় এখানকার অধিকাংশ মানুষই হাটবাজারে এসে আড্ডা দেয় যা বিনোদনেরই একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। এখানে হাটবাজারকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীত, লোকখেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়। অনেকে এসব হাটবাজারে লোকসংগীত পরিবেশন করে কিছু অর্থ উপার্জন করে জীবনজীবিকা নির্বাহ করে। হাটবাজারে অনেকে বিভিন্ন ধরনের ম্যাজিক, গাছগাছড়ার ওষুধ বিক্রি করে এবং অনেককে সাপ খেলাকে জীবিকার মাধ্যম হিসেবে নিতে দেখা যায়। সাপুড়েরা বিভিন্ন জঙ্গল, মাঠ এবং বাড়ি থেকে বিষধর ও বিভিন্ন প্রজাতির সাপ ধরে সাপ খেলা দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করে থাকে। এসব হাটবাজারেই লোকশিল্পের সাথে জড়িতরা মৃৎশিল্প, বাঁশ-বেত শিল্পসহ বিভিন্ন পণ্য তৈরি এবং হাটবাজারে তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

ট. মুক্তিযুদ্ধ

যশোর জেলার পূর্বদিকে ফরিদপুর সীমান্তে মধুমতি নদীর তীর ঘেঁসে নড়াইল মহকুমার অবস্থান। দক্ষিণে খুলনা জেলা, উত্তরে মাগুরা মহকুমা, পশ্চিমে যশোর সদর মহকুমা অবস্থিত। মাগুরা, খুলনার সঙ্গে সরাসরি নদী যোগাযোগ থাকায় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নৌ আক্রমণের ক্ষেত্রে এ মহকুমার গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল। নড়াইল সদর, কালিয়া ও লোহাগড়া থানার সমন্বয়ে নড়াইল মহকুমা বা বর্তমান নড়াইল জেলা অবস্থিত। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর হতে নড়াইলের মানুষের মনের মাঝে সংগ্রামের বাষ্প জমাট বাঁধতে থাকে। এরপর ১৯৭০ সালে নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লিগের নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের পর বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা না দেওয়ায় ছাত্র-জনতার সংগ্রামী মিছিলে রাজপথ প্রকম্পিত থাকে। ১৯৭১ সালের ৪ মার্চ আওয়ামী লিগ ও ছাত্রলিগের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সার্বিকভাবে সরকারের সকল কাজে অসহযোগ জোরদার করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয় এবং খন্দকার আব্দুল হাফিজের নেতৃত্বে লে. মতিয়ার রহমান, মরহুম অ্যাড. বজলুর রহমান, মরহুম অ্যাড. শরীফ আব্দুল হাকিম, মরহুম গাজী আলী করিম, মরহুম বি.এম. মতিয়ার রহমানসহ ১১ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। সংগ্রাম ও মিছিলের নেতৃত্ব দেন তৎকালীন ছাত্রলিগের বিদায়ী সভাপতি শরীফ হুমায়ুন কবির, নতুন সভাপতি মো. মসিউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মো. খায়রুজ্জামান খয়ের, অ্যাড. ফজলুর রহমান জিন্নাহ, অ্যাড. গোলাম নবী, অ্যাড. সিদ্দিক আহম্মেদ, মো. আবু দাউদসহ অন্যান্য ছাত্রনেতৃবৃন্দ। ৮ মার্চ সংগ্রাম কমিটি ইউনিয়ন, গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পৌঁছে দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে। ২৫ মার্চ ঢাকায় নারকীয় হত্যাকাণ্ডের খবর নড়াইলে পৌঁছার পর স্থানীয় জনগণ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়। তবে ২৫ মার্চ ঢাকার ঘটনার আগে ২৩ মার্চ নড়াইল চিত্রাবাণী সিনেমা হলে আওয়ামী লিগ ও ছাত্রলিগের কর্মীদের নিয়ে এক সমাবেশ হয় ও এখানে সকলেই দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন ও আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রলিগের সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়।

www.pathagar.com

কালিয়া থানা

১৯৭১ সালে মার্চ মাসের ৭ তারিখ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর পর কালিয়ার তৎকালীন ছাত্রলিগের নেতা অ্যাড. আবুল কালাম আজাদ, আব্দুল মজিদ সরদার, আবু বক্কর, সাজ্জাদ হোসেন, ইমদাদ হোসেন মোল্লা প্রমুখ ছাত্রনেতার উপস্থিতিতে এবং মরহুম এখলাছ উদ্দিন বিশ্বাস, মরহুম অ্যাড. আবদুস সাত্তার, শহিদ আব্দুস সালাম ও শাহেদ আলী খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্রনেতা অ্যাড. আবুল কালাম আজাদকে স্থানীয়ভাবে নেতৃত্বের দায়িত্বে রেখে ১১ সদস্যের সংগাম কমিটি গঠিত হয় ও স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয়। জনগণকে স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। খড়রিয়ার শামছুর রহমান মোল্লা, সাখাওয়াৎ হোসেন, রানা মোল্লা, চাচুড়ি চান্দেরচরের জিন্দার আলী খানসহ অন্যান্য নেতারা গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় সভা করে জনগণকে সচেতন করে তোলেন। এ সময় কালিয়া পাইলট স্কুলমাঠে এক সভা হয় এবং স্থানীয়ভাবে অস্ত্র সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। গাজিরহাটে মো. আব্দুল হামিদ মোল্লার নেতৃত্বে হামু বাহিনী গঠিত হয়। ২৫ মার্চ ঢাকার গণহত্যার খবর পাওয়ার পর যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে প্রথম কালিয়া সদরে এরপর কলাবাড়িয়ায়, খড়রিয়ায় ও নওয়াগ্রামে পৃথকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গঠিত হয়।

লোহাগড়া থানা

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর তৎকালীন ছাত্রলিগের নেতা মফিজুল হক ফকিরের নেতৃত্বে লোহাগড়ায় স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয়। আওয়ামী লিগের শ.ম. আনোয়ারুজ্জামান, অধ্যক্ষ ওয়াহিদুজ্জামান, বাবু মাস্টার প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় এবং আওয়ামী লিগ ও ছাত্রলিগের নেতাকর্মীরা মিলে জনগণকে সচেতন করার কাজে গ্রামে গ্রামে সভা শুরু করেন। ২৫ মার্চ ঢাকার নারকীয় হত্যার খবর পাওয়ার পর স্থানীয়ভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করে অবসরপ্রাপ্ত ইপিআর, পুলিশ, আনছারদের সহায়তায় যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য প্রশিক্ষণ ক্যাম্প তৈরি হয়। লোহাগড়ার ইতনা গ্রামে গোপালগঞ্জের অধীন কাশিয়ানির অন্তর্গত রাতইল গ্রামের ক্যাপ্টেন নূরুদ্দোহার নেতৃত্বে আলাদা আলাদা একটি পুরুষ ও একটি মহিলা মুক্তিযুদ্ধ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প তৈরি হয়। ইতনার মহিলা ক্যাম্পের নেতৃত্বে ছিলেন রোকেয়া খাতুন। তবে সকল ক্ষেত্রে সর্বজনাব লে. মতিয়ার রহমান, শ.ম. আনোয়ারুজ্জামান, অধ্যক্ষ ওয়াহিদুজ্জামান, অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ মিয়াসহ ছাত্রনেতৃবৃন্দ সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর নড়াইলে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির নেতৃত্বে নড়াইলের সর্বস্তরের জনগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল নড়াইল মহকুমার লোহাগড়া থানার ওয়ারলেস অফিসপাড়ার বাসিন্দা লোহাগড়া কলেজের ছাত্র পটু শরীফ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত একটা ওয়ারলেস মেসেজ নিয়ে আসেন। এ সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লোহাগড়ার বাসিন্দা জনাব নূর মোহাম্মদ মিয়ার নিকট ঐ মেসেজটি দেখান। অধ্যাপক

www.pathagar.com

নূর মোহাম্মদ মিয়া তাৎক্ষণিকভাবে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা মহকুমার কালিয়া, লোহাগড়া ও সদর থানা আওয়ামী লিগের সকল নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছে দিতে বলেন। অর্থাৎ ২৬ মার্চ নড়াইলের মানুষ একটি অনিবার্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

২৭ মার্চ জনাব অধ্যাপক নূর মোহাম্মদের নেতৃত্বে লোহাগড়ার একটি দল সরকারি ট্রেজারি ভেঙে অস্ত্র যোগাড় করার উদ্দেশ্যে নড়াইলে পৌঁছান। সদর থানার আজিবর রহমান (বাঁশগ্রাম) সাইফুর রহমান হিলু (কুমড়ি) ফজলুর রহমান জিন্নাহ (ভবানীপুর) মহসীন সরদার ও আলম (কুমড়ি)-সহ আরও কিছু লোকজন ট্রেজারি ভেঙে কিছু অস্ত্র নিয়ে নেয়। অবশ্য এর কিছু অস্ত্র নকশাল বাহিনীর লোকেরা নিয়ে যায়, কিছু অস্ত্র লোহাগড়ার শ.ম. আনোয়ারুজ্জামান, মফিজুল হক ফকির, অধ্যাপক নূর মোহাম্মদসহ অন্যরা নিয়ে যায় এবং কিছু অস্ত্র ফজলুর রহমান জিন্নাহর নেতৃত্বে কুমড়ির চানপুর প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

২৭ মার্চ বিকেল বেলায় খন্দকার আব্দুল হাফিজের উপস্থিতিতে শহিদ এখলাছ উদ্দিন, শহিদ আব্দুস সলাম, অ্যাড. আব্দুস সাত্তার মাস্টারের নেতৃত্বে ও মহকুমা প্রশাসক জনাব কামালউদ্দিন সিদ্দিকীর সহযোগিতায় ট্রেজারির সমুদয় অস্ত্র মুক্তিকামী মানুষকে দিয়ে দেয়া হয়। এ সময় মহকুমা প্রশাসক সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ও ছাত্রলিগ কর্মীদের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে সংহতি প্রকাশ করেন। এ সময় ছাত্রলিগের শরীফ হুমায়ুন কবির, আবু সাঈদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে ট্রেজারির অস্ত্র দিয়ে প্রশিক্ষণকার্য জোরদার করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত আনছার, মুজাহিদ, ইপিআরদের সহযোগিতায় মহকুমার বিভিন্ন থানায় অনেকগুলি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপিত হয়।

২৯ মার্চ মুক্তিকামী মানুষ যশোর ক্যান্টনমেন্ট অবরোধে যশোরের পথে গমন করেন। এখানে উল্লেখ্য, সদর থানার এগারোখান গ্রামের সাধারণ হিন্দুরা ঢাকঢোল, জয়ডঙ্কা নিয়ে যশোরগামী সেনাদের সহযাত্রী হয় এবং বাজনার তালে তালে মানুষকে সামনে চলতে উৎসাহিত করে।

১৯৭১ সালের ৬ এপ্রিল পাকসেনাবাহিনী সড়কপথে ও আকাশপথে আক্রমণ করে এবং ন্যাপাম বোমার আক্রমণের মাধ্যমে শহর দখল করে নেয়। ব্যক্তিগত বন্দুক কিংবা সরকারি ট্রেজারি হতে পাওয়া সামান্য অস্ত্রের মাধ্যমে কিছু যুবক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় এবং কিছু যুবক প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে গমন করে। পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ নিয়ে সশস্ত্রভাবে দেশের মাটিতে ফিরে আসে তারা। শুরু হয় পাকসেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে প্রচণ্ড সম্মুখযুদ্ধ। নড়াইলে অবশ্য এ লড়াই ত্রিমুখীভাবে সংগঠিত হয়। কারণ নড়াইলে তখন ইস্ট পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কস-লেনিন) বা (ই.পি.সি.পি-এম.এল)-র কিছু সশস্ত্রকর্মী ছিল। তারা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে জোতদার-মহাজন ও সম্পদশালীদের শ্রেণিশত্রু হিসেবে খতম করার জন্য কাজ করে যাচ্ছিলো। কিন্তু সমস্যা হয় উন্নত অস্ত্রের প্রয়োজনে ই.পি.সি.পি-এম.এলের সদস্যরা ভারত প্রত্যাগত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ছলনা করে পরপর দুই-তিন গ্রুপের অত্যাধুনিক অস্ত্রগুলি কেড়ে নেয়।

www.pathagar.com

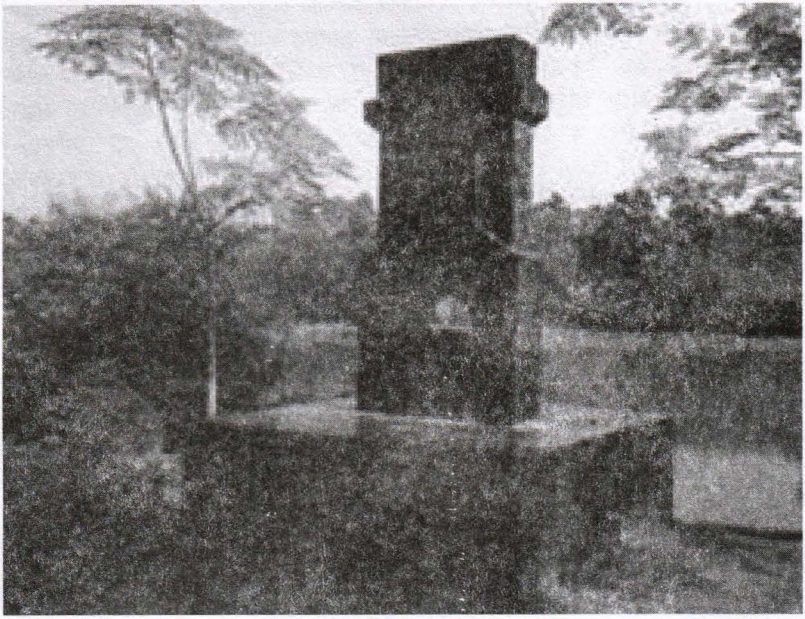

চিত্রাপাড়ে বধ্যভূমি

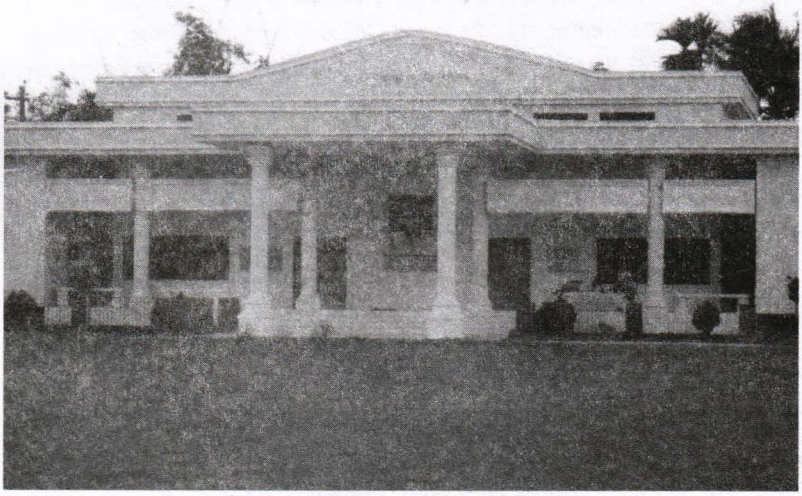

বীর শ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর

www.pathagar.com

এ খবর অচিরেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষিত মুক্তিসেনাবাহিনী ও ইপিআর, পুলিশ, মুজাহিদ ও আর্মির অবসরপ্রাপ্ত সেনারা জানতে পারে এবং তাৎক্ষণিক এ-খবর ভারতে প্রশিক্ষণরত কিংবা প্রশিক্ষণ শেষে দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে এমন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে জানিয়ে দেয়। ফলে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সদস্য ছাড়াও ই.পি.সি.পি-এম.এল বা নকশাল বাহিনীর সদস্যদের সাথেও মুক্তিযোদ্ধাদের অনিবার্যভাবে একটা যুদ্ধের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা যুদ্ধে বৃহত্তর জেলা যশোরের কিছু এলাকায় এমনিভাবে ত্রিমুখী যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। সংখ্যার বিচারে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুক্তিযোদ্ধার নিবাসভূমি নড়াইল। ১৯৭১ সালে নড়াইল মহকুমার লোহাগড়া থানায় নকশাল বাহিনী বা ই.পি.সি.পি-এম.এলের সাথে ও পাকসেনাবাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকারদের সাথে বেশ কিছু যুদ্ধ হয়। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে লোহাগড়া থানার দীঘলিয়ায় নকশাল বাহিনীর সদস্যদের সাথে, জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে লাহুড়িয়া গ্রামে নকশাল বাহিনীর সাথে, নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কুমারডাঙ্গা-ডিগ্রীচরে রাজাকার ও পাকসেনা বাহিনীর সাথে, নভেম্বর মাসের ১৯ তারিখ কালনা ঘাটে পাকসেনাবাহিনীর সাথে, নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কুমড়ি গ্রামে নকশাল বাহিনীর সাথে মুক্তিসেনা বাহিনীর যুদ্ধ হয় এবং ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখ লোহাগড়া সদরে পাকসেনা ও রাজাকারদের সাথে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীর যুদ্ধ হয় এবং মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়লাভ করে ও লোহাগড়া চিরদিনের মতো শত্রুমুক্ত হয়।

অন্যদিকে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিক কালিয়া থানার মির্জাপুর গ্রামে পাকসেনা ও রাজাকারদের সাথে, অক্টোবর মাসের প্রথমদিক কালিয়া থানার চাচুড়ি-কৃষ্ণপুর গ্রামে রাজাকারদের সাথে, অক্টোবর মাসের শেষদিক কালিয়ার বড়দিয়া বাজারে পাকসেনা ও রাজাকারদের সাথে, নভেম্বর মাসের প্রথমদিক কালিয়ার জামরিলডাঙ্গা গ্রামে নকশাল বাহিনীর সাথে, নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কালিয়ার গঙ্গারামপুর পিরোলি নকশাল বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হয় এবং কালিয়া থানা সদর ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখ আক্রমণ হয় ও দীর্ঘ দুইদিন যুদ্ধের পর ১০ ডিসেম্বর চিরদিনের মতো কালিয়া শত্রুমুক্ত হয়। নড়াইল সদর থানায় ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখ মাছিমদিয়া গ্রামে রাজাকারদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হয় এবং ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে নড়াইল সদর থানা আক্রমণ হয় ও দীর্ঘ দুইদিন যুদ্ধের পর নড়াইল চিরদিনের জন্য শত্রুমুক্ত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে অবদান ও আত্মত্যাগের জন্যে নড়াইলের কৃতী সন্তান নূর মোহাম্মদ বীর শ্রেষ্ঠ খেতাব লাভ করেন।

ঠ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

চারণকবি বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী বা বিজয় সরকার (১৯০৩-১৯৮৫)

চারণকবি বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী বা বিজয় সরকার নড়াইল জেলার সদর উপজেলার বাঁশগ্রাম ইউনিয়নের ডুমদী গ্রামে চারিদিকে জলবেষ্টিত এক দ্বীপসদৃশ ভিটায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মেছেন ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ ৭ ফাল্গুন। তাঁর

www.pathagar.com

মাতার নাম হিমালয় অধিকারী, পিতার নাম নবকৃষ্ণ অধিকারী। বিজয় সরকারের জ্যাঠতুতো ভাই অভয় চন্দ্র অধিকারী তাঁকে পড়াশুনা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং বাড়িতে তাঁর কাছেই লেখাপড়ার হাতেখড়ি। অতঃপর শিক্ষক নেপাল চন্দ্র বিশ্বাস ছিলেন সংগীতের উস্তাদ, যাত্রাদলের পরিচালক ও অভিনেতা। লোকে তাঁকে নেপাল পণ্ডিত বলে ডাকতো। কিশোর বিজয় গ্রামের মেয়েলি গান ও জাগরণী গান গেয়ে নেপাল বাবুর প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন এবং লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে নেপাল বাবু বিজয়কে গান শেখাতেন। কিশোর বিজয় অনন্ত মাহাত্ম্য যাত্রাদলে চিত্রাঙ্গদের পুত্রের ভূমিকায় অভিনয় করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর হোগলাডাঙ্গা ইউপি স্কুলে ভর্তি হন। এ সময় মনিন্দ্রনাথ রায়ের যাত্রাদলে বিজয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হোগলাডাঙ্গা ইউপি স্কুলের পাঠ চুকিয়ে বিজয় বাঁশগ্রাম এমই স্কুলে ভর্তি হন। কিছুদিন পর এ স্কুল ত্যাগ করে বিজয় সিংগাশোলপুর কালিপ্রসন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখান হতে তাঁর সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশ শুরু হয়। বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত কিরণচন্দ্র বিজয়কে কবিতা ও গান রচনায় উৎসাহিত করেন। সংগীত, কবিতা, যাত্রাপালা ইত্যাদি উপাখ্যানে মনোযোগী বেশি হওয়ার কারণে বিজয়ের বিদ্যা শিক্ষার প্রতি আগ্রহে ভাটা পড়ে। অন্যদিকে ১৯২৬ সালে পিতার হঠাৎ মরণে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়া হয় না। ফলে বিজয়ের লেখাপড়ার এখানেই ইতি ঘটে।

পিতার মৃত্যুতে নিজের শিক্ষা জীবনের ইতি ঘটে এবং স্থানীয় টাবরা প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ইত্যবসরে জানকিনাথ দত্ত মহাশয় ভালোবেসে বিজয়কে গোপালপুর কাচারির নায়েব নিযুক্ত করেন। এ সময় একদিন হোগলাডাঙ্গা গ্রামে মনোহর সরকার ও রাজেন সরকারের কবিগান অনুষ্ঠিত হয়। মনোহর সরকারের গানে বিজয় মুগ্ধ হয়ে পরদিন সকালে একতারা বাজিয়ে মনোহর বাবুকে একটা গান শোনান। মুগ্ধ মনোহর সরকার বিজয়কে কবিগানে উৎসাহিত করেন। মনোহর সরকারকে গুরু মান্য করে শুরু হয় কবিগান। ১৩৩৩ থেকে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত মনোহর সরকারের সঙ্গী হিসেবে কাটিয়ে পরবর্তীতে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে রাজেন সরকারকে সঙ্গী করে সময় কাটান। সংগীত জীবন ১৩৩৬ বঙ্গাব্দেই মনোহর সরকার ও রাজেন সরকারের অনুমতি নিয়ে পৃথক কবিদল গঠন করেন। সেই তাঁর চলার শুরু আর তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বিজয়ের গানের সংখ্যা নিয়ে নানা মত প্রচলিত থাকলেও এ যাবৎ সংগৃহীত গানের সংখ্যা পৌনে ছয়শত। তিনি রাধাবিচ্ছেদ, কৃষ্ণবিচ্ছেদ, ভাটিয়ালি, সারি, ধুয়া, অষ্টক, পদকীর্তন, ইসলামি গান, ডাকগান, মালসি গান, সখী সংবাদ কবিগান ইত্যাদি রচনা করেন। এভাবে দীর্ঘ জীবনে তিনি প্রায় ৫০ বছর কবিগান গেয়েছেন।

১৯৩৬ বঙ্গাব্দে বিজয় সরকার কলকাতা গমন করেন এবং সেখনে কবি গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম, পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন, মরমি শিল্পী আব্বাস উদ্দিন, সু-সাহিত্যিক হাবিবুল্লাহ বাহার, ধীরেন সেন প্রমুখের সাথে পরিচিত হন। তিনি কবিগানের অর্থ দিয়ে কলকাতায় ২৪ পরগনা জেলার কেউটিয়ায় একটা বাড়ি করেন এবং বাংলাদেশেও বাড়ি আছে। বিজয় সরকার একজন সমাজসচেতন মানুষ ছিলেন এবং সমাজ সংস্কারে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। টাবরা গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে

www.pathagar.com

তিনি তাঁর বাবার নামানুসারে নামকরণের উদ্যোগ নেন এবং যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ঐ স্কুলের নাম নবকৃষ্ণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

১৩৪২ বঙ্গাব্দ বা ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ৩৩ বছর বয়সে প্রথমে বরিশাল নিবাসী বীণাপাণির পাণিগ্রহণ করেন। কন্যা কাননবালা ও মঞ্জু রানিকে জন্ম দিয়ে ১৩৫২ বঙ্গাব্দে (১৯৪৬ খ্রি.) ভুমদী গ্রামেই বীণাপাণি দেহত্যাগ করেন। শিশুকালে মঞ্জুরানি মারা যায়। অতঃপর ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ফরিদপুর জেলায় বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার সাতপাড় গ্রামের প্রমদা বিশ্বাসকে দ্বিতীয় বিয়ে করেন, প্রমদার গর্ভজাত দুই পুত্র যথা : কাজল অধিকারী ও বাদল অধিকারী। শেষ জীবনে কবির চোখে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। এ সময় ১৯৮৩ সালের দিকে তাঁকে কলকাতায় নিজ বাড়িতে নেয়া হয়। অতঃপর তাঁকে দেখভালের সুবিধার জন্য কন্যা কানন বালার বেলুড়ের বিধান চন্দ্র পল্লিস্থ বাসায় স্থানান্তরিত করা হয়। দীর্ঘ ২ বছর অন্ধ অবস্থায় কাটিয়ে দুই পুত্র এক কন্যা স্ত্রী অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে তিনি ১৯৮৫ সালের ৪ ডিসেম্বর নশ্বর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরলোকে পাড়ি জমান। আজও বাংলার আকাশ বাতাসে বিজয় সরকারের পোষা পাখির গানের সুর অনুরণিত হয়। "পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনী একদিন ভাবী নাই মনে।"[১৯]

চারণকবি মোসলেম উদ্দিন বয়াতি (১৯০৪-১৯৯০)

চারণকবি মোসলেম উদ্দিন বয়াতির জন্ম নড়াইল সদর উপজেলার তারাপুর গ্রামে। তিনি জন্মেছেন ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ এপ্রিল মোতাবেক ১৩১০ বঙ্গাব্দের ১০ বৈশাখ। তাঁর মাতার নাম মুসলিমা বেগম, পিতার নাম আব্দুল ওহেদ মোল্যা।

দরিদ্রতার কারণে তার শিশু ও কিশোর বয়স অত্যন্ত দুঃখকষ্টের মাঝে অতিবাহিত হয়। উপরন্তু পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে এক ভাই, এক বোন এবং মাকে নিয়ে গভীর অন্ধকারে পতিত হন। ফলে শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটে অকালেই। সিংগাশোলপুরের জমিদার কালিপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর টোল হতে কাব্যতীর্থ সম্পন্ন করেন এবং সিংগাশোলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে এম.ই পাস করে পুরুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। জীবিকা নির্বাহে কবি দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে শ্রমিকের কাজ করে এবং খুলনা জেলার ফুলতলা বাজারে একটা মনিহারী দোকানে কিছুদিন চাকরি করে সকল ব্যয় নিস্পন্ন করেন।

শিশুবেলা হতে মোসলেম ছিলেন সুরের প্রতি আকৃষ্ট। তিনি যতই বড় হতে থাকেন সুর ও সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে মীর মোশাররফ হোসেন বিরচিত 'বিষাদ সিন্ধু' অবলম্বনে মোসলেম উদ্দিন কয়েকটি ঝুমুর যাত্রাপালা রচনা করেন। যথা—১. হোসেন শহীদ, ২. মোসলেম শহীদ, ৩. কাসেম-সখিনা, ৪. মোসলেম পুত্রবধূ, ৫. এজিদ বধ, ৬. জয়নাল উদ্ধার ইত্যাদি। পালাগুলি রচনা করেন এবং এগুলি মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে তিনি ঝুমুর যাত্রাদল যথা : "ঈমাম যাত্রাদল" গঠন করে পালাগুলি মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করেন। তিনি কালিয়া উপজেলাধীন চাচুড়ী ইউনিয়নের হাড়িয়ারঘোপ গ্রামের সুফিসাধক ফকির মোক্তাদের বিশ্বাস এর নিকট আধ্যাত্মিক বিদ্যা শেখার আশায় শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে মোসলেম ভাবুকগানের দল গঠন করেন। তবে ভাবুকগান মোসলেমের ভালো লাগে না। কারণ এ

www.pathagar.com

গানের ধরন হলো পাল্লার বিষয়বস্তু অনুযায়ী আগে ভাগে গান রচনা করে রাখতে হয় এবং পক্ষ প্রতিপক্ষ শিল্পী পর্যায়ক্রমে ঐ নির্ধারিত গানগুলি সকল আসরে বা মঞ্চে পরিবেশন করেন।

মোসলেম উদ্দিন নিখাদ আন্তরিকতায় জারিগানকে সুধী সমাজের কাছে উপস্থাপন করেন এবং গ্রামীণ জনপদ ও নগর জীবনে সর্বত্র জারিগানকে বাঙালির অন্যতম প্রিয় গান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এজন্য তিনি জারিগানের আঙ্গিকে আধুনিক চিন্তার প্রক্ষেপণ করেন। কাহিনির ক্ষেত্রে পালা হিসেবে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা বা মরমিবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন জারিগানে আনায়ন করেন। সংগীত রচনার ক্ষেত্রে তিনি পয়ার, খাট্ট-পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, একাবলী ইত্যাদি ছন্দে গান রচনা করেন এবং মঞ্চ বক্তব্যের ক্ষেত্রে পাঁচালিতে ছন্দের ব্যবহার শুরু করেন–যা আধুনিক ও অভিনব। মূলত মোসলেমকে বাংলাদেশের আধুনিক জারিগানের জনক বললে অত্যুক্তি হয় না। ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলন সৃষ্টিতে উন্মুক্ত মঞ্চে গণসংগীত পরিবেশনের দ্বারা অধিকারহারা মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ জনগণের পক্ষ হতে চারণকবি উপাধি লাভ করেন। গীতি কবিতার ক্ষেত্রে যশোরভিত্তিক মাইকেল সংগীত একাডেমীর পক্ষ হতে ১৯৭৬ সালে ফররুখ আহমেদ সাহিত্য স্বর্ণপদক লাভ করেন। এ সময় মোসলেম জীবনের অন্যতম সৃষ্টি হলো শাহনামা অবলম্বনে সোহরাব–রোস্তম জারিপালা এবং আরব্য উপন্যাস অবলম্বনে সুখ–দুঃখ জারিপালা রচনা । এছাড়া বিষাদ সিন্ধু অবলম্বনে তিনি ১. কাসেম শহীদ ২. হোসেন শহীদ ৩. হাসানের বিষপান ৪. হোসেন সমাধি ৫. মোসলেম শহীদ ৬. মোসলেম পুত্রবধূ ৭. জয়নাল উদ্ধার ৮. এজিদ বধ ইত্যাদি জারি পালা রচনা করেন। তিনি কাল্পনিক কাহিনিকে কেন্দ্র করে মুসলিম শৌর্যবীর্য সমুন্নত করার প্রত্যয়ে ৯. জান চুরি (সংগৃহীত ও সংশোধিত) ১০. কামেশ্বরী জারিপালা রচনা করেন। তিনি দীর্ঘ ৬০ বছর জারিগান এবং কবিগান পরিবশেন করেন । ২০০৮ সালে তিনি মরণোত্তর গাংচিল সাহিত্য পদক ও সম্মাননা এবং ২০১০ সালে মরণোত্তর সুলতান স্মৃতি পদক লাভ করেন।

মোসলেম উদ্দিন ১২টি পালা কাহিনি এবং প্রায় (৭০০) সাতশতাধিক বিভিন্ন ধরনের যথা : ভাটিয়ালি, ভজন, মুর্শিদি, দেহতত্ত্ব, বাউল, নাত-এ-রাসুল (সা.) হামদ, পল্লিগীতি, শিশুদের জন্য ছড়াগান, ব্যঙ্গগীতি, হালুই, সারি, কীর্তন, অষ্টক, দেশাত্মবোধক, উপদেশমূলক গান রচনা করেন। তিনি বিশেষভাবে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, মরমিতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্ন, প্রশ্নের উত্তর, উপদেশমূলক, আধ্যাত্মিক প্রায় শতাধিক ধুয়োগান রচনা করেন। জারি কবি প্রেমী এলাকাসমূহে মোসলেমের ধুয়োগান প্রখ্যাত। মোসলেমই একমাত্র জারিশিল্পী যিনি সর্বপ্রথম আসর বন্দনা বা ডাক গান, মালসি গান রচনা করেন।

মোসলেম উদ্দিন একজন মুমিন মুসলমান ছিলেন। তিনি চিশতিয়া নিজামিয়া তরিকার তালিম করতেন এবং খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে অসংখ্য ভক্ত মুরিদ রেখে গেছেন। কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বাড়িতে প্রায় ৮০ বছর আগে থেকে ইছালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

নির্লোভ, নির্মোহ, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী মোসলেম ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে কালিয়া উপজেলার মহিষখোলা গ্রামে গোলছেয়ারা বেগমকে বিয়ে করেন। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে পুনরায় কলিয়া উপজেলার নওয়াগ্রামের রূপজান বেগমকে বিয়ে করেন। ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুনরায় ১৩৭৫ সনে সদর উপজেলার উজিরপুর গ্রামের আমেনা বেগমকে বিয়ে করেন। তিন স্ত্রীর গর্ভজাত ছয় পুত্র যথা : মনিরুজ্জামান (তোতামিয়া) ও রওশন আলী, শওকত আলী, বক্তিয়ার হোসেন, লাহুয়ার রহমান, মিজানুর রহমান ও পাঁচ কন্যা—নুরজাহান, ফুলজাহান, লাইলী, শিউলী, ফতেমাতুজ্জোহরা এবং ঘরবাড়ি, জমাজমি রেখে ১৯৯০ সালের ১৯ আগস্ট মোতাবেক ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের ৩ ভাদ্র ২৭ মহররম জগৎ সংসারের মায়া কাটিয়ে পরপারে চলে যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অসংখ্য এতিম, অসহায় মানুষকে নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয় কিংবা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করিয়েছেন। তিনি অর্থ ও জমাজমি দিয়ে অনেক দরিদ্র বংশীয় লোককে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করেছেন।

চিত্রশিল্পী এস.এম. সুলতান (১৯২৪-১৯৯৪)

১৯২৪ সালের ১০ আগস্ট নড়াইল পৌরসভার অধীন মাছিমদিয়া গ্রামে গরিব রাজমিস্ত্রি শেখ মেসের আলীর ঔরসে এবং মাঝু বিবির গর্ভে শেখ মোহাম্মদ সুলতান (ডাক নাম : লাল মিয়া) জন্মগ্রহণ করেন। সুলতান ১৯২৮ সালে নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয়ে মাত্র পাঁচ বছর শিক্ষা গ্রহণের পর রাজমিস্ত্রির কাজে পিতার সহযোগী হিসেবে যোগ দেন। তিনি পিতার ইমারত তৈরির কাজ দ্বারা প্রভাবিত হন এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে আঁকা-আঁকি করতে থাকেন। ১৯৩৪ সালে আশুতোষ মুখার্জির ছেলে ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শনে আসেন । এ সময় সুলতান ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পেন্সিল স্কেচ অঙ্কন করেন। চিত্রটি ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে এবং এ চিত্রের মাধ্যমেই শিল্পী সুলতানের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৩৮ সালে একজন শিল্পপ্রেমী হিসেবে জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায় সুলতানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সুলতানকে কলকাতা নিয়ে আসেন এবং প্রায় তিন বছর সুলতান কলকাতায় রায়ের বাসভবনে থেকে লেখাপড়া করেন। এখানে থাকাকালীন তৎকালীন বিখ্যাত শিল্পসমালোচক ও কলকাতা আর্ট স্কুলের গভর্নিং বডির সদস্য প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। এর ফলে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তির যোগ্যতার অভাব থাকা সত্ত্বেও ১৯৪১ সালে সুলতান কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তির সুযোগ পান। আর্ট স্কুলের সকল ব্যয়ভার প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দী বহন করেন এবং সুলতানকে নিজের দত্তক পুত্র হিসেবে পরিচয় দান করেন। ১৯৪১ সাল হতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সুলতান কলকাতা আর্ট স্কুলে লেখাপড়া করে ঐ স্কুল ত্যাগ করেন। সময়ের পরিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে সুলতান জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করেন এবং বিশ্ব বরেণ্য চিত্রশিল্পীর মর্যাদায় আসীন হন। তিনি কলকাতায় থাকাকালীন ফ্রিল্যান্স পেইন্টার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪৩ সালে সুলতান কলকাতার খাকসার আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৫১ সালে তিনি পাকিস্তানের করাচিতে প্রত্যাবর্তনের পর একটা ফার্সি স্কুলের অঙ্কন শিক্ষক হিসেবে দু'বছর দায়িত্ব পালন

www.pathagar.com

করেন। পাকিস্তানে সে সময়কার বিখ্যাত শিল্পী নাগী, চুগতাই, শাকের আলী, শেখ আহম্মদ প্রমুখ তাঁর বন্ধু ছিলেন। ১৯৪৬ সালে ভারতের সিমলায় প্রথম তাঁর একক প্রদর্শনী আয়োজিত হয় এবং কর্পুরীতলার মহারাজা প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানে তাঁর একক প্রদর্শনী হয় এবং প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন ফিরোজ খান নুন (পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী)। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের করাচিতে তাঁর একক প্রদর্শনী হয় এবং প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন ফাতেমা জিন্নাহ। ১৯৫০ সালে লন্ডনের হ্যামস্ট্রিটস্থ ভিক্টোরিয়া এমব্যাংকমেন্ট আয়োজিত গ্রুপ প্রদর্শনীতে পিকাসো, দালি, ব্রাক, ক্লী প্রমুখের সঙ্গে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

১৯৫৩ সালে তিনি নিজ জন্মভূমি নড়াইলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নন্দন কানন প্রাইমারি স্কুল, নন্দন কানন হাই স্কুল এবং নন্দন কানন পাইন আর্টস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৯ সালে নড়াইলের কুড়িগ্রামে ফাইন আর্টস ইনস্টিটিউট ও যশোরে একাডেমী অব ফাইন আর্টস নামে আর্টস ইনস্টিটিউট (বর্তমানে চারুপিট) প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে ও ১৯৮৭ সালে ঢাকাস্থ জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে তাঁর একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। তিনি ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত ১ম ও ২য় জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালে তিনি প্রথম এশিয়া চারুকলা প্রদর্শনী, বাংলাদেশের বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯০ সালে তিনি নড়াইলে শিশুস্বর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৮২ সালে একুশে পদক, ১৯৮৫ সালে চারুশিল্পী সংসদ সম্মাননা, ১৯৯৪ সালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৮৪ সাল হতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর রেসিডেন্ট আর্টিস্ট এর মর্যাদা পান। ১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ২০০০ সালে সরকার শিল্পীর জন্মভূমিতে 'এস. এম. সুলতান স্মৃতি সংগ্রহশালা' কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন।

সোনা উল্লাহ বয়াতি (১৮৮০-১৯৬৩)

সোনা উল্লাহ বয়াতির জন্ম কালিয়া উপজেলার ডুমরিয়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম বাঠা কাজি। বাঠা কাজির পেশা ছিল কাপড় বোনা। এজন্য লোকে 'জোলা' বলে অভিহিত করতো। সোনা উল্লাহ তাঁত চালনার দিকে না ঝুঁকে গান শেখার প্রতি অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং এক সময় নিজেই রচনা করেন অসংখ্য গান। তিনি ভক্তিগীতি তত্ত্ব, ভাব, আসরবন্দনা, ঠ্যাস গান প্রভৃতি রচনা করেন। তাঁর ঠ্যাস গানের অংশবিশেষ এরকম—

গ্যাড়ামারে গুড়ো করে ছাইবুনে ছুঁচোয়
বুনো মোষের ঠ্যাং ধরে ব্যাঙে টেনে নেয়
দেখলাম বটে সেই মেলার মাঠে
এক রাম ছাগলে তিন ঘোড়া দাবড়ায়
এক মাছরাঙ্গাতে গরু ধরে শূন্যে উড়ে যায়
মরি হায়রে হায় চেলামাছ চিতেল মাছ ধরে ওমনি গিলে খায়॥

www.pathagar.com

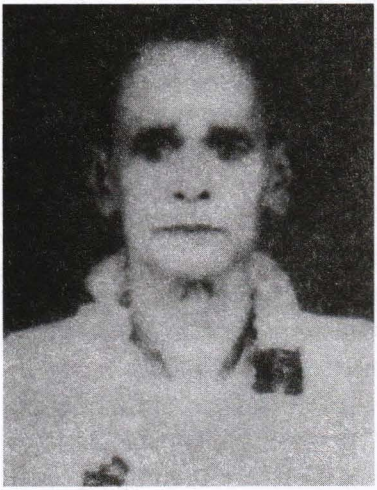

চারণ কবি বিজয় সরকার

চারণ কবি মোসলেম উদ্দীন

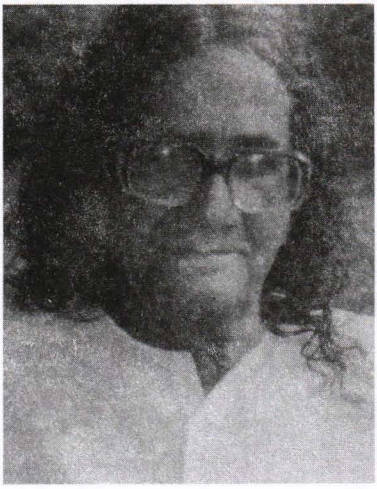

এস এম সুলতান

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ

www.pathagar.com

হাসেম মোল্যা (১৯৩০-১৯৮২)

হাসেম মোল্যার জন্ম কলাবাড়িয়া গ্রামে। পিতা : কালামিয়া। হাসেমকে ছোট বেলায় পাঠশালায় ভর্তি করে দেয়া হয়। কিছুদিন পড়াশুনা করার পর হঠাৎ তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। হাসেম অতঃপর অকূলে পড়েন। লোকের বাড়িতে কামলা থাকতে শুরু করেন। এরপর কোনো রকমে তিনি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অর্থাৎ হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, লবণ, তেলের একটি দোকান করেন। এভাবে সংসার চালাতে হয়। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। যা দেখতেন, যা শুনতেন তা তাঁর রচনায় প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠতো। এই কবি শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যান এবং অনাহারে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর কোনো গান লিখিত আকারে পাওয়া যায় না। লোক মুখে শোনা যায়।

তকু মোল্যা (১৮৭৪-১৯২২)

নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার সরসপুর গ্রামে তকু মোল্যার জন্ম। তাঁর বাবার নাম পবন মোল্যা। তিনি চারণকবি হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে **সায়ের** রচনা করেন তকু মোল্যা। তাঁর সায়েরগুলো আর পাওয়া যায় না। এছাড়ও তিনি ভাবগান ও ধুয়োগান রচনা করেন।

এরফান আলী মোল্যা (১৮৯৫-১৯৪২)

এরফান আলী মোল্যা নড়াইল জেলা কালিয়া উপজেলার দেওয়াডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রমজান উল্লাহ (১৮৫২-১৯০৮) ছিলেন একজন জারি গানের বয়াতি। তাঁর যোগ্যসন্তান এরফান বহুমাত্রিক গানের রচয়িতা ছিলেন না, তাঁর সমসাময়িক বিখ্যাত বয়াতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। তাঁর রচিত গানের অংশবিশেষ :

১

হক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ হরদমেতে জপমন
জেকের ফেকেরে পাবি, আল্লার দরশন॥

২

খোদা কি আকারেতে রয়
যদি আকার ধরে বুঝবি তারে
তবে খোদার শরিক করা হয়॥

৩

কলিতে চাষির ছেলে ভদ্র হলে
খেতে চায় না চ্যালা পুঁটি
হাতে পরে সোনার আংটি
রাস্তা দিয়া চলে ফেরে
ঠিক যেন ডেপুটির ছেলে॥

www.pathagar.com

মো. হানিফ কাজী (১৯০১-১৯৯৩)

মো. হানিফ কাজীর জন্ম নড়াইল জেলার নড়াগাতি থানার মহাজন নামক গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মো. আলেক কাজী। মায়ের নাম কুলসুম বিবি। হানিফ কাজী ম্যাট্রিক ফেল কবি। জীবনের নানা ঘটনা তাঁকে কবি করেছে। তাঁর রচিত চারখানা কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া, ইংরেজি ভাষায় লেখা তাঁর কবিতাও আছে। তিনি লোক গানও রচনা করেন।

মোক্তাদের ফকির (১৮৭২-১৯৫১)

মোক্তাদের ফকিরের জন্ম কালিয়া উপজেলার হাড়িয়ারঘোপ গ্রামে। তাঁর পিতার নাম সোনাম উদ্দিন বিশ্বাস। দাই সম্প্রদায়ের লোক মোক্তাদের ছিলেন জারিগানের বিখ্যাত বয়াতি মোসলেম উদ্দিনের গুরু। আবার তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন কবিয়াল রাইচরণ সরকার ও বাগডাঙ্গা গ্রামের জারিগানের বয়াতি ফজর বিশ্বাসের দ্বারা। প্রথম দিকে তিনি শাহনাল ফকির, লালন শাহ, দুদ্দু শাহ ও পাঞ্জুশাহ ফকিরের গান গাইতেন। পরে নিজেও গান রচনা করেন। তিনি নিজে মোসলেম উদ্দিনকে জড়িয়ে যেমন গান রচনা করেন, তেমনি মোসলেম উদ্দিনও গুরু মোক্তাদেরকে উল্লেখ করে গান রচনা করেন এবং তাঁর একটা গানের বইয়ের নাম রাখেন মোক্তারমালা। মোক্তাদের আসরে গান করতেন না। তবে শিষ্যদেরকে প্রশ্নের উত্তর বলে দিয়ে সাহায্য করতেন।

ত্রিনাথ রায় (১২৬৫-১৩১৫)

ত্রিনাথ রায়ের জন্ম নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার মাউলী গ্রামে। তিনি স্থানীয় গাঁতিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নেতা, যাত্রার অভিনেতা, সমাজকর্মী, গায়ক ও গীত রচয়িতা হিসেবে পরিচিত। সামাজিক অনেক কাজের পাশাপাশি বাঁধুটি গান, রাধাবিচ্ছেদ, কৃষ্ণবিচ্ছেদ, বৈঠকী, হরি সংগীত, বৈদ্যনাথের গান ও ত্রিনাথের গান রচনা করেন। তাঁর রচিত গানের অংশবিশেষ :

১

ডাকে শুকসারি পোহাল শর্বরী
কুঞ্জে এলো না শ্যাম কেলেসোনা,
ছিল শ্যামের আশা হইলো নৈরাশা
হলো উদয় ভানু শ্যামকে চিনি না।

২

তোমার হুকুম যেন নড়ে না দয়াল বৈদ্যনাথ আমার
তোমার হুকুম নড়লে পরে কে ডাকিবে বৈদ্যনাথ বলে
দয়াল চাঁদ আমার॥

রুক্মিনী রায়

ত্রিনাথ রায়ের সন্তান রুক্মিনী রায়ের জন্ম মাউলী গ্রামে। পাঠশালার শিক্ষা শেষে তাঁকে কালিয়া হাই স্কুলে ভর্তি করা হয়। অতঃপর ভর্তি হন পার্শ্ববর্তী সিঙ্গাশোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করার পর তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন মনোহর

www.pathagar.com

সরকারের ও বিখ্যাত কবিয়াল বিজয় সরকারের কাছে। এ শিক্ষায় তিনি পারদর্শিতা অর্জন করলেও কোনো অজ্ঞাত কারণে তিনি কবিগান ছেড়ে দেন। এরপর নার্স হিসেবে খুলনা সদর হাসপাতালে কর্মজীবন শুরু করেন। এখান থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি যাত্রা গানের দল ও অষ্টক গানের দল করেন। যাত্রা ও অষ্টক গানের দলে তাঁর রচিত গান গীত হয়। জানা গেছে তিনি কয়েক শত গানের রচয়িতা। তাঁর গানের নমুনা :

১

হলো ঘোর কলিকাল হায়রে কপাল এই ছিল বরাতে
মেয়ে লোকের হলো বৃদ্ধি বেড়ে গেল বিদ্যাবুদ্ধি
এখন কুবুদ্ধির বল বাড়ালো ধরাতে॥

২

জ্বলে বিচ্ছেদ আগুন সহস্রগুণ রাধিকার বুকে
অন্তর পুড়ে হলো কালো বিহনে শ্যাম চিকন কালো
মনের ভাব প্রকাশের ভাষা নাই মুখে॥

৩

কোথায় মা গো ত্রিলোকতারিণী
স্বতঃ রজঃ তমঃ ত্রিগুণধারিণী
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী
কালের ভয়ে ডাকি শিবানী দুঃখহারিণী।

ছায়েজ উদ্দিন মোল্যা (১৮৮৫-১৯৬০)

খুলনা জেলার নলিয়ার গ্রামে জন্ম ছায়েজ উদ্দিন মোল্যার। পিতার নাম ওখিল উদ্দিন মোল্যা। নলিয়ারচর গ্রামটি ভাগ হয়ে খুলনা ও নড়াইলের মধ্যে পড়েছে। নড়াইল জেলার অংশটি কালিয়া থানার কলাবাড়িয়া ইউনিয়নের মধ্যে পড়ায় তিনি কালিয়া উপজেলার অধিবাসী হিসেবে গণ্য হন।

ছায়েজ উদ্দিন জারিগানের প্রাচীন ধারা থেকে আধুনিক ধারায় আনার জন্যে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি জারিগানের বয়াতি রাহাতুল্লাহ, কালাচান, ইরফান, আছির উদ্দিন, সোনাউল্লাহসহ তোরাপ ও মোসলেম উদ্দিনের সঙ্গে জারিগান পরিবেশন করেন। তিনি জারিগানের কোনো পালা লিখেছেন কিনা তা জানা যায় না। তবে জারিগান নিরপেক্ষ বহু ধুয়োগান রচনা করেছেন।

তাছাড়া হিন্দু-মুসলমানের কাজে অর্থাৎ গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে নিরপেক্ষভাবে সায়ের রচনা করেন। তাঁর সায়েরগুলির মধ্যে, 'বড়নালের ক্যাজে', 'গাছবাড়িয়ার ক্যাজে', 'মানিকদিয়ার ক্যাজে', 'গঙ্গাচুন্নার ক্যাজে' প্রভৃতি বিখ্যাত। তিনি প্রায় ৪৫ বছর যাবৎ জারিগান পরিবেশন করেন।

মওলন খাঁ (১৯০৩-১৯৮৩)

নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার রামপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মওলন খাঁ। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ বাবু খাঁ। মওলন খাঁ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। লোকসংগীতের প্রতি আকর্ষণবশত মওলন খাঁ মুন্সি মোজাহার উদ্দিনের শরণাপন্ন হয়ে

www.pathagar.com

তাঁর কাছে জারিগানের পাঠ নেন। পাঠান্তে বিভিন্ন স্থানে জারিগান পরিবেশন করেন। তিনি যাঁদের সঙ্গে জারিগান পরিবেশন করেছেন তাঁরা হলেন মোসলেম উদ্দিন বয়াতি, আব্দুল গনি, সোনাউল্লাহ, ছায়েজ উদ্দিন, রাহাতুল্লাহ প্রমুখ।

তাঁর গানের অংশবিশেষ—

১

শোন বলি অবুঝ মন করো গো সাধ্য সাধন
ভজো নিরিখ নিরঞ্জন নবির তরিক ধরে,
পড় কলেমা নামাজ যাতে হবে কাজ
ভব মাঝারে ভক্তি ভরে॥

২

নবিজি এলেন ভবে করিতে উন্মতের উদ্ধার
ফুল রূপেতে এই জগতে হলেন প্রচার॥
ও ফুল স্বর্গে ছিল মর্তে এলো
একিনের পরে ভর করিলো
দেখতে কিবা চমৎকার
ও ফুল ধরতে গেলে যায় না ধরা
ডাল ছাড়া ফুল শূন্যভর-
সেই ফুলের মূলে বসা আছে গো
আমার দ্বীনের রসুল পয়গম্বর॥

গোপাল ফৌজদার

অনুমান করা হয় ১৮৩৯ সালের দিকে নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার মির্জাপুর গ্রামে গোপাল ফৌজদারের জন্ম হয়। কালিসাধক গোপাল ফৌজদারের গান রচনার ধরন দেখে অনেকে তাঁকে রামপ্রসাদের দ্বিতীয় সংস্করণ বলতো। বিদ্যা শিক্ষা তেমন না হলেও কালিসাধন সংগীত ছাড়া দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর গানের উত্তর রচনার মধ্যে দিয়ে ছোট কালিয়া গ্রামের প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের উজ্জীবন হয়ে থাকবে। তাঁর গানের কোনো খাতা পাওয়া যায়নি। অসংখ্য গানের রচয়িতা গোপাল ফৌজদার সত্যি সংগীত জগতের ফৌজদারই ছিলেন। তাঁর গানের অংশবিশেষ পরিবেশিত হলো :

১

ভব ভয় অভয় দে মা তারা
হেরিয়ে তব তরঙ্গ আতংকে হই আত্মহারা॥

২

কি করে পার হবি তুই ত্রিবিনায়
কপট সাধু যারা যাচ্ছে মারা
ত্রিবিনার ত্রিমোহনায়॥

৩

পরের প্রেমে পরান দিয়ে মজবো না রে প্রাণ সখি,

www.pathagar.com

যে জন পরের প্রেমে পরান দেছে তার
পরের জন্য ঝরে আঁখি॥

মাখন বাদ্যকর (মৃত্যু : ২০০১)

কালিয়া উপজেলার বড়কালিয়া (ঘোষপাড়া) গ্রামে বাদ্যকর সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্ম হয় মাখন বাদ্যকারের। তাঁর পৈতৃক পদবি বিশ্বাস। পিতার নাম জ্ঞানদা বিশ্বাস। জ্ঞানদা বিশ্বাস ঢোল বাজনায় বিশারদ ছিলেন। তাঁর সন্তান হিসেবে মাখন ক্লারনেট, আড়বাঁশি, সানাই, কর্নেট, ঢোল, তবলা, আধেঙ্গা প্রভৃতিসহ হারমোনিয়ামে ছিলেন যাদুকর। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া তেমন না হলেও রাগসংগীতে তাঁর দক্ষতা ছিল। ঠিক এ জন্যেই বাংলাদেশের বিখ্যাত অপেরা পার্টি যেমন- বাবুল অপেরা, দিপালী অপেরা, জোনাকি অপেরা, গীতশ্রী, চারণিক, জয় দুর্গা অপেরাসহ কালিয়াতে খলিলুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত রঙমহল অপেরায় মাখন ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা গানের শিক্ষক। নদী ভাঙনের ফলে জায়গা জমির অভাবে মাখন বড়কালিয়ার আবাস ছেড়ে রায়গ্রাম-কলাগাছি (লোহাগড়া) গ্রামে বসবাস করেন।

রসময় সরকার (১৯২১-১৯৯০)

জন্ম হাড়িয়ারঘোপ গ্রামে। পৈতৃক পেশা মাছ ধরা। এ পেশাকে পরিহার করে রসময়ের পিতা রাজেন্দ্রনাথ মালো কবিয়াল হয়ে ওঠেন। রসময় বাবার পথ ধরে কবিগানে এগিয়ে আসেন। তিনি শুধু কবিগান নয় সত্যস্বর যাত্রা ইউনিটের জন্য 'কারবালায় হোসেন' নামে একটি যাত্রাপালা রচনা করেন।

মুন্সি মোজাহার উদ্দিন (১৮৬৭-১৯৪৮)

কালিয়া উপজেলার টোনা গ্রামে জন্ম। এন্ট্রান্স পাস করা গীতিকার তিনি। তিনি মুসলিম সমাজকে শিক্ষিত করার জন্যে তৎপর ছিলেন। ঠিক এ কারণে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন পাঠশালা, স্কুল, মাদ্রাসা ও এতিমখানা। দীর্ঘদিন খাশিয়াল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি দুখানা কাব্যগ্রন্থ ছাড়া অনেক গান রচনা করেন।

পাচু শাহ ফকির

ভাবগান ও বিচার গানের রচয়িতা পাচু শাহ ফকিরের জন্ম বল্লাহাটি গ্রামে। পিতা মু. ফজলু খাঁ। বিদ্যাশিক্ষার অন্তরায় দারিদ্র্য। তবু তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে মাওলানা রুহুল আমিনের সান্নিধ্য পেয়ে। তিনি বায়েত দেননি, তবে বায়েত হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি নানা পর্যায়ের অসংখ্য গান রচনা করেন। সংরক্ষণের অভাবে তাঁর গান নষ্ট হয়ে গেছে।

বিনোদ গোঁসাই

কালিয়া উপজেলার নলামারা গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা কাশীনাথ পোদ্দার। দারিদ্র্যের কারণে পাঠশালা অতিক্রমণ করতে না পারলেও বিখ্যাত কবিয়াল রাজেন্দ্র নাথ সরকারের সান্নিধ্যে থেকে কবিগানে তালিম নেন। তবে তিনি কবিয়াল হতে পারেননি। কিন্তু বহুমাত্রিক গানসহ রচনা করেছেন ত্রিনাথ ঠাকুর, ভক্ত হীরামন নামে দুটি নাটক ও 'জীবন শেষে' নামে একটি উপন্যাস।

www.pathagar.com

প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস (১৯০০-১৯৭২)

ঐতিহ্যবাহী কালিয়া উপজেলার বিখ্যাত কবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের জন্ম ছোট কালিয়া গ্রামে। পিতা গগনচন্দ্র, মাতা লক্ষ্মীরানী। পিতা বাজারে শাক-পাতা বেচতেন, আর মা লোকের বাড়িতে ধান ভানতেন। এরকম একটি সংসারে জন্ম প্রফুল্লর। তবু তিনি কালিয়া হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন এবং নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হয়েও শেষ করতে পারেননি। এরপর বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি বহুমাত্রিক গানের রচয়িতা। এযাবৎ কালে তাঁর সংগৃহীত গানের সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

বহু গানের মধ্যে বোধ করি কমিক গান তাঁর অবিনাশী সৃষ্টি। জীবন দেখার চোখ এত তীক্ষ্ণ যে তিনি জীবনের তলা অবধি দেখতে পেয়েছেন বলেই গ্রাম্য ভাষায় রচনা করতে পেরেছেন এমন ভাষাচিত্র। এ ছবির বিষয় স্ত্রীর ভাত পরিবেশনা এবং স্বামীর অনুযোগ ও স্ত্রীর উত্তর।

ভাতের থালখান দিলি দ্যাখদিন কি হেলা ছেদ্দায়
কতকটা মাটিতে প'লো কতক প'লো আমার গায়।
ভাত দিলি তার জল তো দিলি নে
তোরে যে কি অরবো তাতো দিশে পাচ্ছিনে
দরপচিশন ঠিক রাখলি নে
মরে গেলাম তোর জ্বালায়।
হইগে আমি লোক ছাতামাতা
তোর কাছে তো তেমু আমি পতি দেবতা
আমার মনে দিলি ব্যথা
ঠেকপি পরকালের দায়।
অ্যাহোন যদি বেশি কিছু কই
পাড়ার নোকে আসে অ্যাট্টা করবেনে হৈচৈ
মানের ভয়ে চুপ করে রই
নাই পা'য়ে পাও দিস মাথায়।
প্রফুল্ল কয় কলি কালে কল,
কথায় আছে কালে হবে মেয়ে লোক প্রবল
রাগ করে আর হবে কি ফল
খাও যে সময় যা মাপায়॥

স্ত্রী স্বামীর কিছু দোষ ত্রুটি উল্লেখ করে বলছে :

ব্যস্ত সোমায় যা পাইছো চোখ কান বুজে খাও
থাবা খানেক ভাত পড়িছে মাটিরতে কুড়োয়ে নাও।
জল তো তোমার না অলিও অয়
কাছাতে হাত ঘষা দিয়ে খাও তো সব সময়
ভদ্দরনোক হও সোমায় সোমায়
তাইতি অত কষ্ট পাও।
ভক্তি তুমি থোবা কোন্ জাগায়
পাত্তরে যা ধরে তারতে বেশি খেডা পায়?
জোর করে যে খানিকটে চায়

www.pathagar.com

সে পাবে না এক তোলাও।
আগে নইচে ছোট বাচ্চাডা
তারির মধ্যি তোমার আবার দারুণ তাগাদা
কমডা তাল করি সোমাধা?
দুইহেন হাত আর দুইহেন পাও।

এরকম গানের রচয়িতা প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছেন। তাঁর গান প্রকাশিত হলে লোক ঘরানায় যোগ হবে নতুন মাত্রা।

কাশীনাথ সরকার

ঊনবিংশ শতাব্দীতে লোহাগড়া উপজেলার জয়পুর গ্রামে কাশীনাথ সরকার নামে একজন কবিয়ালের খোঁজ পাওয়া যায়। তার নিজের কবি গানের দল ছিল। তারই সন্তান প্রখ্যাত কবিয়াল তারক গোঁসাই। এছাড়া নওয়াগ্রাম ইউনিয়নের ছত্রহাজারি গ্রামের কবিয়াল নবকৃষ্ণ মালো (৪৫), পিতা- শ্যামা প্রসাদ মালো, দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে কবিগান গেয়ে থাকেন। এর পাশাপাশি তিনি কৃষি কাজের সাথে জড়িত।[২০]

তারক গোঁসাই

ঊনবিংশ শতাব্দীতে লোহাগড়া উপজেলার জয়পুর গ্রামে কাশীনাথ সরকার নামে একজন কবিয়ালের খোঁজ পাওয়া যায়। তার ছেলে তারক গোঁসাই। তারকের বাবা কাশীনাথের মৃত্যুর পর তিনি পুরোপুরিভাবে কবিগান শুরু করেন। নিজে দল গড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে কবি গান গাইতে শুরু করেন। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে কবিয়াল তারক গোঁসাইয়ের নাম ও যশ। এ সময় তিনি দেড় হাজারেরও বেশি কবিতা ও কবি গান রচনা করেন। পরবর্তী সময়ে জীবনের শেষ দিকে তিনি মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী নামে এক ধর্ম গুরুর নিকট দীক্ষা নেন এবং হিন্দু ধর্মের মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। এই সাধক পুরুষ ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১ অগ্রহায়ণ পরলোকগমন করেন। প্রতিবছর মতুয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রদর্শক তারক গোঁসাইয়ের জন্ম (অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম অমাবস্যা তিথি) এবং মৃত্যুবার্ষিকীতে (ফাল্গুন মাসের শিব চতুর্দশী) দুদিনব্যাপী কবিধামে নানা অনুষ্ঠান ও মেলার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকে অধিবাস, মঙ্গলঘট স্থাপন, পূজা-অর্চনা, প্রসাদ বিতরণ, নামসংকীর্তন ইত্যাদি। সারা দেশ থেকে হিন্দু মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষসহ তারক গোসাঁইয়ের লক্ষাধিক ভক্ত এ দুটি মেলায় সমবেত হয়। তবে জন্মবার্ষিকীর মেলায় বেশি মানুষের সমাগম ঘটে।

সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী (১৯০৯-১৯৮৫)

১৯০৯ সালে মাইজপাড়া ইউনিয়নের কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামে মাতা মহাদেবীর কোলে জন্ম নেন। পিতা মহাদেব অধিকারী একজন সাধারণ মানুষ ও বাদক ছিলেন। সুরেন খুলে নামে এলাকায় তার জনপ্রসিদ্ধি আছে। তিনি ঢোল, দোতারা, একতারা, সারিন্দা, তরঙ্গলহরী (স্থানীয় নাম খোমক) তৈরি করতেন এবং বাজাতে পারতেন। এলাকায় তার অনেক শিষ্য আছে। এছাড়া মাইজপাড়া ইউনিয়নের কোদলা গ্রামের রামপদ বিশ্বাস ভালো মৃদঙ্গ বাজাতেন। বোড়ামারার বল্লাল সরকার মৃদঙ্গ ভালো বাজাতেন। দেবীপুরের সুধাংশু রায় ভালো একতারা বাদক, দুলাল বিশ্বাস আড়বাঁশি বাদক। সিংগাশোলপুরের ঠান্ডা তরঙ্গলহরী বা খোমক বাজিয়ে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী কিরণ

www.pathagar.com

চন্দ্র রায়ের সঙ্গেও গানে সহযোগিতা করেছে। আলী আকবর সিংগাশোলপুর ভালো দোতারা বাজান।[২১]

সৈয়দ হাসমত আলী

সৈয়দ হাসমত আলী (৫৮), পিতা সৈয়দ হানেফ আলী, কুমড়ি, দিঘলিয়া ইউনিয়ন, লোহাগড়া। বর্তমানে তিনি নড়াইল শহরে বসবাস করছেন। এ পর্যন্ত তিনি ৫শ কবিতা, ২শ গান, ৩০টি গল্প, ১টি উপন্যাস, ২টি নাটক লিখেছেন। ইতিমধ্যে ১টি কবিতা ও ১টি গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তিনি নড়াইলের ঐতিহ্য ও পরিচিতি ও লোকসংগীত নিয়ে কাজ করছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. মহসিন হোসাইন, কালিয়া উপজেলার ইতিহাস-সংস্কৃতি কর্মকাণ্ড, কালিয়া : কালিয়া উপজেলা পরিষদ, ১৯৮৭, পৃ. ১
২. ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী
৩. আজিবর রহমান, বাঁশগ্রাম, নড়াইল
৪. খন্দকার মোস্তফা বিল্লাহ, পিতা : খন্দকার আবুল কাশেম তারিক বিল্লাহ, শহীদ মিজান সড়রক, নড়াইল, চাকরিজীবী, শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র, বাংলাদেশ আনসার, বি.এ, এল.এল.বি, তারিখ : ০৯.০৯.১১
৫. বিজন কুমার সাহা, নড়াইল শহর, নড়াইল, তারিখ : ১১.৯.১১
৬. শংকর কুমার বিশ্বাস, নড়াইল শহর, নড়াইল, তারিখ : ১৪.৯.১১
৭. দুলাল চন্দ্র সাহা, সুলতান কমপ্লেক্স, নড়াইল, তারিখ : ২১.৯.১১
৮. সাক্ষাৎকার–শরীফ আতিয়ার রহমান, শিক্ষাবিদ, তারিখ : ২৯.৯.১১
শরীফ হুমায়ুন কবির, উপজেলা চেয়ারম্যান, সদর, নড়াইল, তারিখ : ৩০.৯.১১
৯. তথ্য অফিস, নড়াইল, তারিখ : ১৪.৯.১১
১০. উপজেলা পরিসংখ্যান বিভাগ, তারিখ : ১৪.০৯.২০১১
১১. সৈয়দ আশরাফ আলী (৬০). শিয়েরবর, শালনগর ইউনিয়ন, লোহাগড়া, তারিখ : ৩০.০১.১২
১২. শ্রী বিনয় কুমার দাসগুপ্ত, *কুল-দর্পণ, কালিয়া,* ও *বেন্দার বৈদ্য সমাজ,* ৩য় খণ্ড, বেন্দা কলকাতা : কালিয়ানিবাস, ব্যারাকপুর থেকে প্রকাশিত, ১৯৬৭ খ্রি., পৃ. ১৯
১৩. শিক্ষক রাজীব আহম্মেদ (৬০), ইতনা ইতনা, ইউনিয়ন, লোহাগড়া, তারিখ : ২৯.০২.১২
১৪. অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, নড়াইল, তারিখ : ২১.৯.১১
১৫. মো. দেলোয়ার হোসেন তরফদার, তুলারামপুর, সদর, নড়াইল। প্রভাষক (ইংরেজি) বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ মহাবিদ্যালয়, তারিখ : ১৮.৯.১১
১৬. আজিজুর রহমান ভূঁইঞা, সাবেক চেয়ারম্যান, চণ্ডিবরপুর ইউনিয়ন, নড়াইল
১৭. যশোর-খুলনার ইতিহাস- সতীশ চন্দ্র মিত্র
১৮. আ. গফুর, সাবেক অধ্যক্ষ ও সমাজবিজ্ঞানী, নড়াইল। তারিখ : ৪.১০.১১
১৯. আকরাম শাহীদ চুন্ন (যুগ্ম সদস্য সচিব, বিজয় সরকার ফাউন্ডেশন) হামিদ ভিলা, আলাদাতপুর, নড়াইল, ব্যবসায়ী (বি.এস.এস), তারিখ : ২৪.১০.১১
২০. বয়াতি কামরুল ইসলাম (৪৫), আকরাবাড়ি, দিঘলিয়া ইউনিয়ন, লোহাগড়া, নড়াইল
২১. ইলিয়াছ যাতি, ৫.১১.১১

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য আমাদের পল্লির মানুষের বিচিত্র রূপ, রস, সুরকে ধারণ করে ঐতিহ্যময় অকৃত্রিম রূপকে প্রকাশ করে আসছে। যা জাতীয় সংস্কৃতিরই অঙ্গ বলা যায়। লোকসাহিত্যের বিষয় ও পরিবেশনা বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হলেও নিবিড় ঐক্য এবং যোগাযোগ রয়েছে। নড়াইল অঞ্চলের লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হলো।

ক. লোকগল্প-কাহিনি-কিস্‌সা

গল্প বলা এবং গল্প শোনা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বলা যায়। সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই লোকগল্পের সৃষ্টি। মানুষের মুখে মুখে পরমপরাগতভাবেই গল্পগুলো প্রাসঙ্গিকক্রমে পরিবেশিত হয়ে আসছে। লোকগল্পে হাস্যরসই প্রধান। তবে সমাজের ও মানুষের নানান অসঙ্গতি ফুটে ওঠে যা শিক্ষণীয় উপাদান হিসেবে ক্রিয়াশীল। নড়াইল অঞ্চলেও লোকগল্প রয়েছে যা অনেক অঞ্চলের লোকগল্পের সঙ্গে কাহিনিগত কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, তাই বলে হুবহু মিল নেই।

লোকগল্প-১

নদীতে একজন মহিলা তার ছোট ভাইকে গোসল করাচ্ছিলেন। ফুটফুটে ছেলেটি ও মহিলার চেহারার সাদৃশ্য দেখে কৌতূহলী নাবিক ছেলেটি এবং মহিলার সম্পর্ক জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং মহিলা এর জবাব দেন ধাঁধার মাধ্যমে।

নাবিক : ওহে ছেলের মা-ঘসো মাজ কার গাঁ?
মহিলা : ঘসিমাজি যার গা–এ ছেলেতো আমার না।
ছেলের বাপ যার শ্বশুর–আমার বাপ তার শ্বশুর
বেয়ে যাও বাঁক দুই–ভেবে দেখ মাস দুই।[১]

লোকগল্প-২

এক কাঠুরিয়ার স্ত্রী পরকীয়া করে স্বামীকে হত্যার উদ্দেশ্যে প্রেমিকের সঙ্গে পরামর্শ করে। পরদিন কাঠুরিয়াকে দুপুরে খাবার হিসেবে চাল ও গুড়ের তৈরি নাড়ু দেয় ১২টা। জঙ্গলে কাঠ কাটতে কাটতে হঠাৎ কাঠুরিয়া দেখে একদল ডাকাত আসছে। ভয়ে কাঠুরিয়া কুড়াল নিয়ে গাছে উঠে গামছা দিয়ে গাছের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখে। ডাকাতদল ঐ গাছের তলায় হাজির হয়ে লুণ্ঠিত মালামাল রেখে পুটলিতে বাঁধা ১২টি নাড়ু দেখতে পায় কিন্তু কোনো লোকজন দেখতে পায় না, ক্ষুধার্ত ডাকাতদল নাড়ুগুলি খেয়ে নেয় এবং ১২জন ডাকাত মারা যায়। হঠাৎ একটা হিংস্র বাঘ গাছতলায় মানুষ

www.pathagar.com

দেখে আক্রমণ করে। বাঘের হুংকারে ভয়ে কাঠুরিয়ার হাতের কুঠার পড়ে যায় বাঘের মাথার উপর এবং মাঘ মারা যায়। কাঠুরিয়া নিচে নেমে লুণ্ঠিত ধনরত্ন নিয়ে বাড়ি ফেরে। এদিকে কাঠুরিয়ার স্ত্রী নিশ্চিন্তে প্রেমিকার সঙ্গে রসরঙ্গে মত্ত থাকা অবস্থায় কাঠুরিয়া বাড়িতে ফিরে স্ত্রীকে ডেকে বলে– হোচেনের মা হোচেনকে খেতে দিয়েছ তো (হোচেন হলো ধারালো শিংওয়ালা ষাঁড়) স্বামীর আগমনে প্রেমিকাসহ কাঠুরিয়ার স্ত্রী ভীত সন্ত্রস্ত হয়। প্রেমিকা পিছনের বেড়ার উপর দিয়ে লাফিয়ে পড়ে এবং ষাঁড় (এড়ে গরু) এর শিং এর উপর পড়ে পেটে শিং ঢুকে যায় ও মরণ চিৎকার করে। লোকজন হাজির হয়ে জানতে চায় কি হয়েছে। কাঠুরিয়া ধাঁধার ছড়ায় জবাব দিয়ে বলেন :

কপালে থাকিলে বিদ্যা পথে মেলে সোনা,
যবের ছাতুর নাড়ু খেয়ে মরলো বারো জনা,
হাতের তে পড়িলো কুঠার মরলো বনের বাঘ,
বাড়ির হোচোন মারলো ডোচোন ঘুচলো মনের রাগ।[২]

লোকগল্প-৩

শিক্ষক ছাত্রকে বললেন "মনে কর তোমার একটা পাখি আছে। পাখিটি একদিন সকালে আকাশের বাঁকে কিছু পাখি দেখে জিজ্ঞাসা করলো—হে ভাই তোমাদের সংখ্যা কত? আসলে ঐ দলে মোট ৩৬টি পাখি ছিল। কিন্তু পাখির দলনেতা সরাসরি জবাব না দিয়ে ধাঁধায় জবাব দিলেন। যথা—

আমরা যত–তার পিছে তত,
তার পিছে আধা–তার পিছে পোয়া,
তোমারে দে পুরোয় গেলাম শোয়া। (শতক)

লোকগল্প-৪

এলাকায় একজন মানুষ যথেষ্ট জ্ঞানী। ঐ অঞ্চলের মানুষের যে কোনো সমস্যা সমাধানের উপায় জানতে কিংবা কোনো কাজ করার আগে কি করা উচিৎ এমন সিদ্ধান্ত নিতে এলাকার মানুষ ঐ জ্ঞানীর কাছে যায়। সকলে ঐ জ্ঞানি ব্যক্তিকে পণ্ডিতজি বলে ডাকে। একদিন এলাকায় তিন ব্যক্তি একত্রে পণ্ডিতজির বাড়িতে যাবার উদ্দেশ্যে নদীর তীর বেয়ে হেঁটে যায়। তারা সকলে দেখতে পায় পণ্ডিতজি নৌকায় চড়ে কোন্ দিকে যেন গমন করছেন। লোক তিনটি নদীর কূলে দাঁড়িয়ে একত্রে পণ্ডিতজিকে হাতের ইশারায় এবং চিৎকার করে ডাকতে থাকে। লোকগুলির ডাকে পণ্ডিতজি নাবিকদের নৌকা থামানোর আদেশ করেন এবং নদীর কিনারে নৌকা ভিড়িয়ে লোকগুলির কাছে জিজ্ঞাসা করেন, আমি খুব ব্যস্ত কী ব্যাপার তোমরা আমার যাত্রায় বাধা দিলে কেন- তা জানাও।

প্রথম লোকটি বললো- পণ্ডিতজি আমি জীবনে প্রথম একটু জমাজমি ক্রয় করতে চাই। এ বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি জমাজমি ক্রয় করবো। জমির ধরন কি হবে দয়া করে জানাবেন কি?

দ্বিতীয় লোকটি বললো- আমার একমাত্র পুত্র সন্তানকে বিয়ে দিতে কেমন ঘরের এবং কি ধরনের মেয়ে পছন্দ করলে আমার সন্তানের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে, দয়া করে জানালে আমি সে মতে ব্যবস্থা নেব।

www.pathagar.com

তৃতীয় লোকটি বললো- পণ্ডিতজি আমি গরিব মানুষ এক জোড়া গরু কিনবো এবং এদের দিয়ে হাল চাষ করে জীবন চালাবো। কেমন ধরনের গরু কিনলে হালচাষে আমি উপকৃত হবো। পণ্ডিতজি দয়া করে বললে সেই রকম গরুই আমি ক্রয় করবো। পণ্ডিতজি একটা শ্লোকের মাধ্যমে ঐ তিন ব্যক্তির জবাব দিলেন এবং নাবিকদের নৌকা সামনে চালানোর নির্দেশ দিলেন। যথা–

ধারে উঁচু, মদ্দি নিচু– ঘোন বাড়ায় পাও
যার মা ভালো, তার ঝি ভালো. বাওরে বিটা বাও।

অর্থাৎ চারিদিকে উঁচু কিন্তু মাঝখানের জমি নিচু ঐ নিচু জমি ক্রয় করলে লাভবান হওয়া যায়।

যে গরুটা হাঁটতে গেলে ঘনঘন পা ফেলে ঐ গরু কাজেকর্মে ভালো হয়।
যে মায়ের স্বভাব চরিত্র ভালো সেই মায়ের কন্যা স্বাভাবিকভাবে ভালো হয়।[৩]

পাপের পরিণতি

বাগদাদের বাদশাহ হারুন-অর-রশিদ একদিন লোকলশকর পাইক-পেয়াদা নিয়ে ভ্রমণে চল্‌ছেন। চলার পথে দেখতেছেন যে, একটা অন্ধ ফকির মানুষের কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে। ভিক্ষা দিলে তার হাত দুটো জড়ায়ে ধরে বলতিছে, 'বাবা কে তুমি, আমাকে তো ভিক্ষা দিলে এবার আমার দু'গালে দুটো চড় মেরে দাও।' বাদশা হারুন-অর-রশিদ সেটি দেখতিছেন। তিনি ভাবলেন লোকটা ভিক্ষা করছে কিন্তু চড় মারতে বলছে কেন? কৌতূহলবশত তিনি তার কাছে গেলেন। শব্দ পেয়ে ভিখেরি বলতিছে 'বাবা, কে যাও, আমারে দুটো ভিক্ষে দাও।' বাদশা ভিক্ষে দিবার পর ভিখেরি তার হাত দুটো জড়ায়ে ধরে দুই গালে দুটো চড় মারতি বলে। হারুন-অর-রশিদ ভিখেরিকে জিজ্ঞেস করলেন যে, দু'গালে দুটি চড় খাওয়ার কারণ কি? ভিখেরি বাদশাহকে জিজ্ঞাস করলে, আপনি কে? বাদশা তাঁর পরিচয় দিলেন। ভিখেরি বললে, আমি বিশ বছর ধরে এখানে ভিক্ষে করতিছি আর দু'গালে দুটো চড় খাচ্ছি। কিন্তু কেউ আমাকে জিজ্ঞাস করেনি এই চড় খাওয়ার কারণ। আপনি যখন বাদশাহ হয়ে আমার এই চড় খাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন তা হলে শোনেন এর রহস্য।

আমি খুব গরিব লোক ছিলাম। আমার মনে সব সময় একটা চিন্তা কাজ করতো যে, আমি কি করে ধনী হতে পারি। এরকম ইচ্ছে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এক দরবেশের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাকে আমার বড়লোক হবার কথা জানালাম। তিনি আমাকে বনের মধ্যে একটি বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে একটা চাবি দিয়ে পর পর কয়েকটি দরজা খুললেন। আমরা ভাগাভাগি করে ৪০টি ছালা ও ৪০টি উট নিয়ে গেছিলাম। দরবেশ ধনরত্ন দেখিয়ে বললেন, যত পারো এখান থেকে ধনরত্ন সংগ্রহ কর। আমরা ৪০টি ছালা ভরে রত্ন সামগ্রী উটের পিঠে দিয়ে রওয়ানা হলাম এবং এবার পথে ভাগ হবে। দরবেশ যাবেন তাঁর পথে আর আমি আমার পথে। আমরা উটগুলো সমান ভাগ করে নিয়ে এলাম।

খানিক পথ আসার পর আমার মনে হলো দরবেশের তো কেউ নেই। সে এত রত্ন দিয়ে কি করবে? তার থেকে আমি অর্ধেক নিয়ে আসি। এরকম চিন্তা করে আমি তাঁর

www.pathagar.com

কাছে গিয়ে আমার প্রস্তাব রাখলাম। তিনি আমাকে ১০টি উট দিয়ে দিলেন। এভাবে একই মনোভাব থেকে আমি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার গিয়ে সব উটগুলো রত্নসহ নিয়ে সামান্য অগ্রসর হলাম। তারপর মনে হলো দরবেশ মালপত্র রাখার সময় একটি রত্ন না কি যেন আলাদা করে সরিয়ে রেখেছিলেন। সেটি পাবার জন্যে আমি তাঁর কাছে চতুর্থবারে গেলে তিনি তা বের করে আমাকে দিয়ে বললেন এটা নিয়ে যাও; তবে একটা কথা আছে। এটি ডান চোখে ঠেকালে তুমি যে রত্ন সামগ্রী দেখবে তা তোমার হবে। আর বাম চোখে ঠেকালে তুমি অন্ধ হয়ে যাবে।

আমি ডান চোখে ঠেকিয়ে প্রচুর রত্ন পেলাম। তাতে আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। মনে হলো দরবেশ ঠিক কথা বলেননি। আরও ধন প্রাপ্তির আশায় দরবেশের নিষেধ সত্ত্বেও রত্নটি বাম চোখে ঠেকাতেই আমি অন্ধ হয়ে যাই। এ অবস্থায় আমি ভিক্ষার সঙ্গে শাস্তি স্বরূপ দুই গালে দুটো চড় খাই।

শোলোকি কিস্‌সা

১

প্যাট প্যাট করিস না প্যাটে বড় জ্বালা
কুল খাতি খাইছি দোস্ত
তোরেও খাব।
অর্থ : প্যাট—পেট, খাতি—খেতে, খাইছি—খেয়েছি।

কিসসা হলো : এক বেজি ও খ্যাঁকশিয়াল দুজনে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। একদিন তারা যুক্তি করলো কুল বরই খাবে। বেজি গাছে উঠে পেট ভরে কুল বরই খেলেও খ্যাঁকশিয়ালকে দিল দু'একটি। এতে শিয়ালের হয়ে গেল রাগ। পেট ভরে খাওয়ার জন্য বেজিও গাছ থেকে নামতে পারছে না।

তখন বেজি শেয়ালকে বললো বন্ধু কিভাবে নামবো, তখন শেয়াল বললো, 'আমি গাল হা করছি আমার মুখের মধ্যে পড়ো'। তখন বেজি তার মুখের মধ্যে পড়লে শেয়াল তাকে খেয়ে ফেলে। শেয়ালের পেট তখন বড় দেখায়। পথে যাচ্ছে, এসময় এক বুড়ি ক্ষেতে শাকসবজি তুলছিল সে শেয়ালকে বলে শেয়াল ভাই পেট বড় হয়েছে কেন? তখন শেয়াল বলে "প্যাট প্যাট করিস না প্যাটে বড় জ্বালা, কুল খাতি খাইছি দোস্ত, তোরেও খাব"। এই বলে বুড়িকে খেয়ে ফেললো। খেয়ে আবার পথ দিয়ে যাচ্ছে এবার দেখা পুকুরে থালা-বাটি ধুতে আসা এক কিশোরীর সাথে। কিশোরী বললো, শেয়াল ভাই তোমার পেট মোটা কেন? তখন শেয়াল একই কথা বললো, "প্যাট প্যাট করিস না প্যাটে বড় জ্বালা, কুল খাতি খাইছি দোস্ত, তোরেও খাব"। এই বলে কিশোরী মেয়েকেও খেলো। আবার যাচ্ছে পথে, এবার দেখা শিং ওয়ালা এক দাড়ি ছাগলের সাথে। শেয়ালকে দেখেও ছাগলও একই কথা বললো। তখন খ্যাঁকশিয়ালও একই কথা বলে ছাগলকে খেতে গেল। ছাগল বুদ্ধি করে বললো, শেয়ালভাই তুমি যদি আমাকে খেতে চাও তা হলে একটু অপেক্ষা করো আমি বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে আসি। তখন শেয়াল বললো, ঠিক আছে যাও বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে আস। এই বলে ছাগল এক কামারের দোকান থেকে শিং দুটি বেশ ধারালো করে এনে শেয়ালের কাছে এস বললো, ভাই আমাকে খাওয়ার পূর্বে তোমার পেটের তল দিয়ে একবার যাওয়ার সুযোগ দাও।

www.pathagar.com

তখন শেয়াল বলে আচ্ছা যাও। এবার ছাগল শেয়ালের পেটের তলে গিয়ে শিং দিয়ে গুতো দিলে শেয়াল মরে গেল। সেইসাথে সবাই পেট থেকে বের হয়ে আসল এবং বেঁচে গেল।[৪]

২

এক ফকিরে খাব আলাহ কত ধন দিলে
দোহায় বঞ্চিত করে আলাহ তা কাইড়ে নিলে।
অর্থ : কাইড়ে —— কেড়ে।

কিসসা হলো : এক ফকির এক বাড়ি থেকে কিছু দুধ ভিক্ষা করে অন্য এক বাড়িতে জ্বাল দিচ্ছিল। তখন দুধ উতলে বেশি দেখালে ফকির বলছে, "এক ফকিরে খাব আলাহ কত ধন দিলে", এরপর দুধ কমে গেলে ফকির বলছে, দোহায় বঞ্চিত করে আলা তা কাইড়ে নিলে"।[৫]

৩

মুখের জন্যি ম্যান্দলি গলে
ফতে ফতে ফ্যান পড়ে।
অর্থ : ম্যান্দালি গলে অর্থ--গালমন্দ করে, ফ্যান অর্থ--ভাতের মাড়, ফতে---পথে।

কিস্‌সা

ফকির এক বাড়ি থেকে চাল ভিক্ষা করে অন্য এক বাড়িতে গিয়ে বলে আমাকে একটু ভাত রেঁধে দাও। তখন ঐ বাড়ির বউ দয়া পরবশ হয়ে বাড়িতে খড়ি-কাষ্ঠ না থাকা সত্ত্বেও ঘরের চাল থেকে লাফ দিয়ে দিয়ে ছন খুলে ফকিরকে রান্না করে দিচ্ছিল।

এসময় বেকুফ ফকির বলে উঠল, "লাফে লাফে বউ ছন পাড়ে, তয়সেন বউ ভাত রান্দে" একথা শুনে বাড়ির বউ বিরক্ত এবং রাগ করে আধা সিদ্ধ ভাত ও গরম পানিসহ ফকিরের ঝুলিতে ঢেলে দিয়ে দেয়। তখন পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ঝুলি দিয়ে ভাতের মাড় পড়ছিল। এসময় এক পথিক ফকিরকে জিজ্ঞাসা করে বলে তোমার এই অবস্থা কেন? তখন ফকির আক্ষেপ করে বলে, "মুখের জন্যি ম্যান্দলি গলে, ফতে ফতে ফ্যান পড়ে"।[৬]

৪

বাবা বশশি বাও টশ্বি বাও
কোইর ক্যানো চার পাউ।
অর্থ : বশশি-টশ্বি-মাছ ধরার বড়শি, বাও-ধরা, কোই -কৈ মাছ, পাউ -পা।

এক সন্তান তার অন্ধ মায়ের জন্য মাছ ধরার বড়শি দিয়ে বিল থেকে বড় কৈ মাছ ধরে এনে স্ত্রীকে দিয়েছে মাকে ভাজি করে রান্না করে দিতে। স্ত্রী কৈ মাছ ভেজে নিজে খেয়ে শাশুড়ির জন্য ব্যাঙ ভাজি করে দেয়। ভাবে অন্ধ বিধায় বুঝতে পারবে না। কিন্তু শাশুড়ি তা বুঝতে পারে। পরে ছেলে বাড়িতে এলে এ বাক্য দেয়।

এলাকার মানুষ মনে করে ঘর হতে অন্যত্র যাবার উদ্দেশ্যে বের হলে যদি পিছন থেকে মা ডাক দেয় তা হলে যাত্রা শুভ সাধারণত মানুষ মনে করে। অন্যদিকে শূন্য

www.pathagar.com

পাত্র দেখে যাত্রা অশুভ মানুষের এ বিশ্বাস খুবই দৃঢ়। ভরা পাত্র দেখার চেয়ে যদি যাত্রাকালে দেখা যায়- কেউ শূন্যপাত্র ভরতে যাচ্ছে তা হলে সেটা সুন্দর যাত্রা ধরে নেয়া হয়। এলাকায় এ বিষয়ে শ্লোক হলো—

ভরার চেয়ে খালি ভালো–যদি ভরতি যায়,
আগের চেয়ে পাছে ভালো–যদি ডাকে মায়।

ঘর হতে কোথায়ও যাবার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে যদি মাথায় কিছুটা আঘাত আকস্মিক ভাবে লেগে যায়- তা হলে ঐ যাত্রার উদ্দেশ্য শতভাগ পূর্ণ হয় লোকের মনে এ বিশ্বাস কাজ করে। সে জন্য শ্লোক আছে যথা—

যাত্রাকালে মস্তকে বাঁধা–কাজ হবে তোর নেইকো দ্বিধা।[৭]

কিস্‌সা

স্বামী স্ত্রী বাজি ধরেছে। স্বামী–পুরুষলোক ছলনায় ভোলে না। স্ত্রী—সুন্দরী মেয়েলোকের ছলনায় দেশের রাজা, উজির-নাজিরও বোকা হয়। স্বামী বললেন, বিষয়টি প্রমাণ কর। প্রমাণের জন্য স্ত্রী স্বামীকে বলে আমাকে এখান থেকে দূরে পাশের রাজ্যে নিয়ে রাজবাড়ির পাশের যে কোনো বড় বাজারে একটা নৃত্যশালা খুলে দাও এবং প্রচার করে দাও যে ভারতের শ্রেষ্ঠ নটী (১০০১) হাজার এক টাকার বিনিময়ে নাচ দেখাচ্ছে। যথারীতি হিসাব মতে ব্যবস্থা করা হলো। সপ্তাহব্যাপী ঘোষণা চলছে। দেশের মধ্যে রাজপরিবারের লোক ভিন্ন এত টাকা দিয়ে "নটীর" নাচ দেখা সম্ভব নয়। ঘোষণা শুনে রাজার মনে নাচ দেখার সাধ হলো, উজিরের মনে নাচ দেখার সাধ হলো, কোতোয়ালের মনে নাচ দেখার সাধ হলো এবং রাজার সঙ্গে সবসময় চলাফেরা করে বাঞ্ছারাম তাঁতি "নটীর" নাচ দেখার বায়না নিয়ে রাজার কাছে আর্জি পেশ করলো, রাজা বললো যাও বাঞ্ছারাম তুমি সব ঠিক কর। বাঞ্ছারাম নটীর কাছে গেল। রাজার সময় দিল রাত ৮টা। এরপর উজির গেলো—উজিরের সময় দিলো ৮ :৩০টা। এরপর কোতোয়াল গেলো—কোতোয়ালের সময় দিলো—৯ :০০টা, সবশেষে বাঞ্ছারামকে বললো তুমি রাত ৯ :৩০টায় আমার নাচ দেখতে আসবে। যথাসময় রাজা গেল, বিশ্রাম নিয়ে নাচ শুরু করতে প্রায় ৮ : ৩০টা বেজে গেলো। ধৈর্য না রাখতে পেরে উজির কিছুক্ষণ আগে পৌঁছে দরজায় টোকা মারে। রাজা ব্যস্ত হয়ে বলে কে? নটী বলে উজির। রাজা লজ্জায় বলে এখন কোথায় লুকাবো বা যাবো—সম্মান বাঁচাও। "নটী" আগে থেকে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। দ্রুত রাজার শরীরের সর্বত্র তরল আঠা লাগিয়ে ঘোড়ার পশম লাগিয়ে ঘোড়ার মত চতুষ্পদ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বললো। যে কথা সেই কাজ। দরজা খুললো উজির এলো। বিশ্রাম নিয়ে নাচ শুরুর আগেই কোতোয়াল। দরজায় টোকা দিলো। উজির ব্যস্ত হয়ে বলে কে? নটী বললো কোতোয়াল উজির ব্যস্ত হয়ে বলে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর সম্মান বাঁচাও। আঠালো গুড় গায়ে মেখে ভেড়ার লোম দিয়ে উজিরকে ভেড়া বানিয়ে পাশে বেঁধে রাখে। কোতোয়াল যথারীতি ঘরে ঢুকে দেখে একদিকে ঘোড়া অন্য দিকে ভেড়া। কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলে নটী বলে আমার সখের পোষা ঘোড়া ও ভেড়া। যা হোক বিশ্রাম নিয়ে নাচ শুরুর আগেই বাঞ্ছারাম দরজায় টোকা দেয়। কোতোয়াল বলে কে? নটী জবাব দিয়ে বলে বাঞ্ছারাম। লজ্জায় কোতোয়াল জিহবায় দাঁত কাটে। তাড়াতাড়ি নটীকে বলে ইজ্জত

www.pathagar.com

গেলো। ইজ্জত বাঁচাও। নটী তাড়াতাড়ি বললো তুমি উপুড় হয়ে থাক এবং পাছা উপরের দিক দাও নড়াচড়া করো না। যথারীতি কোতোয়াল উপুড় হয়ে পাছা উপর দিকে দেয়। নটী কাপড় দিয়ে ঢেকে একটা মোম জ্বালিয়ে কোতায়ালের পাছায় উপর বাটির মধ্যে স্থাপন করে। ঘরে ঢোকে বাঞ্ছারাম। নটী দেখে বাঞ্ছারাম সদ্য মোচ ফেলে দাঁড়ি কেটে সুন্দর পোশাকে সেজে গুজে এসেছে। নটী চিৎকার করে স্বামীকে পাশের ঘর থেকে ডেকে বলে। এদিকে এস দেখে যাও– সুন্দরী রমণীর ছলনা। স্বামী পাশের কক্ষ থেকে নটীর ঘরে আসে এবার নটী শ্লোকে বলে—

রাজা ঘোড়া, উজির ভেড়া—কোতোয়ালের গুদি (পাছায়) বাতি (প্রদীপ) আশা করে মোচ ফেলাইছে–বাঞ্ছারাম তাঁতি।[৮]

খ. কিংবদন্তি

কিংবদন্তি শব্দের অর্থ জনশ্রুতি। লোক পরম্পরায় শোনা কথা। কিংবদন্তি ইতিহাস নয়। কিন্তু শুনতে শুনতে ইতিহাসের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এমনটি মনে হলেও জনশ্রুতির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। তবে জনশ্রুতি যে একেবারে ভিত্তিহীন তাও নয়। অনেক সময় এই জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান যে পাওয়া যায় না, তাও নয়। এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত কিংবদন্তি উপস্থাপন করা হলো।

কিংবদন্তি-১

সদর উপজেলার বাঁশগ্রাম ইউনিয়নের অধীন কামালপ্রতাপ গ্রাম। অভিজাত পরিবারের জনৈক রমণী একদিন গ্রামীণ ঝোপজঙ্গলের পাশে পায়ে চলা মেঠোপথ ধরে নিজের অর্থাৎ স্বামী গৃহে ফিরছিলেন। হঠাৎ পথের মাঝে শিশুর কান্না শুনে তিনি থমকে দাঁড়ান এবং চারিদিক তাকিয়ে বাগানের একপাশে রাস্তার উপর একটা শিশুকে দেখতে পান। শিশুর কান্নায় মহিলার খুব মায়া হয়- তিনি শিশুটিকে কোলে তুলে বাড়ি নিয়ে যায়। কথিত আছে ঘটনাটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। শিশুটি আজগুবি কাজকর্ম করতে থাকে যা সাধারণের কাছে অলৌকিক ব্যাপার। যাহোক শিশুটি যতই বড় হতে থাকুক না কেন সে শরীরে কোনো পোশাক রাখে না। পোশাক পরালে সে কাঁপতে থাকে, জ্বর হয়। খাবার ইচ্ছাও কম। প্রায়ই ফাঁকা স্থানে কোনো গাছতলায় বসে চোখ বুঝে বিড় বিড় করে। গ্রামের পুরুষ নারী কারো দিকে তাকায় না। এই আছে আবার হঠাৎ দেখা গেল সে নেই। মানুষ ধীরে ধীরে তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে থাকে এবং সবাই তাকে বলে নেংটা শাহ। শিশু বৃদ্ধ যুবক-যুবতির সাধারণ সমস্যাগুলি নেংটা শাহকে জানালেই সমাধান হয়ে যায়। যে মহিলা নেংটাশাহকে মানুষ করেছেন তার একমাত্র ছেলে জজ। একদিন ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে নদী পার হওয়ার সময় হঠাৎ ঝড়ো বাতাসে নৌকা দুলতে দুলতে পানি উঠে প্রায় নৌকা ডুবুডুবু। এমন সময় নেংটা শাহ দৌড়ে এসে ঘর হতে একটা ধামা নিয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে নৌকার পানি ফেলতে থাকার ভঙ্গি করে করে অনেকক্ষণ পর বললো যা এবার বেঁচে গেলি। নেংটা শাহর ভঙ্গি দেখে মা বললো কি হয়েছে ব্যাটা। ভয় নেই মা জজের নৌকা ডুবে যাচ্ছিল–বেঁচে গেছে। জজ বাড়ি এলে নেংটা শাহর কথার সত্যতা প্রমাণিত হলো।[৯]

www.pathagar.com

কিংবদন্তি-২

নড়াইল শহরের দক্ষিণ দিকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে রূপগঞ্জ বাজার। রূপগঞ্জ বাজার জমিদার রূপনারায়ণ দত্তের নামানুযায়ী জমিদারদের সৃষ্ট। জমিদারদের জমিদারি শুরু হবার আগে রূপগঞ্জ এলাকায় গভীর জঙ্গল ছিল। কথিত আছে কুড়িগ্রাম কিংবা উত্তর এলাকা হতে হেঁটে হেঁটে উজিরপুর কিংবা বিজয়পুর যাবার একমাত্র রাস্তা ছিল এটা। সন্ধ্যায় কিংবা সন্ধ্যার পর এ এলাকায় কোনো জনপ্রাণির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেত না। এ জঙ্গলে ভয়ংকর এক দস্যু 'নাম তার নিশিনাথ' বাস করতো। একবার এক বৃদ্ধা রমণী তার একমাত্র কন্যাকে অর্থাভাবে চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যুশয্যায় থাকাকালে বৃদ্ধা তাকে দেখার আশায় এবং চিকিৎসা করানোর আশায় শেষ সম্বল ২টা খাসি ছাগল বিক্রি করে এপথ ধরে হেঁটে মেয়ের বাড়ি উজিরপুরে রওয়ানা হয়। পথের মাঝে অনেকে তাকে নিশিনাথের কাহিনি জানিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে না যাবার জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু একমাত্র কন্যার অসুস্থতা মায়ের মনে সকল ভয়ভীতিকে ভুলিয়ে দেয়। মা ছুটে যায় মেয়ের বাড়ির দিকে। রূপগঞ্জ জঙ্গলের মাঝে পৌঁছালে ৪-৫জন ডাকাত বৃদ্ধার পথরোধ করে। বুড়ি জোরে জোরে বলতে থাকে জয় বাবা নিশিনাথের জয়- দোহাই বাবা নিশিনাথের দোহাই। ডাকাতদল নিশিনাথের লোক গুরুর কথা শুনে তারা বুড়িকে সর্দারের কাছে নিয়ে বিস্তারিত জানায়। অদ্ভুত ব্যাপার হলো সর্দারের যেন হঠাৎ কি পরিবর্তন হয়। সে নিজে বুড়িকে সাথে নিয়ে তার মেয়ের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। পরদিন হতে এলাকায় খবর হয় নিশিনাথের দোহাই দিলে কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারে না। সত্যিই পরদিন হতে ক্রমাগত মানুষ সময় অসময় ঐ পথে চলতে চলতে নিশিনাথের দোহাই দেয় এবং কেউ বিপদে পড়ে না। প্রায় দুই বছর পর দেখে জটাধারী এক লোক বটবৃক্ষের তলায় ধ্যানরত। দলে দলে ভক্ত আসতে থাকে মানত করে পুজো দেয়। অনেকে সুস্থ হয়। কালক্রমে ঐ সাধু মারা যায় এবং তার নামানুযায়ী বর্তমান নিশিনাথ তলার নামকরণ, যেখানে ১ মাসব্যাপী মেলা হয়। মানুষ বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন নিশিনাথতলার মন্দিরে পূজা দেয়- মানত দেয় প্রসাদ দেয় আর আরাধ্য দেবতার কাছে আর্তি জানিয়ে হয়তো সুন্দর ফল পায়- কাহিনির বিবরণী এভাবেই লোক হতে লোকে ফিরছে।[১০]

কিংবদন্তি-৩

নড়াইল নামকরণের সঙ্গে কিংবদন্তি জড়িয়ে আছে। প্রাথমিকভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। পুনরায় বিষয়টি আলাদাভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য করার প্রয়াস নেয়া হলো। আলীবর্দি খাঁর শাসন আমলে দেশের বিভিন্ন অংশে বর্গি বাহিনী ও পাঠান বাহিনী নানা উৎপীড়ন শুরু করে। আলীবর্দির মুঘল বাহিনী তাদের শায়েস্তায় ব্যর্থ হয়। অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। সুবা বাংলার পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকায় পালাতে থাকে, এ সময় একজন কর্মচারী 'মদন গোপাল দত্ত' জীবন বাঁচাবার তাগিদে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকায় সপরিবারে পালাতে চায় এবং একসময় তাদের বহনকারী নৌকা কিসমত কুড়িগ্রামের খাল বরাবর দক্ষিণের দিক চলতে থাকে। একসময় কিসমত কুড়িগ্রামে এক জায়গায় খালের ভিতর কচুরিপানার ধাপ দেখে বাধ্য হয়ে থামতে হয়। অতঃপর সামনে

www.pathagar.com

ধাপের পর দেখতে পায় একজন ফকির ধ্যানের আসনে চক্ষুবন্ধ করে বসা আছে। কিন্তু ঐ ফকিরের সামনে একখানা 'নড়ি' (লাঠি) খাড়া করে পুঁতে রাখা। ফকিরকে দেখে বিশেষ করে জনমানুষহীন জঙ্গলাকীর্ণ খালের মধ্যে কচুরিপানার ধাপের উপর ধ্যানস্থ ফকির নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ ভেবে মদন গোপাল দত্ত ফকিরের সামনে মাথানত করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। মদন গোপাল দত্তের শ্রদ্ধায় খুশি হয়ে ফকির "আল্লাহু আকবর" বলে চিৎকার করে উঠেন এবং বলেন তোমার জন্যই এতদিন অপেক্ষায় ছিলাম। অতঃপর ফকির মদন গোপাল দত্তকে নড়িটি দান করেন এবং নিমেষে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যান। পরম ভক্তিভরে মদন গোপাল দত্ত নড়িটি নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং ফকিরের শেষ কথা বার বার তার কানে বাজতে থাকে - তোমার জন্যই এতদিন অপেক্ষায় ছিলাম। মদন গোপাল দত্ত যাত্রা বিরতি ঘটান এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। ক্রমাগত তার পসার বাড়তে থাকে। মদন গোপাল দত্তের পরবর্তী একজন বংশধর রূপরাম নড়াইলের শক্তিশালী জমিদার, কালিশংকর রায় নাটোর রাজপ্রাসাদের উকিল ছিলেন। নাটোরের রানি ভবানীর অনুগ্রহে তিনি নড়াইলের আলাদাতপুর তালুক ক্রয় করেন এবং পরবর্তীতে নাটোরের অর্থনৈতিক মন্দার সময় তিনি আরও তালুক ক্রয় করেন এবং পূর্ব-পুরুষের নিকট থেকে প্রাপ্ত নড়ি ও নড়িওয়ালা ফকিরের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করতে কিসমত অঞ্চলের নামকরণ করেন নড়াল নামে। ক্রমাগত কিসমত নাম লুপ্ত হয় এবং নড়াল নাম বহুল প্রচলিত হয়। ঐ সময় জমাজমির দলিলে নড়াল নাম দেখা যায়। জমিদারির নামকরণ করা হয় নড়াল জমিদার। পরবর্তীতে নড়াল এর সঙ্গে ইল যোগ করে নড়াইল হয়েছে।[১১]

ইতনা গ্রামের পুকুর

আজ থেকে ৬০-৭০ বছর আগে এসব অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানি ছিল না বললেই চলে। সমস্ত গ্রামে মাত্র দু'একটি টিউবওয়েল ও কূপ ছিল। এলাকার মানুষ সে সময় পুকুর-দিঘি ও কূপের পানি গোসল, থালা-বাসন, কাপড় পরিষ্কার এবং খাবারের কাজে ব্যবহার করতেন। লোহাগড়া পৌর এলাকার রামপুরায় পির ফজু দেওয়ানের দিঘিতে সারা বছর পানি থাকত এবং এখানকার পানি পরিষ্কার বিধায় এ অঞ্চলের মানুষ দিঘির পানি পান করতো। ইতনা ইউনিয়নের ইতনা গ্রামে ৮০ বছরের পুরানো একটি পানির কূপের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এই কূপটি বাংলা ১৩৩৮ সনে ইতনার মনোরমা রায়ের পরিবার একই গ্রামের সুবোধ চন্দ্র গুহ দস্তিদারের স্মরণে নির্মাণ করেছিলেন । জানা যায়–রায় পরিবার এ এলাকার আদি বাসিন্দা। তাদের প্রচুর জমিজমা এবং জমিদারি ছিল। বর্তমানে তারা এ এলাকায় নেই। কূপটি এখন সেই আগের মতোই রয়েছে। বর্তমানে এখানে বসবাস করেন মো. বদিরুজ্জামানের (৭০) পরিবার। তারা কূপের পানি দিয়ে গোসল, থালা-বাসন ধোয়া, কাপড়কাচাসহ নিত্য দিনের সব কাজই করেন। কয়েক বছর আগেও তারা এই পানি পান করতেন। ২৪ ফুট গভীর এই কূপটিতে কখনই পানি শুকায় না এবং প্রতিবছর একে সংস্কার করা হয়। তৈরি নিত্যদিনের কাজের জন্য গ্রামের ধনী-গরিব সবাইকে পুকুর-দিঘিতে আসতে হতো। ফলে গ্রামের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হতো। গ্রামে এখন অবশ্য প্রায় প্রত্যেক ঘরে ঘরেই টিউবওয়েলের ব্যবস্থা রয়েছে।[১২]

www.pathagar.com

লোহাগড়ার দিঘি

কয়েক'শ বছর আগে লোহাগড়া থানার চাচই-ধানাইড় গ্রামে শাহ্ আমিরুদ্দিন বুড়ো দেওয়ান নামে এক সাধক পির বাস করতেন। তিনি ছিলেন ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী। মুখে ও চিন্তায় তিনি যা বলতেন ও ভাবতেন বাস্তবে তাই ঘটতো। দেওয়ানজি একটি খেজুর গাছের নিচেই পৃথক ঘরে বসে ধ্যান করতেন। বাড়ির পাশেই ছিল একটি পুকুর। এই পুকুরেই তিনি স্নান করতেন। জনশ্রুতি রয়েছে এই পুকুরের পানিতে অনেক অলৌকিক কাজ হতো। দেওয়ান বাড়িতে মেহমান আসলে অনেক থালাবাটির প্রয়োজন পড়লে এই পুকুরকে বললে পুকুরের পাড়ে অন্ধকার রাত্রে অনেক থালাবাটি উঠতো। কাজ শেষে আবার এই থালাবাটিগুলো পুকুরের পাড়ে রেখে দিলে সেগুলো পুকুরের মধ্যে চলে যেতো। উল্লেখ্য যে, দেওয়ানজি অন্ধকার রাত্রে খড়ম পায়ে এই পুকুরের মধ্যে পানির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতেন। তাছাড়া একদিন অপরাহ্নে দেওয়ানজি পার্শ্ববর্তী মধুমতি নদী পার হয়ে পূর্বদিকে যেতে মনস্থ করেন। মধুমতি নদীর এক খেয়াঘাটে উপস্থিত হয়ে জনৈক মাঝিকে বিনামূল্যে পার করে দেওয়ার কথা বললে মাঝি তাকে কটূক্তি করেন। তখন দুঃখিত হয়ে দেওয়ানজি খড়ম পায়ে মধুমতি নদী পার হয়ে গেলেন। মাঝি এই ঘটনা দেখে সাথে সাথে দেওয়ানজির নিকট ক্ষমা চাইলে তিনি মাঝিকে ক্ষমা করে দেন এবং ফিরে যেতে বলেন। লক্ষ্মীপাশার নিরিবিলি পিকনিক স্পটের পার্শ্বে রামপুরা গ্রামে নড়াইল-কালনা সড়কের পার্শ্বে পির শাহ ফজু দেওয়ানের দিঘি সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তি রয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে দিঘিটি এক রাতে তৈরি হয়েছিল। এ দিঘির পানি কখনও শুকিয়ে যায় না বলে অনেকেই মনে করেন আধ্যাত্মিকতার কারণে এ দিঘির পানি শুকায় না। রামপুরা এলাকায় দু'মাইল দীর্ঘ ও ২২ হাত প্রশস্ত ফকিরের/পিরের জাঙ্গাল বলে কথিত হালট দিয়ে রাত্রিকালে পির ফজু দেওয়ান শাহ বাঘের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতেন এবং তার এই অনুগত প্রাণিগুলি এই দিঘির পাড়ে বিশেষভাবে নির্মিত সুরঙ্গগুলিতে আশ্রয় নিত। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেও বাঘের আস্তানার এই সুরঙ্গগুলির চিহ্ন ছিল বলে জানা যায়। দিঘিটি আজও রয়েছে। এর পশ্চিম পার্শ্বে সেকালের ইটের নির্মিত মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। কথিত রয়েছে, এই মসজিদটিও অলৌকিকভাবে এক রাতে নির্মিত হয়েছিল।[১৩]

মধুমতি নদীর কিংবদন্তি

জনশ্রুতি রয়েছে লোহাগড়ার পূর্ব সীমান্ত দিয়ে বয়ে চলা প্রমত্তা মধুমতি নদীর এক সময় নাম ছিল গড়াই নদী। এক সময় ফরিদপুরে বাস করতেন এক জমিদার। তার মিতা নামে এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। মিতার সাথে একই এলাকার এক নাপিতের ছেলে মধুর প্রেমজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জমিদার সম্পর্কের বিষয়টি জেনে গেলে নাপিতের ছেলেকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করে। মিতার কাছে এ খবরটি পৌঁছালে সে গলায় কলসি বেঁধে গড়াই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। মধু ঘটনাটি জানতে পেরে যে জায়গায় মিতা আত্মহত্যা করেছিল ঠিক সেই জায়গায় ঝাঁপ দিয়ে সেও আত্মহত্যা করে। এরপর দুজনের লাশ একই জায়গায় ভেসে ওঠে। মধু ও মিতা আত্মহননের বিষয়টি সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে এবং গড়াই নদীর পরিবর্তে সবাই

www.pathagar.com

মধুমিতা নদী বলতে শুরু করে। আস্তে আস্তে অপভ্রংশের মাধ্যমে এ নদীর স্থাননাম হয় মধুমতি।[১৪]

টোনার গোব

কালিয়া উপজেলার বর্তমানে নড়াগাতি থানার টোনা গ্রামে টোনার গোব অবস্থিত। এ গোবের মাঝখান দিয়ে সোনার নৌকা ও পবনের বৈঠা বেয়ে একজন নেয়ে আজও যাতায়াত করে। অমাবস্যা-পূর্ণিমার সময় তার নৌকা বাওয়ার শব্দ শোনা যায়।

মালোর ভিটা

কলাবাড়িয়া ও তেবাড়িয়া মৌজার সীমানা বরাবর অবস্থিত এ ভিটাটি মালোর ভিটা হিসেবে পরিচিত। কালিয়া এক সময় জলাভূমি ছিল। তখন এখানে জেলে মালোদের বসবাস ছিল। এর ফলে এখানে বসবাসের জন্য অনেক ভিটা তৈরি হয়েছিল। অনেক কাল আগে থেকে সেসব ভিটা উজাড় হয়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিম পাশের একটি ভিটা আজও বর্তমান। জনশ্রুতি আছে সেখানে মালোরা বসবাস করতো। পরিত্যক্ত এই ভিটায় সাপ থাকতো বলে এ জায়গায় মনসা পূজার স্থান গড়ে ওঠে।

এক সময় জনৈক ফকির সাপ ধরার উদ্দেশ্যে ঐ ভিটায় আসেন। তিনি মন্ত্র পড়ে মাটিতে থাবা দিতেই বিভিন্ন জাতের সাপ বের হতে থাকে। ফকির সাহেবের চ্যালারা সে সাপ ধরে হাঁড়ি ভরতে থাকে। অনেক দেরিতে একটি অজগর সাপ ফণা তুলে এমনভাবে বেরিয়ে আসে যে, ফকির ও তার চ্যালারা ভয় পেয়ে যায়। শেষে ফকির সাহেব ক্ষমা চেয়ে এবং মা-মনসার নামে পাঠা মানত করে মুক্তি পায়।

কৈলাসের দিঘি

কালিয়া উপজেলার চাঁচুড়ি পুরুলিয়া স্কুলের পশ্চিম পাশে কৈলাসের দিঘি অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে প্রাচীন কালে দুর্গাপূজার সময় এ দিঘির পাশে ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রার্থনা করলে দিঘি থেকে থালা, গ্লাস, ঘটি-বাটি উঠে আসতো। সেগুলো ব্যবহার করার পর ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিঘির পাড়ে রাখলে দিঘিতে চলে যেতো। এভাবেই চলছিল। এক সময় একজন লোক লোভবশত একটি থালা রেখে দেয়। তারপর থেকে আর এই দ্রব্য সামগ্রী দিঘি থেকে উঠে না।

গ. লোকপুরাণ

নড়াইল জেলায় ইংরেজ শাসনামলে জমিদাররা ভারতের বীরভূম জেলা হতে নীলচাষের শ্রমিক হিসেবে কিছু লোক বাংলায় নিয়ে আসেন, এদেরকে বুনো নামে ডাকা হতো। এরপর বাংলায় আগমনের পর বিভিন্ন জনকে যোগ্যতা মতে কাজে নিয়োগ করা হয় এবং কাজ অনুযায়ী তাদের পদবি নির্ধারিত হয়। এ সময় তাদের সরদার, মালি, বাগদি, কামার, ঘাষি ও বুনো নামে আখ্যায়িত করা হয়। অবশ্য বর্তমানে সকলকে আদিবাসী হিসাবে অভিহিত করা হয়। এরাই প্রকৃতপক্ষে লোক পুরাণের কাহিনি চর্চা

www.pathagar.com

করে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঝন্টু সরদার ও নিরাঞ্জন মালি জানায় প্রথম থেকে তারা বনদেবীর পূজা করতো এবং বিশেষ করে জাঁকজমক ভাবে মনসাদেবীর পূজা সকলেই করতো এবং বর্তমানেও করে থাকে। এছাড়া কাটাযুক্ত একপ্রকার গাছ যাকে সিঁধকাটা গাছ বলা হয়। ঐ গাছ মাটিতে পুঁতে গাছের গোড়ায় পরপর তিনটি মাটির ঢিবি করে তারা পূজা দেয়। সৃষ্টি ও প্রকৃতি সম্পর্কিত লোকপুরাণ তারা পরম্পরাগতভাবে জেনে আসছে। অম্বর সর্দারের কাছ থেকে শোনা মনসার কাহিনি বর্ণনা করা হলো।

মনসার কাহিনি

কৈলাসে আদ্যাশক্তি মা দুর্গা লক্ষ করেন বাবা মহাদেব বা শিবঠাকুর প্রতিদিন তপস্যার নামে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করেন। তাঁকে প্রশ্ন করলে জানান যে, তিনি নিয়মিত তপস্যায় যান। মা দুর্গা বলেন যদি সত্যিই তোমার কোনো তপস্যা করতে হয় তা হলে সাগরপারে যেতে হবে। ঠিক পরদিন শিবঠাকুর সাগরপারে যাবার জন্য রওয়ানা দেন তবে ইতোমধ্যে মা দুর্গা সাগরে লোক পারাপারে পাটনিকে (পারের মাঝি) সরিয়ে পাটনির কন্যার রূপধরে পারাপারের নৌকায় বসে অপেক্ষা করতে থাকেন। যথাসময়ে শিবঠাকুর ঘাটে নৌকা ডেকে বলেন, আমাকে পার করে দাও। পাটনির কন্যা রূপিণী মা দুর্গা বলেন আমার বাবা অন্যত্র গেছেন, তিনি না এলে আমি পার করতে পারবো না। তখন শিবঠাকুর বললেন নৌকা তীরে আন আমি নিজেই নৌকা বেয়ে ওপারে যাবো। যথারীতি মা দুর্গা নৌকা তীরে আনলে শিবঠাকুর নৌকা নিয়ে সাগরের মাঝবরাবর গেলে হঠাৎ সামনে তাকিয়ে পাটনি কন্যার অপ্সরার ন্যায় রূপে মুগ্ধ হয়ে ডেকে বলেন, তুমি কে? জবাবে পাটনির কন্যা রূপিণী মা দুর্গা বলেন, আমি পাটনির মেয়ে। শিবঠাকুর বলেন, তোমাকে দেখে আমি কামাতুর হয়েছি এসো কাছে এসো এবং আমার কাম চরিতার্থ করার সুযোগ দাও। জবাবে পাটনি রূপিণী কন্যা মা দুর্গা কঠোর ভাষায় বললেন, খবরদার জায়গায় থাক। আমার কাছে আসার চেষ্টা করো না। কিন্তু শিবঠাকুর তাঁর কথা না শুনে ঐ কন্যাকে আলিঙ্গনের জন্য সামনে এগিয়ে যায় ও কন্যা পিছিয়ে যায়। জোর করে ধরতে গেলে ধস্তাধস্তি হয়। ঠিক এমন সময়ে মা দুর্গা দশচক্ররূপ ধারণ করলে শিবঠাকুর থমকে দাঁড়িয়ে বলেন, এখানেও তুমি? কিন্তু ততক্ষণে শিবঠাকুরের রেত বা বীর্য নৌকার পাটাতনের উপর পতিত হয়েছে। লজ্জিত বদনে শিবঠাকুর বললেন, ওটা কি করবো? মা দুর্গা বললেন, ওটুকু নিয়ে সাগরের ওপারে পদ্মপাতার উপরে স্থাপন কর। যথারীতি নিজ হাতে নিজের বীর্য নিয়ে শিবঠাকুর সাগর পাড়ে গিয়ে ঐ বীর্যটুকু পদ্মপাতার উপর রেখে দেন। কিছুদিন পর ঐ পথে যাতায়াতের সময় অভিশপ্ত ও ৭-৮দিন অনাহারী বিষহরি নামক একটা পাখি পদ্মপাতার উপর বিদ্যুৎ চমকের মত মহাদেব ঠাকুরের বীর্য দেখে উদরপূরণে ঐ বীর্য খেয়ে ফেলে। কিন্তু ক্ষুধা নিবারণ না হয়ে বরং বিষহরি পাখির পেটে ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হয়। অনন্যপায় পাখি বাধ্য হয়ে পুনরায় ঐ বীর্য পদ্মফুলের পরাগের উপর উগরে দেয়। ঐ বীর্য ফুলের পরাগ বেয়ে বৃন্তের মধ্য দিয়ে সোজা পাতালে পতিত হয়। পাতালে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু ও সংহারকর্তা মহাদেবের সামনে ঐ রেত দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বলেন, মহাদেবের অমর বীর্য নষ্ট করা যাবে না। ফলে ব্রহ্মা ঐ বীর্য দিয়ে একটা মেয়ে

www.pathagar.com

তৈরি করেন। বিষ্ণু ঐ মেয়েটিকে লালনপালনের জন্য কাস্যমুনির স্ত্রী নাগমাতা কুদ্রদেবীর কাছে অর্পণ করে বলেন, তোমারতো সর্প ভিন্ন সন্তান নেই সুতরাং নিজের কন্যা হিসেবে এ মেয়েটিকে পালন কর। কুদ্রদেবী সন্তান স্নেহে কন্যার নাম রাখেন মনসা এবং কন্যাকে বড় করে তোলেন। বড় হয়ে ঐ কন্যা মাতা কুদ্রদেবীর সমস্ত সাধনজ্ঞান লাভে সমর্থ হলে কুদ্রদেবী তাকে নাগদেবী উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐ কন্যা এরপর একদিন জিজ্ঞাসা করে বলেন, মা আমার বাবা কে? মা কুদ্রদেবী বলেন, কমলবনে গিয়ে বসে অপেক্ষা কর দেখবে একজন ঐ পথে আসা যাওয়া করছে। সেই-ই তোমার বাবা। বাবাকে দেখার বাসনায় সুন্দর সাজগোজ করে মনসা অপেক্ষা করতে থাকে। অকস্মাৎ শিবঠাকুর ঐ পথ দিয়ে যাবার পথে রূপবতী মহিলার দিকে কুনজরে চায়। সঙ্গে সঙ্গে মনসার দংশনে শিবঠাকুর মরার মত ধরাশায়ী হয় এবং মনসা তাকে সুস্থ করে জানায় আমি তোমার কন্যা মনসা। আমাকে তোমার কাছে কৈলাসে নিয়ে চলো। মনসার জন্মবৃত্তান্ত মা দুর্গার কাছে গোপন রাখার অভিপ্রায়ে শিবঠাকুর একটা ঝুপড়ির মাঝে মনসাকে ছোট পুতুলের ন্যায় শিশু বানিয়ে কৈলাসে নিয়ে দুর্গাকে বলেন, আমি বনবাদাড়ে ভূতপ্রেত নিয়ে থাকি সুতরাং এ ঝুপড়ি ঝুলিয়ে রাখলাম এটা তুমি দেখবে না। কিছুদিন পর ঐ ঝুপড়ির কন্যা মনসা দুর্গার চোখে পড়ে এবং দুর্গা ও মনসার মাঝে তর্কাতর্কি হয় এবং পরিণতিতে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে পরাজয় ও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মনসা তার বাবা শিবঠাকুরের আশ্রয় নেয়। শিবঠাকুর নিজের হাতে কন্যাকে কালিদুয়ার মাঝে বিসর্জন দেয় এবং বিসর্জনের আগে জানায় মর্তে আমার ভক্ত চন্দ্রধর বা চাঁদ সওদাগরের কাছে তোমাকে প্রেরণ করছি। সে তোমাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করলে বিশ্বে আমার সকল ভক্ত তোমাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করবে, তুমি বিশ্বে অমর হয়ে রবে।

ঘ. লোককবিতা

গ্রাম্য সাধারণ মানুষ যাদের অক্ষর জ্ঞান নেই, কিংবা স্বশিক্ষিত তারা সমাজের পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতায় গীতিময় কথা পরিবেশন করেন যা লোককবিতা হিসেবেই বিবেচিত। লোককবিতাগুলো আবৃত্তি নয় সাধারণত গীত হয়ে থাকে। সমাজ ও ধর্ম থেকে শুরু বিভিন্ন বিষয়ের উপর রয়েছে লোককবিতা।

সংগৃহীত লোককবিতা

১

একপেয়ে তালগাছে গোল গোল পাতা
দূর থেকে মনে হয় যেনো এক ছাতা।
বাবুই পাখির দল পাতায় পাতায়
বাসা বেঁধে আনন্দে দোল তারা খায়।
ফাল্গুনে তালগাছে মোচা বের হয়
বাঁশ বেয়ে বুড়ো গাছি গাছে ওঠে যায়।

www.pathagar.com

মোচা থেকে তালরস বের করে আনে
কাঁচা রস খেতে মজা গোধূলি লগনে।
রসে হয় পিঠা পায়েস আর পাটালি
দুধ লাউ খেতে মজা লাউ হলে জালি।
কচি তালে শাঁস পাই পাকা তাল খাই
আজানের আগে তাল কুড়াইতে যাই।
ভাদরের শনিবারে পাতা পোড়া পিঠে
লাল লাল তালবড়া খেতে লাগে মিঠে।
তাল খেয়ে আঁটিগুলো রাখি যতনে
আশ্বিনের শেষ দিনে মা তুলে আনে।
আঁটির সাথেতে মূল মোটা মোটা পাই
আগুনে ঝলসিয়ে মজা করে খাই ।
আঁটিগুলো কেটে কেটে বের করি শাঁস
খেতে খেতে পেট ভরে মেটেনা যে আশ।
শুকনো তালের পাতায় হয় ভালো জ্বালানি
কাঁচা পাতা দিয়ে ঘরে হয় ছাউনি।
তাল গাছের ছোট পাতায় হয় তালের পাখা
গরমেতে শান্তিদানে প্রিয়তম সখা।
রেলিং করে তাল কাঠে দিলে তালের খুঁটি
শাল কাঠও ফেল করে হতে তার জুটি।
ভাদ্র মাসে তালের ডোঙ্গায় পার হওয়ার কথা
লেখাপড়া শিখেছি লিখে তালপাতা।[১৫]

২

গুরু বলে জানাই শ্রদ্ধা আমরা মনেপ্রাণে
সেই গুরুকে করি প্রণাম তাঁরই শ্রীচরণে।
কসুম ফুটে ঝরলো আজি মায়াভরা কাননে॥
পূর্বাকাশে ওঠে ভানু অস্ত গেলো পশ্চিমে
সে বেদনায় কাঁদি বসে আজও মরমে মরমে
তাঁর বিজয় সরকার নামটি ধামে-খুঁজি তাঁরে স্বপনে॥
জীবন ভরে খুঁজলে তাঁরে নাহি পাবো ফিরে
স্মৃতি হয়ে রইলো শুধু ভবের মায়াডোরে
সে যাতনায় আখি ঝরে- বুক ভাসে গোপনে॥
অনুভবে তাঁহার ছবি আঁকি মনে কত
মনের কোণে আজও গুরু হাসছে অবিরত
চরণে শির করি নত–সৈয়দ কাঁদে আশার ধ্যানে॥[১৬]

৩

তোমার কথা পড়লে মনে ব্যথা জাগে অন্তরে

www.pathagar.com

কোথা গেলে পাবো এমন পরান বন্ধুরে॥
তেরো শত সাতানব্বই তেশোরা ভাদ্র রবিবার
চারণ কবি মোসলেম উদ্দিন পার হলেন ওপার
ফেলে তাঁহার সকল কারবার– আশার পথে মিশেরে॥
তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষ আর আধ্যাত্মিক চেতনায়
তাঁর জুড়ি যে ভবে বিরল ক্ষণপারের ঠিকানায়
তবু তারে তারে খবর হয়–তাঁরে খুঁজলে পাবি এপারে॥
মাটির দেশে এসে বন্ধু মিলে গেছো মাটিতে
ভক্তগণে দেখে তোমায় বসে ভাবের জগতে
একাকার সে ভক্তের সাথে- জীবন মরণ বিহারে॥
মরেও তুমি রইলে অমর রেখে কত স্মৃতি
স্মরণ করি হৃদয় মাঝে দিয়ে অর্ঘ প্রীতি
অধম সৈয়দ তোমার পূজায় নিতি–গান গাহি স্মৃতির সুরে॥[১৭]

৪

খোকন চন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম : দুবলাজুড়ি, নড়াইল।
রাজবংশী সিতারামপুরি,পনের জন্য রায়পুরি,
গাজি আছে চাঁন্দপুরি জোড়ায় মনঃপ্রাণ,
তালেশ্বরের গয়নাতে ভাই ভোলে নারীর মন ॥
রূপগঞ্জ আর সিঙ্গিয়া বাজার–পূর্ণ শুধু সুক্ষ কামার,
আউড়ে আছে মুচি, চামার–রতডাঙ্গার পান,
হিজল ডাঙ্গার বাঁশির চোটে–দিনের বেলায় তারা ফোঁটে,
মাথা ফেঁটে রক্ত ছোটে– থাকেনা রে মান ॥
গুড় পাটালি রসগোল্লা- দই সন্দেশ আর কাঁচাগোল্লা,
শাম বৈরাগী ,কনক ভোলা – চা করে পান ॥[১৮]

ঙ. ভাট কবিতা

লোকসাহিত্যের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে ভাট কবিতা। ভাট কবিতাকে নড়াইলের স্থানীয় ভাষায় সায়র কবিতা বলে। এক সময় সায়র বা ভাট কবিতার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। তখন এক শ্রেণির চারণ কবিয়ালগণ ভাট কবিতা লিখে ছোটো ছোটো বই আকারে প্রিন্ট করে ঐগুলি হাটবাজারে সুরে সুরে পড়ে খুব অল্প মূল্যেই বিক্রি করতেন। শত মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কবিতাপাঠ শুনে কবিতার বই কিনে নিতেন। বর্তমানে এ প্রচলন প্রায় লুপ্ত হওয়ার পথে। তারপরও কিছু মানুষ এখনও তাৎক্ষণিক কোনো বিষয় নিয়ে ভাট কবিতা রচনা করে থাকেন। সাধারণত বিরহ, চমক সৃষ্টিকারী প্রেমের কাহিনি, ঝড়, তুফান, মহামারি ইত্যাদি উপজীব্য বিষয় নিয়েই ভাট করিতা রচিত হয়। নড়াইল অঞ্চলে ভাট কবিতার প্রচলন খুবই সামান্য আছে। ২/১টি নমুনা নিম্নে প্রদান করা হলো।

www.pathagar.com

সংগৃহীত ভাট বা সায়র কবিতা

আশুলিয়ার মরণ আগুন

রচনা : মো. ইকবাল হোসেন,
গ্রাম+ডাকঘর : বাঁশগ্রাম, নড়াইল সদর, নড়াইল

ওহে দয়াময়–শান্তি চাই–এ জীবনে আমি, তুমি হলে দয়ার সাগর
পারেরই কাণ্ডারি–তুমি করো দোয়া (২)
রইলাম চাইয়া তোমার পানে আমি, গোনাহগার ভাবিয়া তুমি
ডুবাইওনা তরী- তুমি রেখ ভাসায় (২)
এই কামনাই– তোমার কাছে করি, মাতাপিতা,
শিক্ষাগুরুর চরণ চুম্বন করি–তাদের করি সালাম (২)
আরও সালাম– শ্রোতাদের চরণে, যেন এমন মরণ নাহি আসে কাহারও
জীবনে- করি এই কামনা (২)
শোন রে মনা–মরণের কাহিনি, লিখতে যাইয়া ঝরলো কত
আমার চোখের পানি–তবু লিখতে হয় (২)
ভিজে যায়– খাতা কলম সব, ভুলত্রুটি হইলে ভাইরে
করে দিও মাফ–শুনলাম ঢাকা জেলার (২)
আশুলিয়ার – নিশ্চিন্তপুরে, তোবা গ্রুপে তাজরিন নামে
কারখানা করেছে–ঐ কারখানাতে (২)
নিয়োগ দিছে হাজার পুরুষ নারী, আসছে তারা মা বাপ ছেড়ে
করিতে চাকুরি–ঐ কারখানাতে (২)
অনেক বছর করিতেছে কাজ, হঠাৎ করে উঠলো বেজে
মরণের আওয়াজ–কেহ ঠিক নাহি পায় (২)
কারখানায়– জীবন যাবে চলে, তা হলে কেউ অমন চাকরি
করতো না ঐ মিলে, ভাগ্যে লিখা আছে (২)
এমন বেশে– ওদের মরণ হবে,তাই মরিয়া গেছে তারা
আগুনেতে পুড়ে, করার কিছু নাই (২)
হায়রে ভাই– কারখানার ভিতরে, হঠাৎ দেখি উড়ছে ধোয়া
সব ফ্লোরের ভিতরে, দেখে চমকে গেলো (২)
বসকে বললো– কিসের এত ধোয়া-বস বলিলো ও কিছু নয়
কাজ করোগে যাইয়া- দেখছি কিসের ধোয়া (২)
উঠছে বাইয়া–কারখানার ভিতরে–কোথায় আবার কি ঘটেছে
দেখে আসি ঘুরে, বলে নিচে এলো (২)
দেখতে পেলো– তিন তলার ভিতরে, দাউদাউ জ্বলছে আগুন
সমস্ত ফ্লোরে-কয় সবাকে বলে দাও (২)
জানায় দাও-যে যেভাবে পারে–আগুন লাগছে
মিলের ভিতর কেউ থাকবেনা ফ্লোরে–শুনে এই কথা (২)

www.pathagar.com

শ্রমিক যথা– দৌড়াদৌড়ি করে– কি প্রকারে জানটা লইয়া যাইবো
বাহিরে–এখন কোন্ উপায় (২)
কবিতায়- লিখবো কেমন করে–কার কাছে শুনিবো বলো কি ঘটছে
ভিতরে-কেউ কি বেঁচে নাই (২)
মরছে সবাই – শ্রমিক ছিল যত–পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হইছে
আমি সোনা পোড়ার মত–লিখার ভাষা নাই (২)
কি উপায়– লিখবো এ কাহিনি–ভিতরের ঘটনা হয়তো কেউ
চোখে দেখেনি–শুনবো কাহার কাছে (২)
কি ঘটেছে–কারখানার ভিতরে–হয়তো তারা এদিক ওদিক
ছুটাছুটি করে–হায়রে কি যাতনায় (২)
চলে যায়–ছেড়ে জগতপুরি–হয়তো তারা সব মরেছে
আগুনেতে পুড়ি-মরলো ভুরি ভুরি (২)
জগতপুরি– ছেড়ে তারা গেলো–বলবো এবার রক্ষীর কথা
তারা কি করিলো–রক্ষী যারা ছিল (২)
কি করিলো–শোন তাদের কথা–সব গেটে লাগাইয়া তালা
চলে গেলো কোথা–তাদের খবর নাই (২)
এই কি ভাই– মানুষেরই ধর্ম–মানুষ হইয়ে বোঝেনিকো
মানুষেরই মর্ম–তা হলে গেটে থাকতো (২)
বাহির করতো–অন্তত একজন–এ মানুষটা বেঁচে থাকলে
ভুলতোনা কখন– হায়রে নিষ্ঠুর রক্ষী (২)
এ কি করলি–মারলি কত জনা-রোজ হাসরে আল্লাহ তোদের
মাফই তো করবেনা-তোরা মহাপাপী (২)
জাহান্নামি– থাকবি জীবন ভর–আরব দেশে যেমন ছিল কঠিন এক
সিমার–হইবি তাহার দোসর (২)
তোদের কবর– তাহার পাশে হবে–হাসরের দিন নবি
তোদের শাফায়াত না করিবে-সেদিন বুঝবি ঠেলা (২)
কেমন জ্বালা–গেটে তালা লাগাবার–ঐদিন তোদের কেউ রবেনা
রক্ষা করিবার–ছাড়ি রক্ষীর কথা (২)
বলবো হেথা– শ্রমিকরা কি করলো–সব গেটে তালা লাগানো
দেখিতে পাইলো–যখন দেখতে পেলো (২)
একি হলো – সরার উপায় নাই–অগ্নিদহনে পুড়িয়া মরবো
কারখানাই–বুঝতে বাকি নাই (২)
ভাইরে ভাই– সবাই করি দৌড়াদৌড়ি-এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে
তড়িঘড়ি-কেবল বাঁচার আশায় (২)
কোথা যায়-কোন্ গেট দিয়া যাবো–সব গেটে তালা লাগানো
কোথায় ফাঁকা পাবো–কোথায়ও ফাঁকা নাই (২)
তা বুঝি নাই– কি অবস্থা হলো–কারখানাতে অগ্নিদহন
সবার হয়ে গেলো- যেমন ভাজা বাগুন (২)

www.pathagar.com

ঢাকলে যেমন–সহজে যায় গলে-ঐ রকম অবস্থা হলো
কারখানার সকলে–সবাই গলে গেছে (২)
পুড়ে গেছে– কেহ বেঁচে নাই–দুই একজন বেঁচেছে হয়তো
খোদার ইশারায়–হায়রে নিঠুর মরণ (২)
করলো বরণ–কাঁদিতে কাঁদিতে–বিশ্বের কোথায়ও মরছে
এমন পারিনি শুনিতে-যেমন মরলো ঢাকা (২)
হলো ফাঁকা– পুরো কারখানা–এমন মরণ দেখলে ভাইরে
ধৈর্যতো থাকেনা–তারা যেমন করে (২)
গেলো ছেড়ে-এই দুনিয়া হতে–কত জ্বালা পেয়ে তারা
দুনিয়া ছেড়েছে– তার প্রমাণ দিচ্ছে (২)
দেখা যাচ্ছে–কারখানার ভিতরে–জুতা, স্যান্ডেল মানুষগুলি
ছড়াইয়ে রয়েছে–সবাই গলে গেছে (২)
কি হয়েছে-আল্লাহ বলতে পারে–পলিথিন সব দেয়ালে
লেগে ইট গিয়াছে সরে–কাঁচের গ্লাসগুলো (২)
তাও গেলো–আগুনেতে গলে-রডগুলোতে আগুন লেগে
কালো হয়ে গেছে– দেখা যাচ্ছে চোখে (২)
একে একে- সব রুমেতে যাইয়া–মানব দেহের কত অংশ
রয়েছে ছড়াইয়া-যেমন কাকড়া পোড়া (২)
আগাগোড়া–সবই পুড়ে যায়–চাড়াগুলো উঠায় ফেললে ঘিলু
পাওয়া যায়– এদের তাও নাই (২)
হইছে ছাই– মাথার ঘিলু পুড়ে–এমন দৃশ্য কবির
মনকে খাচ্ছে কুরেকুরে-চোখে না দেখিলে (২)
লিখে বুঝালে–বুঝানো না যায়–টিভির পর্দায় যা দেখিলাম
লিখলাম কল্পনায়–যদি ভুল হয়ে যায় (২)
ক্ষমা আমায়-করিবেন সবাই–২২শ লোক কাজ করিতো
তাজরিন কারখানায়–তাদের কজন বাঁচলো (২)
কজন মরলো- কজন রয় বাড়িতে-সেসব কথা এখনও
কেউ পারেনি বলিতে–হিসেব যা পাওয়া গেছে (২)
খবরে বলেছে–১১১জন শ্রমিককে জীবিত পাওয়া গেছে– বাকি যত শ্রমিক
তারা সকলে মরেছে–নিশ্চিত হওয়া গেছে (২)
বেঁচে আছে – কত জনার মতো-যোগ বিয়োগ করিলে সংখ্যা
সবই বুঝা যেত–তাতে কি লাভ হতো (২)
বলবো কত–লাশ চিনার উপায় নাই–কিছু পুড়ে
কয়লা হইছে কিছু হইছে ছাই–কারো বা চিহ্ন নাই (২)
যা চেনা যায় তাই–বাহির করিলো–তাদের নিয়ে কিবা হলো
এখন তাই বলিবো–ওদের ৫২ জনকে (২)
দিলো রেখে–জুরাইনের মাটিতে–আর কয়জনকে নিয়ে গেলো

www.pathagar.com

অভিভাবক পার্টিতে–কার লোক কে যে নিলো (২)
এলোমেলো-গেছে কত হয়ে–বাকি লোক সব
কোথায় আছে কিবা গেছে হয়ে– তাহা কেউ জানেনা (২)
মন বোঝেনা –সন্তান হারা যার–মা দুঃখিনীর চেখের জলে
উঠিলো জোয়ার–ভাসলো সারা বাঙলা (২)
সারাবেলা-শোকের ও সাগরে–মানুষ পোড়া গন্ধ যখন
আসিলো বাহিরে–মরলো হাজার হাজার (২)
কেউ বা আবার– লাফায় পড়ে মরে–অন্ধকারে তাদের লাশটি
কুকুর নিয়ে সরে-কেমনে হিসেব করে (২)
দিবে ভাইরে–কজন গেছে মরে–ভাগ্যে যাহা ছিলো
তাহা ঘটেছে এবারে–এমনি ধীরে ধীরে (২)
নিশ্চিন্তপুরে–পুরো নিশ্চিত হলো–সন্তানহারা সজন হারা
বুঝতে না চাহিলো–তাদের ছেলে নাই (২)
মেয়ে নাই– কারখানার ভিতরে–সবাই কয় গো সজনের লাশ
আনো বাহির করে-কেমনে এনে দেবে (২)
কেমনে সইবে- তাদের আপনজন-যে কয়জন পোড়া
রয়েছে কয়লারই মতন–তাদের এনে দিলে (২)
না চিনিলে–সন্তান হারা মা–ব্যথায় যাবে বুকটা ফেঁটে
করবে রে খাঁ খাঁ–হয়তো তাই ভাবিয়া (২)
ভিতরে গিয়া–কিছু লাশ করিলো বাহির- বললো যার সজন
সে যাওনা নিয়ে করেছি হাজির–যারা চিনতে পেলো (২)
নিয়ে গেলো–তাদের আপনজন–না পাওয়ারা
কি করিলো তাই করেন শ্রবণ (২)
তারা কাঁদতে আছে কইতে আছে– আমরা কিবা করি– সন্তান হারা ব্যথা নিয়ে
কেমনে যাবো বাড়ি–থাকবো কেমন করে (২)
সন্তান ছেড়ে–এইনা ভবের পরে–তাদের কি পারবো না
আমরা শোয়াতে কবরে–তাদের এনে দাও (২)
যেথায় পাও–আমার সন্তান নিয়ে যাবো- বাড়ি নিয়ে তাদের আমরা
গোসল করাবো–তাকে এনে দাও (২)
কথা লও– কাঁদে সজন হারা–সন্তান শোকে সকলে প্রায়
হলো পাগোল পারা–তারা ব্যথা নিয়া (২)
যায় চলিয়া –কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি-খোদা যেন ওদের বিচার
করে তাড়াতাড়ি–করে এই কামনা (২)
গেলো শোনা – তিনজনা– হয়েছে গ্রেফতার–তাদের নাকি অনেক টাকার
ছিল খুব দরকার– তাইতে আগুন দিছে (২)
চুক্তি করছে–ওরা কাদের সাথে-স্পষ্ট যাচ্ছেনা বুঝা
স্বীকার না করিলে–যখন করবে স্বীকার (২)

www.pathagar.com

কি প্রকার –ধরালো আগুন–নির্ণয় করা যাবে সঠিক
সকলের দোষ গুণ–কেন বা আগুন দিছে (২)
কত টাকা পাইছে–ক্যান করে নাই দেরি–আগুন লাগায় কেমনে তারা
কারখানা ত্যাগ করি–ওরা বাইরে এলো (২)
দেখতে পেলো –জ্বলতেছে আগুন–পারবে না ঠেকাতে কেহ
শ্রমিকদের মরণ-দেখছে দূরে দাঁড়ায় (২)
এদিক আল্লাহ কয়–টাকা দিবো তোরে–পরের দিন
প্রশাসনের লোক তিনজনে রে ধরে–করলো রিমান্ড মঞ্জুর (২)
আদালত হুজুর–১০ দিনের রিমান্ড–কি চুক্তিতে আগুন দিলি
কি ছিল ডিমান্ড–সব খুলে বলো (২)
যাতাকল–রেখেছি ফিট করে–লাশের সাথে তোদেরকেও
পাঠাবো কবরে–না করিলে স্বীকার (২)
কি প্রকার দিয়েছে আগুন–মানুষ নয়তো পশু ওরা
ওদের করো খুন–ঝুলাইয়া ফাঁসিতে (২)
এই দাবিতে– বাঙলার জনগণ–জীবনে দেখে নাই কেহ
নিঠুর মরণ-ক্রোধে সবাই গরম (২)
কেউ নয় নরম-দোষীদের ছাড় দিতে-হাজার মানুষ পুড়ে মরলো
ওদের আগুনেতে–ওদের ফাঁসি চাই (২)
ক্ষমা নাই–এ বাঙলার মাটিতে–সন্তানহারা মায়ের রাত যায়
কাঁদিতে কাঁদিতে–তাইতো ক্ষমা নাই (২)
ক্যামনে জানা নাই–চলিবে সংসার-বেঁচে যদি থাকতো রে ভাই
মানিকধন আমার–দিতো সবই যোগান (২)
যে সোনার চান-সে গেছে চলে-এমনি করে নিশ্চিন্তপুর
ভাসলো চেখের জলে-দেখলো বিশ্বের মানুষ (২)
হলো হুস-বাংলাদেশ সরকারে–সাহায্যের হাত বাড়ায় দিলো
সব দুঃখিনী মায়ে রে–কিছু ঘুচলো দুখ (২)
আইলো সুখ-ঐ দুঃখিনীদের মনে-আরও শান্তি পেলো তারা
আশার বাণী শুনে–সরকার দিলো আশা (২)
রাখো ভরসা-করবো অপরাধীর বিচার–এক লাখ করে
টাকা পাবে নিহতের পরিবার–আবার আহতরা (২)
পাবে তারা– পঞ্চাশ হাজার করে–এটুক আগে গ্রহণ করো
দেখবো আরও পরে-পেয়ে আশার বাণী (২)
মা দুঃখিনী –মুছলো চোখের পানি–সরকার মোদের যা দিয়েছে
তাও অনেকখানি–আমরা ভুলবো না (২)
গেলো শোনা–করছে শোক দিবস ঘোষণা-যারা গেছে তাদের আমরা
ফিরে আর পাবো না–ভাবী সামনের ভাবনা (২)
সর্বজনা-ইকবালের বিনয়-সব কারখানায় গড়তে হবে

www.pathagar.com

নিরাপত্তা বলয়–করে এই কামনা (২)
বন্ধুগণা-লেখা করি শেষ–ইচ্ছা আছে দেখবো ঘুরে
সোনার বাংলাদেশ-সালাম সবার পায়া।[১৯]

চ. লোকছড়া

পল্লির আনাচে-কানাচে লোকসাহিত্যের নানান উপকরণের মধ্যে লোকছড়া অন্যতম। লোকসমাজে ছড়ার সৃষ্টি যে কখন হয়েছিল তার ইতিহাস নির্ণয় করা সহজ নয়। ছড়ার সঙ্গে শিশুমনের, মাতৃত্ববোধের একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও সমাজের সর্বস্তরে স্বাভাবিক প্রকাশ লক্ষণীয়। নড়াইলের আঞ্চলিক ছড়া একবারে কম নয়। গ্রামাঞ্চলের মানুষের এসব লোকছড়া এখনও মুখে মুখে ফেরে। এখানে কয়েকটি লোকছড়া উল্লেখ করা হলো।

খেলার ছড়া

১

পল্টু গদাই চল/খেইলে আসি বল
ফ্যান ফরিছিস সাদা/বিষ্টি হয়ে মাঠের মদ্দি হইয়ে গেছে ক্যাদা
বল খ্যালার সাতে সাতে ক্যাদা মাটি অবে
সাদা ফ্যানের কি দশা অয় দেখতি পারবি তবে।[২০]

অর্থ : খেইলে-খেলে, ফ্যান-প্যান্ট, বিষ্টি-বৃষ্টি, হইয়ে-হয়ে, সাতে-সাথে, অয়-হয়, ক্যাদা-কাদা, মদ্দি-মধ্যে ইত্যাদি।

২

কালো মেয়ের ভালো চুল
দেখতে বেজায় টাইম ফুল
ওকা জোকা ফুল ফুটেছে
ফুলের আগায় কড়ি।
বাঁশের পাতা নড়ে চড়ে
সীমার কথা মনে পড়ে
সীমা যদি জানত
একখান চিঠি পাঠাতো।
ডাল হলো ঘোনো
আমার নাম মোনো
বাংলাদেশ খেলা শেষ।

অর্থ : ওকা জোকা-এখানে সেখানে, ঘোনো-ঘন ইত্যাদি।

খেলার নিয়ম

এই খেলায় সাধারণত ৩ জন প্রয়োজন। দুই জন চারটি পা ফাঁক করে দুই পায়ের পাতার সাথে স্পর্শ করে বসবে। এরপর একজন দাঁড়িয়ে পা ফাঁক করা পায়ের মধ্য

www.pathagar.com

দিয়ে দুই পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেচে নেচে এই ছড়া বলবে। যদি বসা জনের পায়ে স্পর্শ লাগে তা হলে সে হেরে যাবে।[২১]

৩

ইন পিন সেপটিপিন
খোকা খায় ভিটামিন
ভিটামিনে পোকা
ডাক্তার সাহেব বোকা।

অর্থ : ইন পিন সেপটিপিন-এর কোনো অর্থ নেই। শুধু ছড়াটিকে মেলানোর জন্য শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

খেলার নিয়ম

এই খেলার নিয়ম হলো একের অধিক ছেলেমেয়ে বসে মাটিতে হাত রেখে আঙ্গুল গুণে গুণে ছড়াটি বলে। ছড়াটি যে আঙ্গুলে শেষ হয় সে আঙ্গুলটি ভাঁজ করে রাখতে হয়। এভাবে যার পাঁচটি আঙ্গুল আগে শেষ হয় সে জয়লাভ করে।

৪

পিংক পাং বান্ধবীগণ
তোমরা সবাই বলতে পারো
একটি করে ফুলের নাম।
যেমন- শাপলা।

অর্থ : পিংক পাং বান্ধবীগণ-এর কোনো অর্থ নেই। শুধু ছড়াটিকে মেলানোর জন্য শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

খেলার নিয়ম

একের অধিক ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে এক জনের হাতের উপর অন্য জনের হাত রেখে এবং তালি দিয়ে এই ছড়াটি বলতে হয়। এইভাবে ছড়া বলতে বলতে যার হাতে শাপলা ফুলের নামটি পড়বে সে জয়লাভ করে।[২২]

৫

ইকড়ি বিকড়ি চামচিকি
ইকড়ি গেল হাটে
তার দুই মেয়ে পথে বসে কাঁন্দে।

অর্থ : এই ছড়ার কোনো অর্থ নেই। শুধু ছড়াটিকে মেলানোর জন্য শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

খেলার নিয়ম

এই খেলার নিয়ম হলো একের অধিক ছেলেমেয়ে বসে মাটিতে হাত রেখে প্রত্যেক আঙ্গুল গুণে গুণে ছড়াটি বলে। ছড়াটি যে আঙ্গুলে শেষ হয় সে আঙ্গুলটি ভাঁজ করে রাখতে হয়। এভাবে বলতে বলতে যার পাঁচটি আঙ্গুল আগে শেষ হবে সে জয়লাভ করবে।

www.pathagar.com

৬

ইচিং বিচিং ছিচিং ছা/প্রজাপতি উড়ে যা
অ্যাং ব্যাং চ্যাং/খেই কুকুরের ঠ্যাং
ইস বিশ ধানের শিষ/সুই সুতো লোহার গুতো।

অর্থ : এই ছড়ার কোনো অর্থ নেই। শুধু ছড়াটিকে মেলানোর জন্য শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।[২৩]

খেলার নিয়ম

এই খেলায় সাধারণত ২জন প্রয়োজন। একজন দুটি পা ফাঁক করে বসবে। এরপর একজন দাঁড়িয়ে যে পা ফাঁক করে বসেছে তার পায়ের মধ্য দিয়ে দুই পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেচে নেচে এই ছড়া বলবে। যদি বসা জনের পায়ে স্পর্শ লাগে তা হলে সে হেরে যাবে। আর যদি না লাগে তা হলে সে জিতবে।

৭

হাঁস হাঁস কোথায় যাও/রাঙ্গামাটির চরে যাই
আমায় একটা দিয়ে যাও/পেছন থেকে নিয়ে যাও।

খেলার নিয়ম

এ খেলায় সাধারণত ৭ থেকে ৮ জন প্রয়োজন। সবাই মিলে হাঁটু ভেঙে বসে হাঁসের মতো করে সারিবদ্ধ হয়ে হাঁটবে। এ সময় ১ জন লাঠি হাতে ওদের সাথে সাথে হাঁটবে এবং বলবে, 'হাঁস হাঁস কোথায় যাও', যারা বসে হাঁটছে তারা সবাই বলবে, 'রাঙ্গামাটির চরে যাই', যার হাতে লাঠি রয়েছে সে বলবে, 'আমায় একটা দিয়ে যাও', যারা বসে হাঁটছে তারা বলবে, 'পেছন থেকে নিয়ে যাও'। তখন পিছন থেকে একজনকে তুলে নিবে। তারপর আবার ছড়াটি বলবে। এইভাবে খেলাটি শেষ হবে।

৮

এভেন্টি বাক্স/রাইটানা টেক্সো
চুল টানা বিবিয়ানা/সাহেব বিবির বৈঠকখানা
পানের আগায় মরিচ বাটা/স্কুল ঘরের চাবি আটা
পান সুপারি খেতে/মা বলেছে যেতে
আমার নাম রেণু বালা/ গলায় দিলাম মুক্তার মালা।

খেলার নিয়ম

এই খেলায় সাধারণত ৬ থেকে ৭ জন প্রয়োজন। প্রথমে দুইজন হাত উঁচু করে এক সাথে ৪টি হাত মিশিয়ে গেটের মতো দুইজন দুই পাশে থাকবে। এরপর অন্যরা লাইন দিয়ে ঐ গেটের মধ্য দিয়ে যাবে এবং ঘুরবে। তখন গেটে অবস্থান করা দুইজন এই ছড়া বলবে। এইভাবে ছড়া বলতে বলতে শেষ লাইন 'গলায় দিলাম মুক্তার মালা' বলার সময় যে গেটের মধ্যখানে থাকবে তাকে আটকিয়ে দেওয়া হবে এবং সে হেরে যাবে। এইভাবে খেলা চলতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে যখন একজন থাকবে তখন সে জিতবে।[২৪]

www.pathagar.com

৯

টুনটুনি ভাই পাখি/নাচোতে দেখি
ওরে বাবা নাচব না/পড়ে গেলে বাচব না
বড় আপুর বিয়ে/কচক সাবান দিয়ে
কচক সাবান ভালো না/বড় আপুর বিয়ে হলো না।

১০

ইকির বিকির চিকির ছিছি/দুয়োরে বসে চালকুটি
চাল কুটতি হলো বেলা/ভাত খাবি সেই দুপুর বেলা
ভাতে পড়লো মাছি/কোদাল দিয়ে চাছি
কোদাল হলো ভোতা/খ্যাকশিয়ালের মাথা।[২৫]

১১

নুনতারে এক রে/নুনতারে দুই রে
নুনতারে তিন রে/নুনতারে চার রে
নুনতারে পাঁচ রে/নুনতারে ছয় রে
নুনতারে সাত রে/আমার ঘরে কে রে আমি রে
কি খাস লবণ খাই/লবণের দাম দিবি কবে
তোর বিয়ের রাঙ্গা শুককুর বারে/তোরা কয় ভাই কয় বোন
সাত ভাই সাত বোন/আমারে একটা দিবি
ধরতি পারলি নিবি।

খেলার নিয়ম

এ খেলায় সাধারণত আটজন হলে ভালো হয়। তবে তার কম হলেও হবে। এখানে আটজনকে নিয়ে খেলার বিবরণ দেওয়া হলো। ছেলেমেয়েরা প্রথমে মাঠের মধ্যে বা ফাঁকা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ঘরের মতো গোল হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের মধ্যে থাকবে একজন। যাকে বুড়ি বলে। বুড়ি সবার উদ্দেশ্যে বলবে নুনতারে, সবাই বলবে এক রে। এইভাবে সাত পর্যন্ত বলতে হবে। এরপর বুড়ি বলবে, আমার ঘরে কে রে? সবাই বলবে আমি রে। বুড়ি বলবে, কি খাস? সবাই বলবে লবণ খাই। বুড়ি বলবে, লবণের দাম দিবি কবে? সবাই বলবে, তোর বিয়ের রাঙ্গা শুককুর বারে। বুড়ি বলবে, তোরা কয় ভাই বোন? সবাই বলবে, সাত ভাই সাত বোন। বুড়ি বলবে, আমারে একটা দিবি? সবাই বলবে, ধরতি পারলি নিবি। এই বলে সবাই দৌড় দবে। তখন বুড়ি তার নির্দিষ্ট গোল ঘর থেকে এক নিশ্বাসে সবাইকে ছোঁয়ার চেষ্টা করবে। বুড়ি যদি কাউকে ছুঁতে পারে সে তখন বুড়ির দলে আসবে। এইভাবে সবাইকে ছোঁয়ার চেষ্টা করতে হবে।

১২

ডিম ডিমাডিম ভিম/কিসের বাজনা বাজে
তাই তি তারা সাজে/আগে যায় গাড়ি ঘোড়া
পিছে যায় হাতি/তার সাতে চলে ব্যাঙ
সঙ্গে লইয়া ছাতি।

www.pathagar.com

১৩

ছাগল গিরি গিরি/লক্ষ্মী গিরি গিরি
তোর ছাগলে খাইছে ধান/পিটমুড়া দিয়ে বাইন্দে ফ্যাল।

১৪

ঝিনুক-এ ঝিনুক মালা/তিন দুগুনে ছয়
কলকাতার ডাইনি বুড়ি/কলকাতায় যাইও বাবু
কলকাতায় যায়/আজকাল কার মেয়েদের লম্বা লম্বা চুল
সামনেতে ক্লিপ মারা পিছনেতে ফুল/ও বাবু পিছনেতে ফুল।
আজকাল কার ছেলেদের লম্বা লম্বা প্যান্ট/সামনেতে চেন কাটা পিছনেতে ব্যাঙ
ও বাবু ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ।[২৬]

ছেলেভুলানো ছড়া

ঘুঘঘুসি তালপুসি তালের বুড়ি/কোথা গেছে পানি আনতি
পানি কই কাকে খাইছে/কাক কই উড়ে গেছে
ছোট গাছটা নড়ে চড়ে/বড় গাছটা ঢ্যাপ ঢ্যাপ করে পড়ে
সোনার ঘাটে না রূপার ঘাটে।

নিয়ম

বিছানের ওপর একজন শুয়ে পায়ের পাতার ওপর শিশুকে বসিয়ে এই ছড়া বলতে হয়। শেষে ছোট গাছটা নড়েচড়ে, বড় গাছটা ঢ্যাপ ঢ্যাপ করে পড়ে, এই কথা বলে ছোট বাচ্চাকে যে কোনো এক পাশে আলতোভাবে শুইয়ে দিলে বাচ্চারা খুব আনন্দ পায়। আবার সোনার ঘাটে পড়বা না রূপার ঘাটে পড়বা এই কথা বললে শিশুটি বলে, সোনার ঘাটে পড়বো। তখন শিশুকে যে কোনো এক পার্শ্বে আলতোভাবে শুইয়ে দিয়ে বলতে হয়, তোমাকে সোনার ঘাটে রেখে দিলাম। এতে শিশুরা একই ধরনের আনন্দ পায়।[২৭]

মেয়েলি ছড়া

১

কুটিকালে খেলিছিলাম কুটি কুলো নিয়ে/বাই বউতি গালোয় ছেলো
থুবড়ি ছিনাল কয়ে/আজ থুবড়ির কাচোন কোচন
কাল থুবড়ির বিয়ে/থুবড়িরে নিয়ে গ্যালো/ডাহের বাড়ি দিয়ে।

অর্থ : কুটিকালে-ছাটবেলায়, বাই-ভাই, গালোয় ছেলো-গালি দিয়েছিল, থুবড়ি-বৃদ্ধ, ছিনাল-ফাজিল, কাচোন কোচন-পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বা গায়ে হলুদ, ডাহের-ঢাক, ঢোল।

২

ফান্তা বাতে কাঁচা মরিচ/গরম বাতে জোল
কুটটি মাইয়ের বিয়ে অবে/সঙ্গে অনেক ডোল।
ডোল বাজে ডিডিং ডিডিং/আরো বাজে কাশী

www.pathagar.com

হানশেলকোরে রসুন পুড়ায়/আন্না দিদির মাসি।
অর্থ : ফান্তা বাতে-পান্তা ভাত, জোল-ঝোল, কুটটি-ছোট্ট, অবে-হবে, ডোল-ঢাল, হানশেলকোরে-কড়াই।[২৮]

৩

এ্যাটটা তারা/ দুইডে তারা
ওই তারাডার বউ মরা।
বাড়ির পাশে খ্যাড়ের পালা/বউ আনতি বড় জ্বালা
বউ আসবে নাইওরে/ক্যালার ভিয়া বাইওরে।

অর্থ : এ্যাটটা-একটি, দুইডে-দুটো, নাইওরে-নৌকায়, ক্যালার-কলা গাছের, বাইওরে-বেয়ে ইত্যাদি।

৪

চাইকরে বর যার পোড়া কপাল তার
নাইয়ে বর যার অর্ধেক কপাল তার
হাইলে বর যার সুকের কপাল তার

অর্থ : চাইকরে-চাকরিজীবী, নাইয়ে-যে নৌকা চালায়, হাইলে-কৃষক।

এক সময় গ্রামের মানুষ যারা চাকরি করতো তারা স্ত্রী পরিজন বাড়িতে রেখে শহরে চাকরি স্থলে থাকতো। বাড়িতে আসত অনেক দিন পর। সেজন্য চাকরিজীবীর স্ত্রীদের পোড়া কপাল বলা হতো। যারা নৌকার মাঝি ছিল তারা ১৫ দিন ১ মাস বাইরে থেকে আবার বাড়িতে ফিরে আসতো। সেজন্য নৌকার মাঝির স্ত্রীদের অর্ধেক কপাল, আর যারা কৃষক তারা সব সময় বাড়িতেই থাকে। এজন্য কৃষকের স্ত্রীদের সুখের কপাল বলা হতো।[২৯]

৫

কাজ কাম জানে না বউ জানে নেহাপড়া,
বউরে কিছু কসনা মা ছাওয়ালের হুকুম কড়া॥

৬

মরুক মরুক ছাওয়াল (ছেলে) মরুক (মরে যাক)
আরও ছাওয়াল পাবো।
গুড়োর তামাক ফুরোয় গেলি
কার দুয়োরে যাবো।

৭

বুড়োর মরে গেছে বউ
বুড়োর কাঁন্দনে ওঠে
মধুমতির ঢেউ।

৮

উত্তর ডাঙ্গায় গাই (গাভী) বিয়েইছে (বাচ্চা প্রসব করেছে)
বাছুর নেছে চিলি/ঢেয়ির (ধানভাঙা ঢেঁকিকল)

www.pathagar.com

মোনাই ভাঙে গেছে
ভারা বানতি গিলি॥

৯
প্রাণহীন প্রেম তব
প্রেমের কলঙ্কিনী,
আঁখি জলে ভাসি তাই
আমি অভাগিনী॥

১০
দুঃখের ঘরে জন্মে আমার পাইনি সুখের ধারা
দুঃখ আমার চিরসাথী আমি সর্বহারা॥

১১
সুয়াল বেলায় ভাত রান্দিছি
তারি গুটিক খাইয়ে,
খাটের পরে পাটায় রইছে
বড় লাটের মাইয়ে॥

১২
ঐ বাড়ি বউ-নাম তার নৈ,
এক দাবড়ে উঠোয় সাত পাহি (৯০ শতাংশে এক পাখি), ভুই(জমি)।

১৩
বুচি গেলো নাক ফুঁটোতি
পলইডাঙ্গার হাটে, সেই খবর শুনে আসলাম
আমতলার ঘাটে॥

১৪
আকাশ কাঁন্দে, বাতাস কাঁন্দে, কাঁন্দে বনের লতা
পুরুষ হয়ে বুঝবে নাকো, নারীর মনের ব্যথা।[৩০]

ঘুমপাড়ানি ছড়া

১
উছছে বলে গিলাম/এ্যাকটা ডিম পালাম
সেই ডিমটা কই
কাকে খাইছে/সেই কাকটা কই
ডালে বইছে/সেই ডালটা কই
পানিতে পড়িছে
সেই পানিটি কই, গরুতে খাইছে/সেই গরুটি কই
মাঠে বেঁধেছে/সেই মাঠটা কই
ধান বুনিছে/সেই ধানটা কই
গোলায় ভরিছে/সেই গোলাটা কই/মক্কা মদিনায়।

www.pathagar.com

২

ঘুঘু সই পুতুল কই
তাল গাছে কি ফিঙ্গের বাসা
ফিঙ্গে কনে জল আনতি গেছে
জল কনে ডাবুতে খাইছে/ডাবু কনে বাগানে গেছে
বাগান কনে পুড়ে গেছে/ছাই কনে উড়ে গেছে
ধুপ নাচন কাপড় নাচন/ধুপ নাচন কাপড় নাচন
ধুপ নাচন কাপড় নাচন।

নিয়ম

সাধারণত ছোট শিশুকে পায়ের ওপর শুইয়ে দু'পা দুলাতে হয় এবং এই ছড়াগুলি বলতে হয়। শিশুরা ছড়া শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে।[৩১]

পালা কাহিনির ছড়া (ঠাকুরের লীলা)

বর্তমানে এ উপজেলার জয়পুর ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামের রমেশ চন্দ্র সমাদ্দার (৫৫), একই গ্রামের রবিন বালা (৩৫), রিভা মলিক (৩৫), লোহাগড়া ইউনিয়নের কালনা গ্রামের জগেশ বিশ্বাস (৮০), কাশিপুর ইউনিয়নের চালিঘাট গ্রামের অশ্বিনী কুমার গাইন (৭৫), নোয়াগ্রাম ইউনিয়নের রায়গ্রামের বাসুদেব বিশ্বাস (৪০), লোহাগড়ার জগন্নাথ বিশ্বাস (৪০) বিভিন্ন গ্রামে ঠাকুরের লীলা কাহিনি পাঠ করে। লীলামৃত, তারক গোঁসাইয়ের জীবনী, গীতা, ভগবৎ, মহাভারত, রামায়ণ, চণ্ডিপুরাণ, চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি কাহিনি সুরে সুরে বর্ণনা করেন এবং ভক্তদের ব্যাখ্যা করেন। সাদা পোশাক পরে ৪ থেকে ৭ জনের একটি দল এই লীলা কাহিনি পাঠ করেন।

এখানে একজন দলনেতা থাকেন। একজন এক অধ্যায় শেষ করে অন্যজন অন্য একটি অধ্যায় পাঠ করেন। এভাবে দলের সবাই কাহিনি পাঠ করেন। এই কাহিনি পাঠে আগে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার না থাকলেও বর্তমানে থাকে। যেমন এখানে হারমোনিয়াম, খোল ও চাকি থাকে। বছরের প্রায় প্রতিমাসেই এসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। তবে শীতকালে বেশি হয়। তারা নিজ গ্রাম এবং বাইরেও এই লীলামৃত ঠাকুরের কাহিনি পাঠ করে থাকেন।

লীলামৃত ঠাকুরের বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয়কৃষ্ণ দাস
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরি দাস
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহদর
পতিত পাবন হেতু হইলা অবতার
জয় জয় গুরু চাঁদ জয় হীরামন
জয় শ্রী গোলক চন্দ্র জয় শ্রীলোচন
জয় জয় দশরত জয় মৃত্যুঞ্জয়

www.pathagar.com

জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়
নিজ দাস করি মোরে কত আত্মসাৎ।[৩২]

ছ. কবিগান

কবিগান বাংলার নিজস্ব সম্পদ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সুবিখ্যাত ইংরেজ কবিয়াল এন্টনি ফিরিঙ্গির শিষ্য নড়াইলের মাইজপাড়া গ্রামের কবিয়াল পাচু দত্ত সরকার সর্বপ্রথম তৎকালীন নড়াইলে কবিগান আনয়ন করেন বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশে কবি গানের আধুনিকতার পাদপীঠ নড়াইল জেলা বললে অত্যুক্তি হয় না।

তাৎক্ষণিকভাবে ছন্দে অন্তমিল লক্ষ করে প্রাসঙ্গিক ও বিষয়ভিত্তিক ছড়া-পাঁচালিই কবিগান। কবিগানে পাঁচালির ব্যবহার সুরসিক সংগীত শ্রোতাকে মুগ্ধ করে আনন্দ দেয়। তাছাড়া কবিগানের অন্যতম অংশ হলো সখী সংবাদ, ডাক-মালসি, ভবানী-সংবাদ এবং কবিয়ালের নিজস্ব মেধায় তৈরি কবিগান। কবিগান সাধারণত দুজন কবির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। একজন প্রশ্ন করেন, প্রতিপক্ষ জবাব দেন। সবশেষে জোটপালা বা মিলনগীতির মাধ্যমে কবিগান সমাপ্ত হয়।

মূল গায়ক

মূল গায়ককে কবিয়াল বা সরকার বলা হয়। তিনি মূলত পাঁচালি ও অন্যান্য সংলাপ ও গীত পরিবেশন করেন। ১. সহযোগী গায়ক : ৫-৬ সহযোগী শিল্পী থাকে। এদেরকে দোহার বা পাইল বলে। প্রথমে দোহাররা মঞ্চে সৃষ্টিকর্তার নামে ডাক-মালসি, সখী-সংবাদ ও ভবানী-সংবাদ নামে একটি গান পরিবেশন করবেন। দ্বিতীয়বার দোহাররা একটি মালসি গান করবেন। তৃতীয়বার তারা বিভিন্ন দেবদেবীর নামে সখী-সংবাদ নামে একটি গান পরিবেশন করবেন। এর পর কবিয়াল বা সরকার মঞ্চে এসে ছালাম বিনিময় করে প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নের ধুয়ো গান পরিবেশন করেন। দোহাররা গায় এবং সরকার বা কবিয়াল বলে দেয়। একে টপপা গান বলে। টপপার মধ্যে প্রশ্ন থাকবে। টপপা শেষে কবিয়াল বন্দনা গীত পরিবেশন করবেন। এরপর প্রতিপক্ষকে প্রশ্ন করে মঞ্চ থেকে নেমে আসবেন। এটাকে পাঁচালি বলে। প্রতিপক্ষ শিল্পী একইভাবে মঞ্চে উঠে একই রীতিতে কবি গান পরিবেশন করবেন। ২. ব্যবহৃত যন্ত্র : এসব গানে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢোল, হারমোনিয়াম, কাঁস, আঁড় অথবা কর্নেট বাঁশি, মন্দিরা, দোতারা, বেহালা ব্যবহৃত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে লোহাগড়া উপজেলার জয়পুর গ্রামে কাশীনাথ সরকার নামে একজন কবিয়ালের খোঁজ পাওয়া যায়। তিনি মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাকে কড়াল নামে ডাকা হতো। কাশীনাথ সরকার কবিগানে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। তবে তার রচনাবলি খুঁজে পাওয়া যায় না। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে এই কাশীনাথ সরকারের ঔরসে প্রখ্যাত কবিয়াল তারকনাথ সরকার (তারক কড়াল নামে সুখ্যাত) জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক সূত্রে তিনি সংগীতপ্রিয় ছিলেন। যৌবনে কবিগানের প্রতি আকর্ষণে পিতার কাছে কবিগানের প্রতি হাতেখড়ি নেন। পরবর্তী সময়ে জীবনের শেষ দিকে তিনি মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী নামক জনৈক ধর্মগুরুর নিকট দীক্ষা নেন এবং হিন্দু

www.pathagar.com

ধর্মের মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তিনি হরিলীলামৃত ও হরিসংকীর্তন নামে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন।

জারি, ভাব ও কবি গানে যিনি মঞ্চে প্রথমে আসবেন তিনি প্রতিপক্ষ শিল্পীকে প্রথমে প্রশ্ন ছুড়ে দেবেন এবং পরে প্রতিপক্ষ এর জবাব দিবেন। এখানে যারা এসব গান পরিবেশন করেন তাদের খুব একটা উচ্চ ডিগ্রি নেই। তবে তারা স্বশিক্ষিত এবং অত্যন্ত জ্ঞানী। সাধারণত শীত মৌসুমে এসব গান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বৃষ্টি মৌসুম বাদে অন্যান্য মৌসুমেও এ গান পরিবেশিত হয়।

এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিগান বহিরাগত শিল্পীদের পরিবেশনায় সমাপ্ত হয়। নড়াইলের তাঁরাপুর গ্রামের জারিয়াল অধ্যক্ষ রওশন আলী মাঝে মধ্যে কবিগানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া বর্তমানে এ অঞ্চলে দু'একজন শিল্পী সীমিতভাবে কবিগানের সাথে যুক্ত রয়েছেন।[৩৩]

কবিগান

নড়াইলের জমিদার মহারাজ
স্বনামধন্য তার কাজ;
সবটাই তিনি সম্মানিত
সকল কাজ তার গুণকৃত।
খালি মাঠে আকাশ তলে
গান গায় সদা কবির দলে।
শামিয়ানার দরকার কি?
বিছানা দিলে দোষ কি?
সম্মানীরা অপর লোকে;
সম্মান করে জাতি সুখে।
জমিদার মহারাজা সম্মানী
বিছানা নাই কারণ কি?
বিছানা পাইয়া বিরুদ্ধদলীয় কবিয়াল গাইলেন :
বাঁচিয়া থাক বিজয় সরকার চিরজীবী হইয়া
কবি হইলাম নড়াইলের
জমিদার মহারাজের বিছানাতে বইয়া।[৩৪]

কবিগানের ফর্ম

মূল শিল্পী একজন। এখানে উল্লেখ থাকে যিনি কবিয়াল তাকে সরকার বলে আখ্যা দেওয়া হয়। যন্ত্রী, দিশাধারী বা দোহার ৪-৫ জন। ঢোল, হারমোনিয়াম, কর্নেট, কাঁস, মন্দিরা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। ধুতি ও পাঞ্জাবি এবং ইদানীং ১-২জন পাজামা-পাঞ্জাবি ব্যবহার করেন।

গায়নরীতি

গানের আসর যেখানে চৌকি বা খাটের সাহায্যে কিংবা তক্তার দ্বারা অথবা সম্পূর্ণরূপে মাটির তৈরি মঞ্চে সর্বপ্রথম সকল যন্ত্রী ও দিশাধারীগণ একত্রে ২-৪টা মিউজিক

www.pathagar.com

পরিবেশন করেন। এরপর একটা ডাক বা বন্দনাগীতি দিশাধারীগণ বা দোহারগণ পরিবেশন করেন। এরপর সকলে মাতৃভক্তিতে করেন মালসি গান। তারপর প্রশ্ন জবাবের ধুয়োগান সখী সংবাদ এবং সর্বশেষ বিশেষ কায়দায় গীত হয় কবিগান। অতঃপর মূল পর্বে যাবার আগে সরকার পিছন হতে বলে দেন এবং একজন দোহার দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষ শিল্পীকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নের ধুয়ো পরিবেশন করেন। এটাকে টপ্পা বলে। যথারীতি দোহারের মাধ্যমে টপ্পা পরিবেশন শেষ হলে- মূল সরকার দাঁড়িয়ে ধর্মীয় রীতিতে ভজনগীতি পরিবেশনের মাধ্যমে সকল দর্শকশ্রোতাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে প্রথমপক্ষ আনিত প্রশ্নগুলির অসঙ্গতি বা কেন কিভাবে ইত্যাদি ভাব আবির্ভাবের কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক বক্তব্য দেন। সরকার কর্তৃক বর্ণিত বক্তব্যগুলি সাধারণত পদ্যাকারে উপস্থাপিত হয়। এ ধারাকে পাঁচালি বর্ণনা বলে। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এভাবে ২/১ খানা ভাব-ভাটিয়ালি, বিচ্ছেদ কিংবা ভজন ইত্যাদি ধুয়োগান পরিবেশনের মাধ্যমে একজন কবিয়ালের কবিরপালা শেষ হয়। যথারীতি দ্বিতীয় পক্ষ তাদের দলবলসহ একই নিয়মানুযায়ী ডাক-মালসি, সখী সংবাদ, কবিগানে জবাব দেওয়ার পর-পাঁচালির সাহায্যে কবিগানকে প্রাণবন্ত উপজীব্য করে তোলেন।

আসরের বিবরণ

মন্দিরের সামনে, প্রাচীন কোনো বৃক্ষ যেখানে পৌরুষানুক্রমে জনগণ পূজা দেয় কিংবা কোনো বারোওয়ারি পূজা প্যান্ডেলে কিংবা ধর্মীয় মানত থাকলে কখনও মানতকারীর বাড়ির আঙ্গিনায় কবিগানের আসর হয়। কবির আসর চারিদিকে লোকজন বসার ব্যবস্থা থাকতে হয়। একদিকে একটু দূরে নানা রঙের দোকানপাট সাজাবার ব্যবস্থা থাকে। আসর পূর্ব তৈরি থাকলে পাকা বেদির উপর হয় কিংবা কলাগাছ দিয়ে চারিদিকে সীমানা করে দড়ি টানিয়ে আসরের মতো আলাদা শিল্পীদের বসবার ব্যবস্থা করা হয়। ইদানীং কোথায়ও কোথায়ও বাংলা খাট বা তক্তা দিয়েও মঞ্চ বা আসর তৈরি করা হয়। আসরের উপরে এক পাশে প্রণম্য দেবদেবীর ছবি জলচৌকির উপর স্থাপন করা হয়। অনেকক্ষেত্রে হরিনামাঙ্কিত কাপড় দ্বারা মঞ্চের চারিদিকে উপরের অংশ সাজানো হয়। যথারীতি শিল্পী ও দর্শকশ্রোতার মাথার উপর প্যান্ডেল করে সিলিং-এর ব্যবস্থা করা হয়।[৩৫]

দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া

জারি, কবি, রামায়ণ, কীর্তন ইত্যাদি যে গানগুলি আসর নির্মাণ করে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সমাবেশ করা হয় ঐ সকল আসরে বিভিন্ন গ্রাম হতে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার নানা বয়সি পুরুষ নারী হাজির হয়। উপস্থিত দর্শকশ্রোতার ধর্মপালনের বিভিন্নতা দেখা যায়। উপরন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধ অধিকাংশ মানুষের আত্মকেন্দ্রিক। যে কারণে সব বিষয়গুলিকে শিক্ষার অন্যতম উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করা সকলের জন্য দুঃসাধ্য হয় বলেই কেবল শ্রুতিনির্ভর সুর সংলাপ, কাহিনি আত্মস্থ করা যায় না। আর যে কোনো বিষয় যদি আত্মস্থ না হয় তা হলে সূক্ষ্ম অনুভূতিতে কোনো বিষয়ই দোলা জাগাতে পারে না এবং ভালোলাগা মন্দলাগা বিষয়ে দর্শকশ্রোতার প্রকৃত প্রতিক্রিয়া জানা যায় না। তথাপিও নড়াইল অঞ্চলে কবিগান কিংবা জারিগান যে কোনো শিল্পীর পরিবেশনার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বয়সি দর্শকশ্রোতা যারা সরাসরি প্রয়াত চারণকবি মোসলেম উদ্দিন বয়াতি এবং প্রয়াত চারণকবি বিজয়কৃষ্ণ সরকারের গান পরিবেশনা দেখেছেন ও উপলব্ধি করেছেন তাদের সকলেরই মতামত বা প্রতিক্রিয়া হলো কবিগানে বিজয়ের তুলনা কেবল বিজয়ই এবং জারিগানে মোসলেমের তুলনা মোসলেমই। কোনো কবিয়াল কিংবা জারিয়াল ঐ দু'জনের মতো পরিবেশন করতে পারেন না। এ দু'জনার বর্ণনা ব্যতীত জারিগানে দর্শকশ্রোতার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ামূলক বক্তব্য লক্ষ করা যায়। কারণ সকল শ্রোতা দর্শক একজন শিল্পীর সামগ্রিক পরিবেশনা দেখে মুগ্ধ নন। কারো সুর ভালো লাগে, কারো অঙ্গভঙ্গি ভালো লাগে, কারো বক্তব্য বা পাঁচালি ভালো লাগে- এমন ধরনের প্রতিক্রিয়া শ্রোতা দর্শকদের নিকট থেকে পাওয়া যায়। তবে জারিগানের ক্ষেত্রে নড়াইল অঞ্চলের অধিকাংশ দর্শকশ্রোতার মতামত হলো আকরাম বয়াতির সুরেলাকণ্ঠ, মোস্তাইন বয়াতির সুর ভালো, সাবু বয়াতির গায়কি ঢং ভালো এবং শাহাজান বয়াতিরও সুর ভালো। তবে সামগ্রিক বিচারে সুরের প্রাঞ্জলতা বর্ণনার কৌশল, বিষয়জ্ঞান ও অঙ্গভঙ্গিতে চারণকবি গোলাম কিবরিয়া বি,এ (কলেজ কিবরিয়া নামে খ্যাতিমান) ও চারণকবি অধ্যক্ষ মো. রওশন আলীর সঙ্গে অন্য কোনো শিল্পীর তুলনা নেই। এ দু'জনের মাঝে গোলাম কিবরিয়া অপেক্ষা রওশন আলীর গানে সুরের ব্যতিক্রম এলাকায় ভিন্নমাত্রা সৃষ্টি করেছে। এলাকায় ধুয়ো শুনলে মানুষ দূর থেকে বলে মোসলেমের ধুয়ো, ভাটিয়ালি শুনলে দূর থেকে বলে বিজয়ের নাত-এ রাসুল শুনলে দূর থেকে বলে কিবরিয়ার নাত এবং বিচ্ছেদ- শুনলেই দূর থেকে বলে রওশনের বিচ্ছেদ। অর্থাৎ নড়াইল অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে যারা জারি ও কবিগান গেয়ে খ্যাতি পেয়েছেন তাদের সকলের মাঝে কবিয়াল বিজয় ও জারিয়াল মোসলেম, কিবরিয়া, রওশন সুরে ও বাণীতে আলাদা ঘরানা তৈরিতে সক্ষম হয়েছেন।

বর্তমান কবিগানে দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া হলো প্রচলিত কবিগানের শিল্পীরা যে ধরনের কবিগান পরিবেশন করেন তাতে কোনো বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, তা যেন গতানুগতিক। অন্য একজন কবিয়ালের সঙ্গে রওশন আলীর কবিগানের পালা অনুষ্ঠিত হলে প্রতিযোগিতামূলক বৈচিত্র্যময় কবিগান শুনে দর্শকশ্রোতা আনন্দ লাভে সক্ষম হয়। কবিয়াল সঞ্চয় মল্লিক ও শংকর এলাকায় জনপ্রিয়। রামায়ণ গান শুনে দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া হলো শিল্পীরা সবাই-ই ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য ও আবেগে আপ্লুত হয় কিন্তু তারপরও মন্তব্য করেন। অমুক শিল্পীর কাহিনি বর্ণনায় প্রাণের ছোয়া কম। এর চেয়ে অমুকের বর্ণনা ভালো। অর্থাৎ "নানা মুনীর নানা মত" প্রবাদ কথাটি নড়াইল অঞ্চলের দর্শকশ্রোতাদের জন্য অত্যন্ত সঠিক। নির্ধারিত কোনো শিল্পীর গান এককভাবে সকল শ্রেণির কাছে ভালো লাগে এমন প্রতিক্রিয়া এখানে দর্শকশ্রোতার কাছে পাওয়া যায় না।[৩৬]

কবিগান, রচনা-বিজয় সরকার

একজন গরিব মানুষ কেশব ভূয়ে, সন্ধ্যার পর বিছানায় শুয়ে,
দীনতায় - জীর্ণতায় পূর্ণমন,
অনেক চিন্তার পরে বুড়ো বরে - কন্যা দিতে চায় তার সংসারে,
দায় ৯০০ টাকা পণ।

www.pathagar.com

প্রথম ফুকর

ও সেই খবর পেয়ে বর জুটল এক কজ্জল বর্ণের লজ্জাহীন বজ্যাত,
তার ছেলেমেয়ে আছে ঘরে বউ মরছে হঠাৎ,
হায় বয়স প্রায় ষাটের উর্ধ্বে- হার মেনেছে সংসার যুদ্ধে,
ভোগে আমের রোগে মধ্যে মধ্যে– পড়ে গেছে নিচের পাটির দাঁত।

মিশ

ও সেই কন্যার বয়স ১৪ বছর শুনতে পেয়ে তাই,
গিয়ে নিমাই বালা বরের বিয়াই বরকে দেয় মিঠে কড়া সান্ত্বনা,
তোমাকে করি মানা শরীক নাশা জরিমানা দিতে যেও না।
তুমি টাকা দিলে হাজার খানেক, বন্ধুবান্ধব নিন্দামন্দ করে অনেক,
টাকায় কি যৌবন পাওয়া যায়?
হলে দোয়াজ বরে কন্যা কিছু মানাতো তোমায়,
আর ভাবে থাকলে সমতা, প্রাণে জাগে সততা।
বিয়াই তোমার নাই কোনো মমতা, না বুঝে ভাব ছাড়া লাফ দিও না।

খোঁজ

আমি তোমার আত্মীয় পর ভাবিও না।

দ্বিতীয় ফুকর

বয়স পঞ্চাশ উর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ, ধর্মশাস্ত্রের মর্ম তোমার কই
হবে যোগে যুক্ত বিষয়মুক্ত, স্বভাবে কালজয়ী হই,
দিনের দিন দিন ফুরালো - কাল পেয়ে কাল জমালো,
তোমার দাঁত পড়িলো, চুল পাকিলো, বিয়াই তোমার তা পাকিলো কই।

মিশ

মোহের উম্মাদনায় হয়েছ ভাই উম্মত্ত রাবণ
তোমায় বারে বারে করি বারণ, মরণ পথে চরণ আর বাড়াইও না।
তোমাকে করি মানা শরীক নাশা জরিমানা দিতে যেও না।

অন্তরা

তোমার এই শখের জাল, সাপের মাল, সাধ করে গলেতে পরিও না
তুমি মন্ত্রহারা যন্ত্রহারা গো ভুল করিয়ে এই মরণ মরিও না।
তোমার পাকচুলেতে কলপ দিয়ে কালো করতে ভাই
তোমার টাক বন্ধ করিবার কোনো ব্যবস্থা তো নাই।
তার তো ঔষধ মেলে না
তুমি বাহিরে যতো সাজ পরগো–মন্ত্রের কাজ চোখ খুলিতে সারে না।
আর নারীচক্র ভীষণ বক্র বুঝা খুব মুশকিল,
তোমায় মুখে যেটুক ভালোবাসবে দিয়ে গোঁজামিল
তুমি তাও কি বুঝলে না।
ব্রজের আয়ান ঘোষের দশা যেমন গো,
পরে খায় ঘরের সব মাখন ছানা॥

www.pathagar.com

পরচিতান

যারা জ্ঞানী মানুষ মহিতলে, দেশকাল পাত্র ভেদে চলে,
বেদে বলে সুপণ্ডিত তারে,
যত বোকা লোক টাকার জোরে সাজে বুদ্ধিমান–
তুমি তার প্রমাণ দিলে এবারে।

তৃতীয় ফুকর

কেন বার্দ্ধক্যে ষোড়শী এনে –বড়শি গলে বাঁধাতে চাও
তোমার বড় ছেলের বিয়ের বয়স তারে বিয়ে দাও
হায় বিষয়ের বিষম বিষে, এ জ্বালা জুড়াবে কিসে
নিয়ে সৎ পরামিশে–দেশের মানুষ দেশে চলে যাও।

কবির জবাব

বিয়াই নিমাই বালা, বড়দার শালা, বিয়াই তুমি বিয়ের বোঝ কি,
এই যে টাকা পয়সা জমিজমা যাবে না সাথে
শেষের বিয়েতে- সুখ করে রাখি।
"বললে টাকায় যায় না যৌবন পাওয়া জানিস না টাকার সমাচার,
আমেরিকার নব আবিষ্কার,
বানরের রগ কাটিয়া, নরদেহে দেয় আঁটিয়া,
তাতে বৃদ্ধের যৌবন রয় ফুটিয়া - না হয় লাগবে দশ হাজার।
"বললে শরীক নাশা জরিমানা শরীক নাশ নয় বেড়ে যায় শরীক
বিয়াই করিও নিরিখ,
আগের বিয়ের হয় পাঁচ ছেলে-এই বিয়ের আর পাঁচ ছেলে,
শেষে দশটি ছেলের বিয়ে দিলে- একচোটে জয় করব দশদিক।

মিশ

জানি যুবতীয় সঙ্গতে বুড়োর শক্তি বেড়ে যায়,
ও তুই দেখিস নিদান শাস্ত্র পাতায় তাই আমি এই বিয়েতে দিলাম মন।
"বললে বয়স গেল ষাটের উর্ধ্বে শুনিয়া লজ্জায় মরিলাম–কি শুনতে কিযে শুনিলাম।
তুই ভাবিলি পরিণামে, বয়স হলে শক্তি কমে,
খেলে পিঁয়াজ-রসুন মুরগির ডিমে, বুড়োরও বাড়ে ক্যালসিয়াম॥
"বললে এই বয়সে বিয়েই তুমি অত টাকা খরচ কর না,
টাকায় ব্যথা সারে না।
টাকা ভরে পকেটে-কেউ অন্যের বেড়া কাটে,
কেউ মরে পথে ঘাটে-শেষে পুরস্কার যা পড়ে পিঠে,
তার চাইতে বিয়ে মন্দ না॥
"আমার বার্দ্ধক্যের এই বিয়ে দেখে তোমার কেন জাগে না পুলক,
তোমার কেমনতর চোখ।
শুইতে ভালো নতুন শয্যায়-মন খুশি হয় নতুন ভার্যায়,
তাতে তুমি কেন মর লজ্জায়-তুমি কি ভাই আজব মার্কা লোক॥

www.pathagar.com

"বললে বিয়াই বর নাই কোন্ ক্ষমতা শুনিয়া মরে যাই লজ্জায়,
ক্ষমতা দেখাই কোন্ জায়গায়।
তোমার গৃহদেবীর মণ্ডপ ঘরে ক্ষমতার পরীক্ষা দেয়া যায়।

বিয়াই আমার কথা নিও- তাড়াতাড়ি বাড়ি যাইও
আমার বিয়ানকে পাঠাইয়া দিও- সে যেন ক্ষমতা বুঝে যায়।

মিশ

থাক তোমরা দুইজন মহানন্দে ফুল বিছানায়,
আমি একলা কাঁদি শূন্য শয্যায়,
(কি দুঃখ আমার হয়ে ভাব) তুমিতো বোঝ না ব্যথা কেমন।

মিশ

বিয়াই হে করি মানা - আমার এই সাধে আর বাঁধ সেধনা, করিয়া এমন।
নাকি টাকা দিলে হাজার খানেক-বন্ধুবান্ধব নিন্দেমন্দ করবে অনেক.
এই দেশের ফসকে ছোড়া যতো- তারা বোঝেনা সাধু সংঘ-দেশ কিসে হয় উন্নত।
আর বুঝতো সে গৌতম ঋষি- সঙ্গে নিয়ে ষোড়শী,
দেখল সদানন্দের মুখশশী - যে করলো সে যুগের পরিবর্তন।
তোমার বাজে কথা শুনিয়া বাড়ে জ্বালাতন।
বললে পাক চুলেতে টাক ধরেছে তাতে আর কি হলো ক্ষতি,
তোমায় বুঝাই সম্প্রতি-
যদিও ধরেছে টাক, ছেলেমেয়ে যাবে না ফাঁক,
ও তুই দুই চার বছর চুপ করে দেখ,করি বসে কতো উন্নতি॥
"বললে চুল পাকিল-দাঁত পড়িলো- বিয়াই তোমার তাতো পাকে নাই,
আমার তা কি দিয়ে পাকাই।
তোমার তা পাকের ঘরে- আমার তা ফাঁকে মরে
তোমার তাতের মানুষ হাতের পরে –আমার তো পাতে অন্ন নাই॥
মালসি : "আমি অহরাত্রি ভাবি মা তোর সৃষ্টির বৈচিত্র্য,
মাগো সেখানে যা না সাজে তাই, সাজালি কোন্ কাজে,
বিশ্ব মাঝে, তোর কি কু-চরিত্র।
মা তুই কৃপণে রে দিয়ে ধন, করলি ধনের মহাজন,
তাতে মা তোর স্বার্থ কি- এইরূপ কতশত দেখি,
যারা পরহিতে সদায় বড়- তাদের নাই মা শক্তি ততো,
দাতার যদি টাকা হতো, তবে সবাই হতো সুখী॥
ভবে কিছু নাই সর্বাঙ্গ সুন্দর দেখে শুনে জানি,
হলে মহাজ্ঞানী মহাগুণি তবো গুণে থাকে নিবিষ্ট॥
"যা করিস তুই ভালোই করিস- করার হাত তোর করতে পারিস

তাই বলে কি সৃষ্টি করবি নষ্ট।
মিথ্যা মোকদ্দমা করে- কেহ জয়ী হচ্ছে রাজ হুজুরে,

www.pathagar.com

টাকার জোরে - মিথ্যা সাক্ষীর বলে- দেখি সতীর চেয়ে
সুখ সম্পত্তি বেশ্যাদের কপালে।
দৌদ্দণ্ড পাষণ্ড ভণ্ড- সুখে ভূঞ্জে এ ব্রহ্মাণ্ড,
কতো সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড - মিথ্যাগ্রস্থী সন্তুষ্ট॥
"মাকালে রে নাকাল করে আতায় দিলি মিষ্ট,
খেটে কতো খাটুনি দিনে রাতে-ফসল হয় না জমিতে,
বিনা যত্নে হয় উড়ী, পড়ে চাষির মাথায় বাড়ি,
মাগো আরও ঘাস গুল্ম তো কতোই আছে-
কালস্বরূপ ফসলের কাছে - তার চেয়েও মান করেছে অজাত জার্মানি-কচুরি।
যে জন প্রাণ চেষ্টায় খেটে মরে তার ঘরে নেই ভাত,
কত লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষ্মী সাক্ষাৎ- প্রমাণ আছে যথেষ্ট।

অন্তরা

মা তোর সৃষ্টির কৌশলে, ভূমণ্ডলে, ফলে আগাছায় বেশি ফল,
মাগো ধন্য হয় দক্ষিণে, লক্ষ্মীর বাস সেখানে,
এমন সোনার দেশে কেন দিলি নোনা জল।
করলি পলাশ আর মাদার দেখিতে সুন্দর, গন্ধ নাই, নাই পরিমল
দিলি বানরের বুদ্ধি- অসুন্দরের বৃদ্ধি- অসুরের গায়ে দিলি বল॥
"মাগো সুর দিলি পাতি শৃগালে রে দিলি না তার তাল,
যত তালিম লোকের রাঙাসুর-এই হলো সৃষ্টির কসুর,
মা তোর সব কাজের পাছে এক জঞ্জাল॥
কত ধনীর হয় মূর্খ সন্তান-গরিবের ছেলে বিদ্বান
এই আরেকটি অলগ্ন - দেখে উৎসাহ হয় ভগ্ন,
মাগো-যত ভালো বউ পায় বোকা লোকে,
জ্ঞানী লোকে প্রায়ই ঠকে-দম্পতির দাম্পত্য সুখে,
কেন ঘটায়ে দিস বিঘ্ন॥
ভোলা বাবার সনে তোর যে অমিল দুই মতে দুইজনে
তোর ভবের সৃষ্টি সেই ধরনে হায়রে মোদের অদৃষ্ট॥

ডাক

শুনি বিশ্ব শিল্পী হয় মা তারা এ বিশ্ব তোর হাতে গড়া,
যায় না করা রহস্যের সীমা,
তুই হয়ে সর্বমঙ্গলে-রাখিলি অমঙ্গলে,
তোরে কে বলে মঙ্গলময়ী মা॥
হলো জয়দেব পুরে প্রলয়কাণ্ড- ঘরে পুষে বিষের ভাণ্ড,
মলো রাজা রামেন্দ্র- সবার প্রাণে দুঃখের কেন্দ্র।
এবার নবীন সন্ন্যাসীর বেশে- মরা রাজা এলো দেশে,
ভাওয়ালের সৌভাগ্যকাশে- আবার উদয় হলো সেই চন্দ্র॥
করতে আসলকে নকল সাব্যস্ত ব্যস্ত ছিল যারা,

www.pathagar.com

এবার পরাস্ত হয়েছে তারা - ধর্মের ভরা - কে ডুবাবে।
যাবত উদয় থাকবে রবি-ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী, অক্ষুণ্নই রবে।
সাবিত্রি আর মালাবতি -তারা বাঁচাইলো মরা পতি-কলির গতির রীতি উল্টোধারা।
দেখি ভাওয়ালের মধ্যমা রাণী-সে যে চামুণ্ডা রূপিণী,
আপন পতির শীরে ধরে খাড়া- দেখে শিখুক বিশ্ববাসী
প্রাণসমান যে প্রাণ প্রেয়সী-সে যদি হয় প্রাণবিনাশী
বিশ্বাসী কে আছে ভবে।
অতি সূক্ষ্ম ধর্মের গতি অজ্ঞে কি বুঝিবে।
রাজার শালার দলে ছিল যারা- শালার শালা সেজে তারা
দেখালো মিথ্যা আর্জি-দয়াল বিধাতার কি মর্জি,
এবার ব্যর্থ করতে ধূর্ত চেষ্টার - পুনরুদ্ধার করলো দেশটার।
আইনত বিজ্ঞ ব্যারিস্টার- মিস্টার বি.সি চ্যাটার্জী।
জানি ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজে জগতের এই রীতি,
খাটি সত্যের পথে থাকলে সতি-সত্যের বাতি কে নিভাবে॥

অন্তরা

সংসারে নারী চক্র-বক্র হলে ঘরের নারী,
কুহকিনীর মায়ায় ভুলে - আছ কাল-নাগিণীর কোলে,
দংশিবে সে মর্মমূলে - কালকূট উগারী।
এবার বিষপানে রাজা রামেন্দ্র - দেখে এল যমের বাড়ি॥
ভবে অর্থে যে অনর্থ ঘটে-আর্যদের স্বীকার্য বটে,
ভবের হাটে সবই ফাঁকিসার॥
ও সেই অর্থ - পিচাশীর খেলায়- জয়দেবপুর রাজার শালায়
ভাঙল অবেলায়– আনন্দের বাজার॥
মেরে বিষ প্রয়োগে ভগ্নিপতি - ভগ্নি নিয়ে রাতারাতি
বসতে গেল রাজপাটে–সুখের স্বপ্ন গেলো টুটে।
রাজার শালা সত্যেন ডাক্তার আশু-রাজান্নে পালিত পাণ্ড
জজ সাহেব পান্নালাল বসু- ফিরে এলো হারা নিধি
বাজে আগমনী সুর - দেশের বিষাদ হলো দূর।

বসলো মরারাজা সিংহাসনে- লক্ষ প্রজার ঐক্যতানে,
বিজয়ী রাজার জয়গানে - মুখরিত জয়দেবপুর।
মাথুর (সখী সংবাদের জবাব)
ও সেই বৃন্দে দূতির কথা শুনে বলে শ্যাম বনমালী,
আমি ব্রজের কথা স্মরিয়া মরমে রই মরিয়া,
নেভা আগুন আবার জ্বালালী।

ফুকর

আমি কাঁদাইয়ে পুরুষ-নারী-ব্রজপুরি-পরিহরি, এলাম হরি মথুরায়।

www.pathagar.com

আমি ভুলে ঐশ্বর্যের খেলায়, পড়ে আমার প্রেম ফাঁদে
গোকুলে গোপিনী কাঁদে ও সেই কান্তা প্রেম-স্বর
হৃদে বিঁধে-সদায়-আমারে কাঁদায়॥

ফুকর

বললি চল বন্ধু ব্রজের পথে ত্বরায়-তোমার নিতে
শুনে জাগে মনস্তাপ, দিলাম বিরহের আগুনে ঝাপ
ব্রজের কথা মনে করে- সদা আমার আঁখি ঝরে
তবু যেতে নারি ব্রজপুরে - মূলে শ্রীদাসের সেই অভিশাপ॥

মিশ

ব্রজরয় আঁধারে ঢাকা বলিস কেন সখী,
যেখানে রাঙা বিধুমুখী- পূর্ণ ব্রজ পূর্ণ আঁখি।

মুখ

রাঈ শশাংকের উদয়গিরি উদয়

প্যাচ

আবার বললি শুকাইছে মাধবীলতা,
আমার অশ্রু নিয়ে সখী ত্বরায় যা তথা,
আমার চোখের বারী নিয়ে - মাধবীর গোড়াতে দিয়ে-
শুকনা লতা ভিজাইয়ে তোরা বাজাস জয় শঙ্খ।

খোচ

এযে মোদের এ বিচ্ছেদের তৃতীয় অংক

ফুকর

বললি পাখি যত বসে নীড়ে-বক্ষ ভাসায় দুঃখের নীরে,
এইতো সখী ভুল বলিস।
কভু– পাখি পায় কি প্রেমের বিষ।
তোরা কাঁদিস কৃষ্ণ বলে- চক্ষুভরা থাকে জলে
ও সেই জলভরা চোখে চাহিলে - সবে পাখির চক্ষে জল দেখিস॥

ফুকর

বললি ভাব সাগরের মাঝামাঝি তরী কেন ডুবাও মাঝি,
তরিতে তাকি জানে- জানে মাঝি আর মহাজনে।
প্রেমসাগরে আমার তরী ভাসিয়ে দিলাম বংশীধারী
আমি ভাসি কিংবা ডুবে মরি- আমার প্রেমের গুরু সেই জানে॥

ফুকর

বললি আর হবো না প্রতিবাদী - চন্দ্রার কুঞ্জে যাও হে যদি
আরতো আমার সেদিন নাই- সবই নিলো বিনোদিনী রাঈ,
চন্দ্রাবলী এই প্রেম পাবে- মাতিয়া জগৎ মাতাবে।

www.pathagar.com

সে যে মার খেয়েও প্রেম বিলাবে- কলিতে সে যে নিমাই॥

ফুকর

বললি বন্ধু হে তোমায় বিহনে- গিয়ে যমুনার জীবনে
আমরা সবাই ত্যাজিবো প্রাণ–ওলো বিরহিণী কথা মান
যে প্রাণ দিলি প্রাণ বন্ধুরে - সেতো আরতা দেয় নাই ফিরে,
দিলে দেওয়া জীবন যমুনারে- বলতো যমুনা তা নেবে ক্যান॥

মিশ

চাওয়া পাওয়ার বাইরে গিয়ে ভজিস গোবিন্দ
প্রাণে পাবি পরমানন্দ, দূর হবে প্রেমাতঙ্ক।[৩৭]

কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল

লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে সকল শিল্পী কবিগান পরিবেশন করেন তাদেরকে লৌকিক ভাষায় কবিয়াল এবং যে সকল শিল্পী জারিগান পরিবেশন করেন তাদেরকে বয়াতি নামে আখ্যায়িত করা হয়।

সনাতন ধর্মাশ্রয়ী কবিগান স্বাভাবিকভাবে হিন্দু কবিয়ালগণই পরিবেশন করেন, বিষয়বস্তু অধিকাংশই সনাতন ধর্মীয় হওয়ায় দর্শকশ্রোতার সংখ্যা সনাতন ধর্মাবলম্বী নারী পুরুষগণ বেশি হয়। তবে বাংলাদেশের সর্বত্র বিশেষ করে নড়াইল অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি থাকায় কবিগান ও জারিগানে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের শ্রোতামণ্ডলীকে আসরে দেখা যায়। একজন মঞ্চশিল্পীকে সবসময় খেয়াল রাখতে হয় কিভাবে সংগীত পরিবেশন করলে অধিকাংশ দর্শকশ্রোতা খুশি থাকবেন। কবিয়ালকে স্থায়ীভাবে শ্রোতার অন্তরে জায়গা করে নেবার ক্ষেত্রে শ্রোতার ভালোলাগার জায়গাটিকে বুঝতে হয় এবং তা বুঝেই তবে সংগীত পরিবেশন করতে হয়। এটাই একজন কবিয়ালের সংগীত পরিবেশনের মুখ্য কৌশল। মুসলমান শ্রোতার সংখ্যা বেশি হলে কবিয়ালকে কেবলমাত্র পাঁচালিতে সময় ব্যয় না করে মাঝে মাঝে প্রাসঙ্গিক গান পরিবেশন করতে হয়- তা নাহলে শ্রোতাবৃন্দ বিশেষ করে মুসলমান শ্রোতাবৃন্দ ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়। কারণ পাঁচালিতে বলা হয় শাস্ত্রীয় বিষয়। যেহেতু কবিগানে হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা বেশি হয়, সেহেতু বিষয় অজানা থাকার সুবাদে মুসলিম শ্রোতাদের তা ভালো না লেগে বরং গতানুগতিক মনে হয়। সেজন্য সংগীত ও সুরের সংমিশ্রণ ঘটালে একদিকে সুরের প্রভাব এবং অন্যদিকে শাস্ত্রীয় বিষয়টি সাহিত্যের সরস আলোচনার মাধ্যমে শ্রোতাদের উপজীব্য করে তোলা যায় এবং তা অবশ্যই সর্বজন গ্রাহ্য হয়। সুতরাং নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা, মূল বিষয়কে সাবলীলভাবে শ্রোতাদর্শকের কাছে মূল বক্তব্য হিসেবে পৌঁছে দেয়া এবং প্রচলিত শিল্পের প্রতি জনমানুষের আকাঙ্ক্ষাকে আরও তীব্রতর করার দায়িত্ব একজন মঞ্চ শিল্পীকে একত্রে পালন করতে হয় বিধায় সংগীত অর্থাৎ মঞ্চে আলোচিত সার্বিক বিষয়বস্তুর সমষ্টিই কবিগান পরিবেশনের জন্য কৌশলী হতে হয়। শিল্পীর অভিনব কৌশল এ শিল্পের বিশেষত্ব সৃষ্টি করে এবং সাধারণ জনগণ আকর্ষিত হয় এবং শিল্পের প্রচার ও প্রসার

www.pathagar.com

বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে জারিগান পরিবেশনকারী বয়াতিকে তার জারি কাহিনি বর্ণনার জন্যও কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তবে এক্ষেত্রে জারির পালা কাহিনি বর্ণনার উপর একজন বয়াতির গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে। নবি বংশের কিংবা কারবালার মৃত্যুর বিভীষিকাময় বিয়োগান্তক কাহিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো অনুষঙ্গ গান কিংবা সাহিত্য করার অবকাশ থাকে না। সুতরাং সর্বশ্রেণির মানুষ যথা- হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় কিংবা ধর্মের প্রতি অনুগত নয় এমন শ্রেণির মানুষের কাছেও কাহিনির বর্ণনা এমন উপজীব্য করে উপস্থাপন করা আবশ্যক যাতে সকল শ্রোতাদর্শক বর্ণনায় আগাগোড়া বা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সম্মোহিত হয়ে পালা কাহিনির বিষয়ের মাঝে নিমজ্জিত হয়। তবে জারিপালা কাহিনি বর্ণনা করা ব্যতীত দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে পক্ষ-প্রতিপক্ষ হয়ে দুজন বয়াতিকে শাস্ত্রীয় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। শাস্ত্রীয় বিষয়গুলি পাঁচালির আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়। সুতরাং বয়াতিকে পাল্লার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা রেখে সাবলীল ভঙ্গিতে ভাব ও রসপূর্ণ ব্যঞ্জনায় পাঁচালি বর্ণনা করতে হয়। এ শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও পালা কাহিনি বর্ণনার যথার্থ যোগ্যতার উপর একজন বয়াতির ব্যক্তিগত অবস্থান, জারিশিল্পের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে। সুতরাং শিল্পের প্রচার ও প্রসারে অবশ্যই একজন বয়াতিকে সার্বিক বিবেচনায় নিয়ে জারিগান পরিবেশনের কৌশল জেনে বুঝে কৌশল প্রয়োগ করতে হয়।[৩৮]

জ. পুথিসাহিত্য ও পুথিপাঠ

বাংলার লোকসাহিত্য বিচিত্র উপাদানে বৈচিত্র্যময়। পুথি লোকসাহিত্যের অন্যতম একটি শাখার নাম। অবসর আনন্দের সময় অতিবাহিত করার জন্য একসময় মানুষ পুথিপাঠ করতো এবং পুথি কিতাব পাঠ করা রীতিমত জননন্দিত বিষয় ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে পুথিসাহিত্য সূচিত হয়েছিল কবি শাহ্ মোহাম্মদ গরীবুল্লাহর হাতে। তখন থেকেই প্রচুর পুথি রচিত হয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে গ্রাম-বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলে পতিত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পুথিসাহিত্যের ভাষা সর্বসাধারণের বোধগম্য ছিল। ফলে পুথিপাঠ জনপ্রিয়তার লাভে সমর্থ হয়েছিল। বর্তমানে পুথিপাঠের প্রচলন কমে আসছে, তবে পুথিকে অবলম্বন করে জারিগান এখনও টিকে আছে। নড়াইল অঞ্চলে প্রায় ২৫-৩০ বছর হয় কেউ আর পুথিপাঠ করেন না। অধিকাংশ পুথিপাঠক মারা গেছেন। যারা বেঁচে আছেন তাদের একজন নড়াইল সদর উপজেলার আউড়িয়া ইউনিয়নের নাকশি গ্রামের আব্দুস সোবাহান মোল্যা। আমরা তাঁর কাছে যাই এবং পুথিপাঠের বিষয়ে তাঁর একটা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। সাক্ষাৎকারটি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

তথ্যসংগ্রহকারী : আপনার নাম কী?
আব্দুস সোবাহান মোল্যা : আমার নাম আব্দুস সোবাহান মোল্যা।
তথ্যসংগ্রহকারী : আপনার পিতার নাম কী?
আব্দুস সোবাহান মোল্যা : আমার পিতার নাম মো. লাল মাহমুদ মোল্যা ।
তথ্যসংগ্রহকারী : আপনার পরিপূর্ণ ঠিকানা কী?

www.pathagar.com

আব্দুস সোবাহান মোল্যা : আমার গ্রাম নাকশি, ডাকঘর : কমলাপুর, থানা : নড়াইর, জেলা : নড়াইল।

তথ্যসংগ্রহকারী : আপনার বর্তমান বয়স কত এবং কত বছর বয়স হতে আপনি পুথি পাঠ করেন, কতদিন পুথি পড়া বন্দ করেছেন? আপনি কতটুক লেখাপড়া জানেন?

আব্দুস সোবাহান মোল্যা : আমার বর্তমান বয়স ৭০ বছরের বেশি, ১৭-১৮ বছর বয়সের সময় হতে পুথি কিতাব পড়া শুরু করি এবং প্রায় ২৫-২৬ বছর আগে থেকে কিতাব পড়া বাদ দিয়েছি। ক্লাস থ্রি পর্যন্ত লেখাপড়া জানি।

তথ্যসংগ্রহকারী : আপনি পুথি কিতাব কেন পড়তেন বা পড়েন? আর কেউ এখানে পড়তো কিনা এবং তাদের বর্তমান অবস্থা কী?

আব্দুস সোবাহান মোল্যা : ছোটবেলা থেকে গানবাজনা আমার ভালো লাগতো, আমি জারিগান শেখার চেষ্টা করি কিন্তু সংসারের অভাবের জন্য সময় দিতে না পারায় তা হয়ে ওঠেনি। এরপর আনন্দ পাবার জন্য আমি পুথিকিতাব পড়া শুরু করি। তবে আনন্দ পাবার পাশাপাশি জঙ্গনামা কিতাব পড়ে নবি বংশের বীরদের যুদ্ধের কাহিনি জানতে পারি ও ধর্মের প্রতিও মনোযোগ বাড়ে। ফলে আজকাল একা একা কিছু সময় কিতাব পড়ি, কিছু সময় হাদিস পড়ি এবং নামাজ কালামে সময় কাটাই। সাধারণত বর্ষার বিকেলে কিংবা সন্ধ্যায় নামাজ শেষে মাটির কুপি জ্বালিয়ে পুথিপড়ার আসর বসতো। আশেপাশের লোকেরা বসে বসে পুথি পড়া শুনে আনন্দ লাভ করতো ও ধর্ম বিষয়ে কিছু খবর জানতে পারতো। অন্যদিকে মাঠে কাজ করার সময় আমরা যারা পাশাপাশি জমিতে কাজ করতাম তাদের মাঝে পুথিপাঠ ও ধুয়োগানের প্রতিযোগিতা হতো। আমাদের গ্রামের শহীদ শেখ ও মতলেজ বেহারা পুথি পড়তো এবং মতলেজ বেহারা সবচেয়ে ভালো সুরে পুথি পড়তো। বর্তমান ওরা বেঁচে নেই। আমার জানামতে এ এলাকায় যারা পুথি পড়তো তারা বেঁচে নেই । আর আজকাল কেউ পুথি শোনেনা।

তথ্যসংগ্রহকারী : আপনি সাধারণত কী কী কিতাব পড়তেন, এখনও কোনো কিতাব পড়েন কিনা এবং কোন্‌টি বেশি ভালো লাগে?

আব্দুস সোবাহান মোল্যা : আমি জঙ্গনামা বা কারবালার যুদ্ধের কাহিনির কিতাব, গাজি কালু চম্পাবতীর কিতাব, সোনাভানের কিতাব, ছয়ফলমুলুক বদিউজ্জামালের কিতাব, আমির হামজার কিতাব ও ইউছুফ জুলেখার কিতাব পড়তাম। বর্তমানে গাজি কালু চম্পাবতী ও ইউছুফ জুলেখার কিতাব একা একা পাঠ করি। আমার এ দুখানা কিতাব ভালো লাগে।

তথ্যসংগ্রহকারী : বিশেষ করে এ দুখানা কিতাব কেন ভালো লাগে?

আব্দুস সোবাহান মোল্যা : ইউছুফ জুলেখার কাহিনি কোরানে আছে এবং গাজি কালু পিরের কাহিনি এ এলাকার মানুষ বিশ্বাস করে, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে বা আমি নিজেও সত্য হিসেবে মানি বলেই এ দুখানা কিতাব বৃদ্ধ বয়সে আমার সম্বল। আমি একটা প্রশ্ন করি আমার এসব কথা শুনে আপনার লাভ কি বা এতে আমার কি উপকার হবে?

www.pathagar.com

তথ্যসংগ্রহকারী : আমার লাভ হলো আমি বাংলা একাডেমির দেওয়া দায়িত্ব পালন করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বসবাসরত মানুষের নৈমিত্তিক জীবনের সুখ দুঃখ বা ভালোমন্দ লাগার বিষয়গুলি জানতে পেরে জ্ঞান সঞ্চয় করে সমৃদ্ধ হচ্ছি । অন্যদিকে আপনার লাভ হলো বাংলা একাডেমী এ বইটি প্রকাশ করলে আপনার এ ছবিসহ জীবনের গোপন কথাগুলি দেশের মানুষ জানতে পারবে। আপনি চিরকাল মানুষের মনে বেঁচে থাকবেন।

আব্দুস সোবাহান মোল্যা : আমি দোয়া করি আপনারা ভালো থাকুন।

তথ্যসংগ্রহকারী : আমিও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আপনার সুন্দর ও দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

পুথি পাঠরত সোবাহান মোল্যার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন প্রধান সমন্বয়কারী

তথ্যনির্দেশ

১. বক্তিয়ার হোসেন, গ্রাম : তারাপুর, জেলা : নড়াইল, তারিখ : ১৮.১০.১১, সময় : সকাল ১০.০০টা

২. খলিলুর রহমান, গ্রাম : তারাপুর, জেলা : নড়াইল, তারিখ : ১৯.১০.১১, সময় : বিকাল ৪.০০টা

www.pathagar.com

৩. আলী মিয়া, গ্রাম : তারাপুর, জেলা : নড়াইল, তাখি : ১৮.১০.১১, সময় : সকাল : ১১.০০টা
৪. শিক্ষক আব্দুল জলিল (৩০), লাহুড়িয়া সৈয়দ পাড়া, লাহুড়িয়া ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ০৮.০২.১২, সময় : সকাল : ১১.২০ মি.
৫. প্রভাষক, সৈয়দ রেজাউল করিম (৪২), লাহুড়িয়া আদর্শ কলেজ, লাহুড়িয়া ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ০৮.০২.১২, সময় : দুপুর : ১২.০০টা
৬. শিক্ষক মেরাজ খান (৩০), লাহুড়িয়া ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ০৮.০২.১২, সময় : বিকাল ৫.০০টা
৭. রেজাউল ইসলাম (৩৫), উপজেলা প্রতিনিধি, দৈনিক সমকাল লোহাগড়া, তারিখ : ০৫.০২.১২, সময় : সন্ধ্যা : ৭.০০টা
৮. আব্দুল কুদ্দুস মোল্যা, তারাপুর, সিংগাশোলপুর, নড়াইল, তারিখ : ১৮.১০.২০১১, সময় : বিকাল ৫.৩০ মি.
৯. আজিবর রহমান শেখ, বাঁশগ্রাম, তারিখ : ১৯.১০.১১, সময় : সকাল : ১১.০০টা
১০. আকরাম শাহীদ চুন্নু, আলাদাপুর, নড়াইল, তারিখ : ১৯.১০.১১, সময় : বিকাল ৩.০০টা
১১. নির্মল ভদ্র, রূপগঞ্জ, নড়াইল, তারিখ : ২০.১০.১১, বিকাল : ৫.০০টা
১২. মোল্যা রাজু আহম্মেদ(২৮), ইতনা, ইতনা ইউনিয়ন, রিফাত-বিন-ত্বহা, লক্ষীপাশা, লোহাগড়া পৌরসভা, তারিখ : ১২.২.১২, সময় : বিকাল ৪.০০টা
১৩. রিফাত-বিন-ত্বহা, জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক জনকণ্ঠ, নড়াইল, ঠিকানা : লক্ষীপাশা, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া, তারিখ : ০৬.০২.১২ সময় : রাত্র ৮.০০টা
১৪. শিক্ষক রাজিব আহম্মেদ (৬০) সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ইতনা সেবা সমিতি, ইতনা ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ০৯.০২.১২, সময় : সকাল ৯.০০টা
১৫. সরদার গোলাম মোস্তফা, লোহাগড়া, নড়াইল, তারিখ : ১২.২.১২, সময় : বিকাল ৫.০০টা
১৬. মোশারফ হোসেন সৈয়দ, গোবরা, নড়াইল, তারিখ : ২০.১০.১১, বিকাল : ৩.৩০টা
১৭. মোশারফ হোসেন সৈয়দ, গোবরা, নড়াইল, তারিখ : ২০.১০.১১, বিকাল : ৩.০০টা
১৮. খোকন চন্দ্র বিশ্বাস, দুবলাজুড়ি, নড়াইল, তারিখ : ২২.১১.১১, বিকাল : ৪.০০টা
১৯. মো. সাইফুল হাসান মিলন, কালচারাল অফিসার, জেলা শিল্পকলা একাডেমী, নড়াইল, তারিখ : ০৩.০৮.২০১৩ রাত : ৮.০০টা
২০. বাণী চক্রবর্তী (৫৫), কুন্দশী, লোহাগড়া পৌরসভা, উপজেলা লোহাগড়া। তারিখ : ২৩.০১.১২
২১. সবিতা বিশ্বাস (৫০), চাকুলিয়া, নলদী ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ১০.০২.১২
২২. শিল্পী খানম (১৬), চাঁচই, জয়পুর ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ০৭.০২.১২
২৩. ৫ম শ্রেণির ছাত্রী হুমায়রা নওরীন দোলা, পিতা : আশরাফ আহম্মেদ (৫৫), জয়পুর, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ১১.০২.১২
২৪. অষ্টম শ্রেণির ছাত্র নূর জালাল খান তালবাড়িয়া গ্রাম, ও অষ্টম শ্রেণির ছাত্র জিনাল মোল্যা, দিঘলিয়া গ্রাম, দিঘলিয়া ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ০৫.০২.১২

www.pathagar.com

২৫. ৫ম শ্রেণির ছাত্রী সায়সা বিশ্বাস, নলদী, নলদী ইউনিয়ন, লোহাগড়া। তারিখ : ১১.০২.১২
২৬. হুমায়রা নওরীন দোলা (১০), জয়পুর, লোহাগড়া উপজেলা, দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী নিশাত আরা পিউলি, হালিমুর রহমান, সিয়েরবর, শালনগর ইউয়িয়ন, লোহাগড়া উপজেলা : তারিখ : ০৯.০২.১২
২৭. নারগিস সুলতানা (২৯), আমাদা গ্রাম, লক্ষ্মীপাশা ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা : তারিখ : ১২.০২.১২
২৮. মনিরা সাজ্জাদ (২৮), চাঁচই, জয়পুর ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা : তারিখ : ০৭.০২.১২
২৯. ডলি বেগম (৩৭) দেবী সরশুনা, নওয়াগ্রাম ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা : তারিখ : ০৭.০২.১২
৩০. সাইফুল ইসলাম, তুহিন, নির্বাহী পরিচালক, নবান্ন, সংবাদকর্মী। তাং : ১৬.০১.১২
৩১. শিরিনা পারভীন (৪৮), জয়পুর, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা : তারিখ : ২৪.০১.১২
৩২. রমেশ চন্দ্র সমাদ্দার (৫৫), কৃষ্ণপুর গ্রাম, জয়পুর ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ২৯.০১.১২
৩৩. আমিরুল ইসলাম (২৫), দিঘলিয়া বাজার, দিঘলিয়া ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা : তারিখ- ০১.০২.১২ ইং
৩৪. অধ্যক্ষ মো. রওশন আলী তারাপুর, নড়াইল
৩৫. বয়াতি কামরুল হাসান (৪৪), আকরাবাড়ি, দিঘলিয়া ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা : তারিখ : ২৬.০১.১২
৩৬. কবিয়াল সমীরণ বিশ্বাস, সীতারামপুর, নড়াইল। তারিখ–১১.১০.১২
৩৭. মো. রওশন আলী, অধ্যক্ষ, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ মহাবিদ্যালয়, নড়াইল
৩৮. কবিয়াল সঞ্জয় কুমার মল্লিক, মণিরামপুর, যশোর এর নিকট হতে নড়াইল

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পগুলোই বস্তুগত লোকসংস্কৃতি। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার উপযোগী লোকশিল্পের সৃষ্টি মূলত পৈতৃক সূত্রে। জীবন-জীবিকার বাস্তব প্রয়োজনে ঐতিহ্যবাহী পেশার সৃষ্টি হলে তাদের হাতেই লোকশিল্পের ধারা অব্যাহত আছে।

লোকশিল্প

এ অঞ্চলের কোথাও বর্তমানে লোকশিল্পের তেমন প্রভাব দেখা যায় না। তবে কিছু মৃৎশিল্পের কাজ, কিছু বাঁশ বেতের কাজ এবং অতি অল্প নৌশিল্পের কাজ দেখা যায়।

১. মৃৎশিল্প

সদর উপজেলার মৃৎশিল্প

নড়াইল উপজেলার ভদ্রবিলা ইউনিয়নের চণ্ডিতলা গ্রাম এবং চণ্ডিবরপুর ইউনিয়নের রতডাঙ্গা গ্রামে মৃৎশিল্পের কর্মীদের কিছু কাজ করতে দেখা যায়। নড়াইলে মৃৎশিল্প যারা ধরে রেখেছেন তাদেরকে কুমোর (স্থানীয় নাম) নামে আখ্যায়িত করা হয়। হাঁড়ি, কলসি, ঢাকুন, পিঠার ছাচ, মালসা, ঝাঁঝোর, ঠিলে, কুপি (ল্যাম্প) ইত্যাদি জিনিসপত্র মাটি দিয়ে তৈরি হয়। পৌরসভার মাছিমদিয়া গ্রামে একঘর কুমোর আছে। এদের স্থানীয় ভাবে "পাল" বলে ডাকা হয়। মাটির জিনিস তৈরি করার জন্য বিশেষ বিশেষ জিনিসপত্র হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যথা- ক. কাঠের তৈরি চাকা, খ. বিটি, গ. পারা, ঘ. ন্যাক, ঙ. আঠালে, চ. মাঠে, ছ. পিটনে, জ. বোলো।

প্রযুক্তি

মাটি সর্বপ্রথম ভালো করে মিশ্রণ করা হয়। এরপর প্রতিটি গোল জিনিসের (মাটির পত্রের অংশের অনুরূপ) জন্য বিটি দিয়ে অংশটুকু তৈরি করতে হয়। প্রয়োজনে বাঁশের চটায় তৈরি ন্যাক দিয়ে কেটে সুন্দর বা পরিমিত আকার করতে হয়। এর যে অংশ গোল অংশের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে সেই অংশটা আটা রুটির মতো তৈরি করতে হয় এবং তৈরির জন্য "বোলো" নামক যন্ত্র দিয়ে আস্তে আস্তে করতে হয়। এরপর দু'টি অংশ ধীরে ধীরে পিটিয়ে জোড়া লাগাতে হয়। যে যন্ত্র দিয়ে পিটাতে হয়- এটার নাম পিটনে। এরপর কাঠের চাকায় ঘুরিয়ে মসৃণ করতে হয়। তবে সবক্ষেত্রে হাতের নিপুণ কারিগরি ও কৌশল সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখে। এছাড়া ঢাকুনের ধরার জায়গায় বাড়তি অংশ তৈরিতে "পারা" লাগে। পিঠের ছাচ তৈরিতে "আঠালে" লাগে এবং পিঠের ছাচের চোখ তৈরিতে "মাঠে" লাগে।[১]

www.pathagar.com

মাটির তৈরি হাড়ি, ঢাকুন, মালসা, পিঠের ছাচ, ঝাঝর
ছাবনা ইত্যাদি বিক্রির জন্যে রাখা

মাটির ঢাকনা তৈরির কাজ চলছে। পাশে মাটির রুটির মত বেলে গোল করে সারি সারি করে রাখা হয়েছে

www.pathagar.com

মৃৎ শিল্পী চাকায় মাটি রেখে ঘট তৈরির কাজ করছেন

মাটির চারি তৈরির কাজ চলছে

www.pathagar.com

লোহাগড়ার মৃৎশিল্প

শখ মেটানোর জন্য হয়তো বা জীবিকার প্রয়োজনে গ্রামের অতি সাধারণ মানুষ জীবন-যাপনের ফাঁকে যে শিল্পকর্ম নির্মাণ করেন তাই লোকশিল্প। এ উপজেলার কুমোর, কামার, সুতোর, বাঁশ-বেতের কাজে দক্ষ শিল্পীরা আজও জেগে আছেন।

গ্রামের মৃৎশিল্পীরা হাঁড়ি, বিভিন্ন ধরনের সরা, মালসা, পিঠা তৈরির ছাঁচ, ফুলের টব, ঝালই, কলসি, চাড়ি, মুড়ি ভাজার ঝাঁজুরি, পূজার সজ্জা ইত্যাদি নির্মাণ করে থাকেন। এর পাশাপাশি অনেকেই নিয়োজিত রয়েছেন মূর্তি নির্মাণের কাজে। তারা দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, শীতলা, হরিঠাকুর, গণেশ, মনসা, শিব, জগদ্ধাত্রী, বিশ্বকর্মা, গঙ্গা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করে থাকেন। এছাড়া মাটির ব্যাংক, কুকুর, বিড়াল, হাতি, ঘোড়া, বিভিন্ন প্রকার ফুল, মাটির লঞ্চ, পাখি, তাল, ডাব, পেঁপে, আনারস, কাঁঠাল প্রভৃতি তৈরি করে বিভিন্ন হাটবাজার ও মেলায় বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এ উপজেলার দিঘলিয়া, লোহাগড়া, জয়পুর, নোয়াগ্রাম, কাশিপুর শালনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের পাল সম্প্রদায়ের সাত শতাধিক পরিবার বাস করে। এর মধ্যে দু'শতাধিক পরিবার বর্তমানে এসব পণ্য বাণিজ্যে জীবন নির্বাহ করছে। আগে এই পেশায় আরও বেশি পরিবার সম্পৃক্ত ছিল। লোহাগড়া এলাকার নরেন পাল (৭০) ও লক্ষণ পাল (৪৭) দুর্গা মূর্তিসহ বিভিন্ন দেব-মূর্তি তৈরিতে খুবই সুনাম রয়েছে। পাল সম্প্রদায় ছাড়াও নিম্নবর্ণের কেউ কেউ মাটির এসব পণ্য এবং দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করে থাকেন। বর্তমানে এ শিল্প মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। এ কাজের জন্য ঝিল, কলস ভাঙা, ও শামুক ভাঙা ছাড়া ভালো কালো আঠালো মাটি ছাড়া পাওয়া দুষ্কর। এক ঝুড়ি মাটির দাম ১০ টাকা। এই এক ঝুড়ি মাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে খরচ পড়ে ১শ ৮০ টাকা। বাজারে এ পণ্য বিক্রি হয় আনুমানিক ২শ টাকা। উৎপাদন মূল্যের চেয়ে বিক্রয় মূল্যের খুব বেশি পার্থক্য না থাকায় এ পেশা থেকে এখন অনেকেই সরে যাচ্ছেন। তবে যারা এ পেশায় রয়েছেন তারা অন্য কাজ জানেন না বিধায় বাধ্য হয়েই রয়েছেন।

নির্মাণ কৌশল

এ সম্প্রদায়ের পুরুষের চেয়ে মহিলারা বেশি কর্মঠ। পণ্য তৈরির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মহিলারা বেশি পরিশ্রম করে। মৃৎশিল্প নির্মাণের জন্য বেশ কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। প্রথমে বাইরে থেকে আনা মাটি পানিতে ভিজিয়ে নরম করে হাত-পা দিয়ে চেপে ঢিল, চাড়া, শামুক বাছতে হয়। এভাবে কয়েকবার চটকানোর (ছ্যানার) এক পর্যায়ে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে 'ন্যাক' করার মতো পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে এক জায়গায় মণ্ড করা হয়। ঐ মণ্ড থেকে পরিমাণ মতো মাটি চাকের পরে রেখে কলসের উপরের যে অংশ তৈরি হয় তাকে 'ফাগোই' বলে। আর কলসের নিচের অংশকে 'চাপড়া' বলে। এটি মেয়েরা 'বোলো' দিয়ে রুটির মতো গোলাকৃতি করে। এরপর 'ফাগোই'য়ের সঙ্গে 'বোলো' এবং 'পিটনে'র সাহায্যে 'চাপড়া'টি পিটিয়ে দুটি অংশকে জোড়া দেওয়া হয়। যাতে কোনো ছিদ্র না থাকে সেজন্য এঁটেল মাটির পাতলা প্রলেপ

www.pathagar.com

দেওয়া হয়, তাতে সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায়। এবার রোদে শুকিয়ে নেওয়ার পর ২-৩শ পিচ হলে 'পুনে'র মধ্যে পোড়াতে হয়। এভাবে বিক্রির উপযোগী করা হয়। যে ঘরে মৃৎশিল্প তৈরি করা হয় তাকে 'আলাঘর' বা 'পালেঙ্গা' আর পোড়ানোর জ্বালানিকে বলা হয় 'বান্না'। ধান গাছের নাড়া, বিভিন্ন কাঠ, বাঁশের গোড়া, সুপারি গাছের খোলা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে অনেকেই সুপারি গাছের খোলা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। কারণ এতে খরচ কম হয়।[২]

কালিয়া উপজেলার মৃৎশিল্প

কুম্ভকাররা পেশা অনুযায়ী তিন শ্রেণিতে বিভক্ত : কুচল, হাম্মর ও দেওরা। ছোট পাত্র নির্মাতারা "কুচল", বড়পাত্র নির্মাতারা "হাম্মর" ও প্রতিমা নির্মাতারা "দেওরা" হিসেবে পরিচিত। কিন্তু নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলায় এই ভাগ দু'রকমের। প্রতিমা ও খেলনা পুতুল নির্মাতা দেউরি বারেন্দি, আর হাঁড়ি পাতিল নির্মাতারা কুমোর বা হাড়েপাল হিসেবে পরিচিত। কুমোর পালরা ৩৬টি গ্রাম নিয়ে নলদী সমাজ, আর বারেন্দি পালরা ১৬টি গ্রাম নিয়ে কেশবপুর সমাজ গঠন করেছেন।

কালিয়া উপজেলার বেন্দা গ্রামের মৃৎশিল্পীরা প্রধানত বিভিন্ন প্রকারের মূর্তি নির্মাণ করেন। দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে তাঁরা দুর্গা, কালী, সরস্বতী, শীতলা, হরিঠাকুর (ওড়াকান্দি), কার্তিক, শিব, জগদ্ধাত্রী, ব্রহ্মা, বিশ্বকর্মা, গঙ্গা প্রভৃতি তৈরি করেন। জীবজন্তু ও পাখিদের মধ্যে হাঁস, মুরগি, টিয়া, ময়না, দোয়েল, কবুতর, গরু, হাতি, বাঘ, হরিণ, ঘোড়া, আর মানুষের মধ্যে বাচ্চা কোলে বধূ, কলসি কাঁখে গ্রামের বউ, ছেলেমেয়ে ইত্যাদি বানান।

কুলসুর গ্রামের পালেরা তৈরি করে মাইট, ফুলের টব, মাটির ব্যাংক, জালা, মুড়ি ভাজার ঝাঁজুরি চাপনা ও পূজার সজ্জা। এই একই কাজ করেন হাচলা, মাউলী ও শুক্তগ্রামের পালেরা।[৩]

২. বাঁশ-বেতশিল্প

সদর উপজেলা বাঁশ ও বেতশিল্প

নড়াইল উপজেলার কুলোইতলা গ্রামে (গোবরা বাজারের পাশে) কিছু আদিবাসী লোক বসবাস করে। স্থানীয়ভাবে এদেরকে ঋষি বা মুচি নামে ডাকা হয় এবং একই এলাকার বাহির গ্রামেও এ সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করে। সারা বছর এরা চালন, কুলা, ধামা, পৈকে, ঢাকনি, খালই (মাছ বহনের বাঁশের পাত্র) পোলো (মাছ ধরার যন্ত্র) আরও কিছু মাছ ধরা যন্ত্র যথা : ঘুনি, দুয়োড়, আরিংদে, সাগরা, টুবো ইত্যাদি এবং ঘরের বেড়া তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। কেবল ঐগুলি তৈরিই করে না বরং গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুরনো এ সকল জিনিসপত্র মেরামত করে নিজেরা আর্থিক সুবিধা পায় ও জনগণের প্রয়োজন মেটাতে সহযোগিতা করে। এ সকল জিনিসপত্র তৈরিতে লোহার তৈরি দাও, কুঠার, ছোট ছুরি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সাধারণত অন্য কোনো হাতিয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

www.pathagar.com

নির্মাণ কৌশল

গ্রাম থেকে তল্লাবাঁশ ও বেত খরিদ করে নিজেদের মতো করে বেত শুকিয়ে পরিচ্ছন্ন করে নেয়। অন্যদিকে বাঁশগুলি কেটে ছোট আকৃতির করে পানিতে ২-৪দিন ভিজিয়ে রাখে। তারপর ভেজা বাঁশ পানি হতে তুলে সুতীক্ষ্ণ ধারালো দাও দিয়ে পাতলা বেতি (বাঁশের পাত) কিংবা চিকন শলাকা তৈরি করে শলাকা ও বেতি আস্তে আস্তে চেছে সুন্দর করে। এরপর হাতের কৌশলে চালন কুলা ধামা ঐ গুলির নকশা উঠিয়ে শিশু বৃদ্ধ কিশোর কিশোরী যুবতি কিংবা মহিলারা এ সকল জিনিসপত্র তৈরি করে। কখনও এগুলি বেতের পাত দিয়ে বেঁধে দেয়া হয় এবং কখনও কখনও গুনো কিংবা প্লাস্টিকের বেতি দিয়ে বাঁধার কাজ করা হয়। বেতের বেতি তৈরি করার আগে ২-৪ দিন বেতগুলি পানিতে ভিজিয়ে তারপর বেতি তুলতে হয়। এরপর হাজার পাওয়ারের রং পানিতে গুলিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে লাল, নীল ইত্যাদি রং করে বৈচিত্র্যময় করে ক্রেতার জন্য দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। গ্রাম হতে গ্রামে ঘুরে ঘুরে সারা বছর এ সকল জিনিসপত্র বিক্রি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলারা বিক্রির কাজগুলি সম্পন্ন করে। তবে পুরুষ লোকেরা বসে থাকে না। এ সম্প্রদায়ের লোকগুলির নারী-পুরুষ শিশু কিশোর সকলে খুব করিতকর্মা। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে যেহেতু কৃষি এ সম্প্রদায়ের লোকগুলির পেশা নয় সেজন্য কাজ না করে থাকার অর্থ হলো না খেয়ে থাকা। সুতরাং অলসভাবে জীবনযাপনের সুযোগ এদের নেই। তবে ঘুনি, চারো, দুয়োড়, পোলো, পাটা, খাদুম, আরিংদে, টুবো ইত্যাদি জিনিসগুলি পরস্পর ধরে রাখার ক্ষেত্রে অর্থাৎ বাঁধন দিয়ে শক্ত করার ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রাকৃতিক লতা ব্যবহৃত হয়। ঐ লতাগুলি শুকিয়ে ভেঙে যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় এটা বাঁকানো যায় ও নরম থাকে। গ্রামের বাগান হতে ঐ লতাগুলি গ্রীষ্ম মৌসুমে তুলে এনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ব্যবহার উপযোগী করা হয়। মাঝে মধ্যে পানি ছিটিয়ে দিয়ে প্রয়োজনে সারা বছরের জন্য কাজের উপযোগী করে রাখা হয়। ঘুনি, টুবো বিশেষ করে এ যন্ত্রগুলি পাত বা শলাকা বেঁধে একত্রিত রাখার জন্য তালের ডগা ভিজিয়ে প্রথমে নরম করা হয়। তারপর ভারওয়ালা ছোট লাঠি দিয়ে পিটিয়ে চ্যাপটা করে আঁশগুলি সুন্দরভাবে আলাদা করে ছাড়িয়ে নেয়া হয়। তালের এ আঁশ দ্বারাই চারো, টুবো, ঘুনি ইত্যাদির বাঁধন দেয়া হয়। এভাবেই ধান উঠানো, চাল মাপা, ধানমাপা, শাকসবজি পরিষ্কার করা, চাউল, ধানের ময়লা ঝেড়ে পরিষ্কার করা, ভাত, তরকারি ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করা, ঘরের দেয়াল সাজাবার কাজে বাঁশ ও বেতের ঐ সকল জিনিসপত্রগুলি হরহামেশা ব্যবহৃত হয়। আগে কেবল আদিবাসী ঋষি বা মুচিরা এককভাবে এগুলি করলেও বর্তমানে গ্রীষ্মের শেষ মৌসুমে বর্ষার কিছু আগেভাগে মুসলমানদের একটা শ্রেণি কাজগুলি বিশেষ করে মাছ ধরার লোক যন্ত্রগুলি নিজেদের ব্যবহার কিংবা বিক্রির উদ্দেশ্যে নির্মাণ করে থাকে।[৪]

সিংগাশোলপুর ইউনিয়নের শুভারঘোপ গ্রাম। এই গ্রামের সর্বদক্ষিণপ্রান্তে বাঁশশিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটা সম্প্রদায় আছে। এদের নলো (নলিয়া) সম্প্রদায় বলে। এই নলোরা গ্রামের মানুষের ধান রক্ষা করে সঞ্চিত রাখার জন্য সাধারণত ৩

www.pathagar.com

হাত ৩½ হাত আড় এবং ৪ হাত ৪½ হাত লম্বা চাটাই তৈরি করে। এলাকায় ওরস, ওয়াজ মাহফিল, মিলাদ মাহফিল, গানবাজনা, অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাটিতে বসার উপকরণ হিসেবে চাটাই ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া নলোরা আগে অর্ডার নিয়ে ৮ হাত ১২ হাত চাটাই তৈরি করে এগুলি গোল করে মুখ বেঁধে দিলে ধান, চাল, মুগ, মশুরি ইত্যাদি ফসল সঞ্চিত রাখার গোলা তৈরি হয়। নলোরা মুসলমান। এলাকার অতি সাধারণ কাঁচাঘরগুলির বেড়া দেয়ার কাজে এই চাটাইগুলি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া মুলিবাশের বেতিগুলি কিছুটা মোটা করে তৈরি করে ৪ হাত উচ্চতাসম্পন্ন বিভিন্ন ঘরের বেড়ার মাপে লম্বা বেড়া তৈরি করা হয়।[৫]

লোহাগড়া উপজেলার বাঁশ ও বেতশিল্প

এ অঞ্চলে হিন্দুদের ঋষি সম্প্রদায় বংশপরম্পরায় বাঁশ বেতের কাজের সাথে যুক্ত আছেন। তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের বাদ্যকর (বাজুন্দার আঞ্চলিক কথা) শ্রেণির মধ্যেও এ কাজের প্রসিদ্ধি রয়েছে। আবার হিন্দুদের বাউতি সম্প্রদায়ও বাঁশ দিয়ে বড় ডালা বা ঝাঁকা তৈরি করে। এ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের দু'শতাধিক পরিবার এই শিল্পের সাথে যুক্ত। বাঁশ ও বেত শিল্পের লোকজন সাধারণত বাঁশের ঝাঁকা, ঝুড়ি, হাংকুরা, চাল ঝাড়া কুলা, মাছ ধরার চালন, চারো, বাইনে, ঘুনি, ফুলের সাঁজি, দোলনা, ধান রাখার জালি, চারা গাছ ঘেরার খাঁচা, গৃহস্থালির বিভিন্ন জিনিস ও কাঁচা বাজার রাখার ডালা, গরুর খাবারের গড়া, মুরগি ও পাখির খাঁচা ইত্যাদি তৈরি করেন।

বাঁশের তৈরি চালন, কুলা, ঝুড়ি, চাঙ্গারি, খালোই ইত্যাদি হাটে বিক্রয়ের অপেক্ষা

www.pathagar.com

কালিয়া উপজেলার বাঁশ-বেতশিল্প

কারুশিল্পের একটি বিশেষ ধারা বাঁশ ও বেতের কাজ। এ কাজের শিল্পীরা সামাজিকভাবে খুবই বঞ্চিত। এ কাজ একদা ঋষি সম্প্রদায়ের আধিপত্য ছিল এবং এখনও পর্যন্ত সেটি বহাল থাকলেও কালিয়া উপজেলার বড় কালিয়া গ্রামের বাদ্যকর শ্রেণির লোকেরা এ কাজ করেন।

ঋষি সম্প্রদায় ও বাদ্যকর শ্রেণির মানুষেরা সাধারণত বাঁশের ঝাঁকা, ঝুড়ি, হাঙ্কুরা, মাছ ধরার চালন, ঢাকনি, ফুলের সাজি, দোলনা, ধানের গোলা, চারা ঘেরার খাঁচা, ঝাল –পেঁয়াজ রাখার ডালা, পাখি ও মুরগির খাঁচা, কুলা প্রভৃতি তৈরি করেন।

ঋষি সম্প্রদায়ের লোকেরা এ কাজ করলেও তাঁরা বেত দিয়ে ধামা, পৈখে, সের, ঢাকঢোল ইত্যাদি তৈরি করেন।

তালপাখা শিল্পের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি সত্ত্বেও এ শিল্প কোনোক্রমে জীবিকা অর্জনের স্থায়ী উপায় হয়ে ওঠেনি। বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের মানুষ এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। পাখা তৈরি হয়ে বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসতে তালপাতা কাটা, জাতে দেয়া, রোদে শুকানো, সাইজ করা, বৃত্তাকারে কাটা, রং করা, বাঁশের চটা দিয়ে বাঁধা, অলংকরণ প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করতে হয়।[৬]

৩. দারুশিল্প

নড়াইল উপজেলার ভদ্রবিলা ইউনিয়নের রামসিদ্ধি গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু লোক আছে। এরা বর্ষা মৌসুম আসার আগে আগে সাধারণ কিছু গাছের কাঠ দিয়ে নৌকা তৈরি করে এবং এগুলি স্থানীয় পেড়ুলি, গাজিরহাট, আবালগাতি ইত্যাদি হাটে বিক্রি করে। নৌকা তৈরির জন্য কুঠার, দাউ, শাবল, করাত, হাতুড়ি, পাতাম, জিনেরি লোহা ইত্যাদি হাতিয়ার ব্যবহৃত হয়। কাঠ সমতল করার জন্য এক ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়। এ যন্ত্রটি বা হাতিয়ারকে রায়দা বলে।

প্রথমে গাছ কেটে ৬ ফুট, ৭ ফুট, ৮ফুট, ২১/২ ফুট ইত্যাদি প্রয়োজনীয় মাপের তক্তা তৈরি করা হয়। এ গাছ থেকে দুই পাশের তক্তাগুলিকে সংযুক্ত রাখার কাজে ব্যবহৃত গুরো-এর সাইজ কাঠ, গলাই এর জন্য সাইজ কাঠ এবং নৌকার ২ পাশের ডালির জন্য সাইজ কাঠ তৈরি করা হয়।

বিশেষ করে ডালির সাইজ কাঠ দুই পাশে মাথা বেঁধে প্রয়োজনমত বাঁকা করে ২-৪ দিন রাখা হয়। এটাকে স্থানীয়ভাবে যাতা দিয়ে রাখা বলে। কাঁচা কাঠের রস কোনো রকম একটু শুকালে রায়দা দিয়ে একজন পিছনে একজন সামনে থেকে টেনে তক্তা ও সাইজ কাঠগুলি মোটামুটি উপরের ছোবড়া ছাড়িয়ে সমান করা হয়। এরপর সবচেয়ে বড় সাইজ কাঠটি যেটি নৌকার নিচে সেট করে পিছনের দিক এবং সামনের দিকে গলাই সেট করে দুই পার্শ্বই টিক দিয়ে উঁচু করে রেখে দেয়া হয়। এই প্রথম স্থাপিত কাঠটির নাম দাঁড়ার কাঠ। এরপর লোহার পাতাম দিয়ে দাঁড়ার কাঠের সঙ্গে তক্তা কাঠ জুড়ে দেয়া হয়। পর পর তক্তা জুড়ে দিতে অনেক পাতামের ব্যবহার হয়। পাতাম ব্যবহারের জন্য তক্তায় গ্রুপ কাটা হয়। এটাকে বাইন কাটা বলে। তক্তা জুড়ে জুড়ে

www.pathagar.com

উপরের দিকে আগা মাথায় ৮-১০টা গুরো আড়াআড়ি গ্রুপ কেটে সেট করা হয়। এরপর নৌকা তৈরি হলে ডালির সাথে অতিরিক্ত একটা কাঠ সংযুক্ত করা হয়। পিছনে ও সামনে গলাইয়ের পাশে তক্তা দিয়ে পাটাতন তৈরি করা হয়। এভাবেই একটা নৌকা সম্পূর্ণ হয়।[৭]

এ শিল্পের লোকেরা কাঠের বিভিন্ন জিনিস তৈরি এবং নকশা করে থাকেন। তারা কাঠের ঘর, খাট-পালঙ্ক, দরজা-জানালা এবং এগুলোর নকশাসহ কাঠের বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

স্থানীয়ভাবে এদের সুতোর বলা হয়। উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে দু'শতাধিক পরিবার এ পেশার সাথে জড়িত। মল্লিকপুর ইউনিয়নের মল্লিকপুর গ্রামের কাঠের নকশা মিস্ত্রি গৌতম বিশ্বাস (৪২), লোহাগড়া পৌরসভার কৃষ্ণপুর গ্রামের নকশা মিস্ত্রি প্রশান্ত বিশ্বাস (৪৫), অরবিন্দ চক্রবর্তী (৬৬), লোহাগড়া পৌরসভার মন্টু ঠাকুর (৬৫) দীর্ঘ বছর ধরে এই পেশার সাথে জড়িত রয়েছে।[৮]

৪. পাখাশিল্প

'গরম কালের পরম পাখা'–পাখাশিল্প গ্রাম বাংলা এমনকি শহরাঞ্চলের মানুষের কাছে এখনও গুরুত্বপূর্ণ। পাখা তৈরিতে সুচ সুতা কাজ ছাড়াও তালপাতা কাটা, জাতে দেওয়া, রোদে শুকানো, সাইজ করা, বৃত্তাকারে কেটে রং করা, চটা দিয়ে বাঁধাই করতে হয়। এসব কাজে বাড়ির মহিলারাই বেশি অংশগ্রহণ করে। ইতনা গ্রামের কনিকা বাদ্যকর (৩৮), পারভীন বাদ্যকর (৩৫), রোজিনা বাদ্যকর (২৫), সবুরন বাদ্যকর (৪৫) আসমা বেগম (৪০), নাজমা গাজি (৩০) সহ প্রায় ১৫টি পরিবার মহিলা পাখা শিল্পের সাথে জড়িত। এসব মহিলা বিভিন্ন ধরনের ও নকশার পাখা তৈরি করে নড়াইলসহ জেলার বাইরেও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

৫. নকশিকাঁথা

এখানকার বিভিন্ন গ্রামে নকশিকাঁথা দেখা যায়। নকশিকাঁথা গ্রামের একটি পুরাতন ঐতিহ্য। জানা যায়–সুদূর অতীতকাল থেকে গ্রামের মানুষ বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজনদের এসব কাঁথা ব্যবহার করতে দেওয়া হতো। এক সময় গ্রামাঞ্চলে নকশি কাঁথার প্রচলন থাকলেও এখন সে ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে। এ কাঁথা তৈরির উপাদান খুবই সাদামাঠা।

পুরনো নকশি শাড়ির পাড় থেকে তোলা সুতোয় অঙ্কিত হয়েছে লতাপাতা, ফুল, পুতুলের ছবি, তালপাতা, পালকি ও নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী। এখানকার গ্রামবাসীর দেওয়ালে কাপড়ের উপর পাখি বা ফুলের ছবি, আবার মোটা কাপড়ের ওপর নকশা করে পাখা তৈরি করে এসব জিনিসে বিভিন্ন উপদেশ বাণী, শ্লোক, কবিতা, লোকছড়া, গান, লেখা বাঁধাই চিত্র আজও দেখা যায়। নবজাত শিশু বড় হচ্ছে স্নেহময়ী বোন কাঁথা সেলাই করতে করতে সুচের আঁখরে লেখে---"সোনামণি ভাই আমার সুখে নিদ্রা যাইও অভাগিনি বুবুর কথা নীরবে ভাবিও।"

www.pathagar.com

গ্রামের ঐতিহ্য তালের পাতা সংগ্রহ করে তা কেটে শুকানোর জন্য রোদে দেওয়া হয়েছে

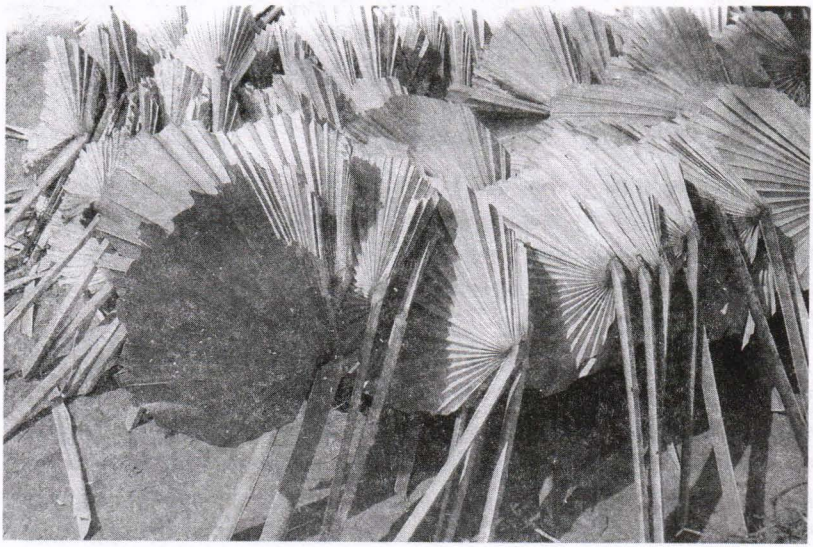

পাখা তৈরির জন্য তালের পাতা কেটে জাতে দেওয়ার জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে

www.pathagar.com

৬. লক্ষ্মীর সরা

এ অঞ্চলে এখনও মুষ্টির চাল রাখতে দেখা যায়। গ্রামের গৃহবধূরা সাধারণত রান্নার সময় প্রতি ওয়াক্তে এক মুঠ চাল বাঁচিয়ে অন্য একটি পাত্রে রেখে থাকেন। যে পাত্রে এই মুষ্টির চাল রাখা হয় হিন্দু সম্প্রদায়ে সেই পাত্রকে লক্ষ্মীরসরা বলে। মুসলিম সম্প্রদায়েও এই মুষ্টির চাল রাখার প্রচলন রয়েছে। মুসলিম সমাজে এটাকে বলে বরকতের ভাণ্ড। কোনো বিশেষ মুহূর্তে অভাব হলে তখন এই লক্ষ্মীর সরার চাল বের করে রান্না করা হয় বলে এটাকে বরকতের হাঁড়ি বলা হয়। হিন্দু সমাজে এই লক্ষ্মীর সরা ধানের মাচার পাশে বা সামনে রেখে তেল সিন্দুর দিয়ে পূজা করা হয়। লোহাগড়ার পাল সম্প্রদায়ের লোকেরা এসব লক্ষ্মীরসরা তৈরি করে থাকেন।

৭. পটচিত্র

লোকশিল্পের গল্প কাপড়ের উপর আঁকা হতো বলে পট্ট থেকে পট নামকরণ হয়ে থাকবে। পট চিত্রের আঁকিয়েরা হলো পটুয়া। এই পটুয়ারা ছবি আঁকেন শখের হাঁড়িতে, লক্ষ্মীরসরায়, কাপড়ে, পিঁড়িতে এবং নানান কাজে, যেখানে উন্মোচিত হয় চিরন্তন অথচ মায়ের মতো সরল একটি চিত্রধারা। আজও সুন্দর নারী-পুরুষের সৌন্দর্যকে তুলনা করতে বলা হয় 'পটের মতো' সুন্দর। দেবদেবীর প্রতিমাকে পটের ঠাকুর বলে মনে করা হয়। লোহাগড়া উপজেলার অন্তর্গত রায় গ্রামের মৃত বৈদ্যনাথ গাছি। যিনি নিজস্ব তাগিদে ও চেষ্টায় বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি সম্বলিত কাঠের ৫-৭ খানা দেউল তৈরি করেছেন। কয়েক শখের হাঁড়ি, লক্ষ্মীরসরা ইত্যাদিতে পটের ছবি আঁকতেন। বর্তমানে নড়াইল তথা বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম নড়াইল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগের শিক্ষক নিখিল চন্দ্র দাস (৫১) (স্থায়ী ঠিকানা : লোহাগড়ার সীমান্তবর্তী এলাকার মাউলী গ্রাম, মাউলী ইউনিয়ন, কালিয়া উপজেলা) হারিয়ে যাওয়া পটের ছবি নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করছেন এবং পটের ছবি আঁকছেন। ইতিমধ্যে তিনি জাতীয় পর্যায়ে যথেষ্ট প্রশংসাও কুড়িয়েছেন। এক সময় যেভাবে পটগুলো আঁকা হতো এবং যে ধরনের রং ব্যবহার করা হতো সে বিষয়ে ব্যাপক খোঁজখবর নিয়ে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

পটের ছড়া

তিন সকি যায় জল আনিতে–মদ্যির সকি কালো
আগের সকির দাঁতে মাজন–ঘাট করিছে কালো॥
কালা বাসরি বাজায়–দুই নয়নে জ্বলে কালা বুক ভেসে যায়।
বাদা বোনে বাগ রে ভাই ঢালু মালু চায়,
নৌকততে মানুষ ধইরে ডাঙ্গায় বইসে খায়॥
কালা বাসরি বাজায়
দুই নয়নে জ্বলে কালার বুক ভেসে যায়।

ছোটোখাটো মিয়ারে ভাই মুখে চাপদাড়ি,

www.pathagar.com

পাকা ধানে গরু দিয়ে হুক্কা টানে বাড়ি৷৷
কালা বাসরি বাজায়
দুই নয়নে জলে কালার বুক ভেসে যায়।

এই ছড়ায় আরো দুই ধরনের ধুয়ো পাওয়া যায়। তা হলো :

১. "ওলো রাজোর মা
চলেক আমরা জল আনতি যায়"।

২. "ও দাদা যাসনে বিদেশে
তোগে মাইয়ে খাবে পুবে বাঙ্গালে"।

অর্থ : সকি-সখি, মদ্যি-মধ্যে, দাঁতে মাজন-দাঁতের পেস্ট, কালা-একজনের নাম, বাসরি-যে বাঁশি বাজায়, বাদা বোনে-সুন্দরবনে, বাগ-বাঘ, নৌকততে-নৌকা থেকে, ধইরে-ধরে, ডাঙ্গায়-নদী বা খালের তীরে, বইসে-বসে, মিয়া-একজন মুসলিমকে বোঝানো হচ্ছে, তোগে-তোদের, মাইয়ে-কন্যা বা মেয়ে, পুবে বাঙ্গালে-বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের মানুষদের বোঝায় ইত্যাদি।

তথ্যনির্দেশ

১. হরিপদ পাল, মাছিমদিয়া, পৌরসভা, নড়াইল, তারিখ : ১৮.১০.২০১১, সময় : সকাল ১০টা
২. রঞ্জন পাল (৪৭), গ্রাম : কাশিপুর, ইউনিয়ন : কাশিপুর, তারিখ : ১৮.১০.২০১১, সময় : সকাল ১০.১০টা
৩. হিরামন পাল (৪২), পিতা : ঠাকুরদাস পাল, গ্রাম : কুলশুর, কালিয়া, তারিখ : ১৯.১০.২০১১, সময় : সকাল ১১টা
৪. শহিদুল ইসলাম, শুভারঘোপ (নলোপাড়া, সিংগাশোলপুর, নড়াইল, তারিখ : ২০.১০.২০১১, সময় : বিকাল ৪টা
৫. মান্নান বিশ্বাস (৪৭), পিতা : জবেদ আলী, গ্রাম : বড় কালিয়া, কালিয়া, নড়াইল, তারিখ : ২৬.১০.২০১১, সময় : বিকাল ৫টা
৬. মেহের আলী বিশ্বাস (৮৭), পিতা : রজব আলী বিশ্বাস, গ্রাম : চাঁচুড়ি (কেষ্টপুর), কালিয়া, নড়াইল, তারিখ : ১১.১০.২০১১, সময় : বিকাল ৪টা
৭. রনো মিস্ত্রি, রামসিদ্ধি, নড়াইল, তারিখ : ২৩.১০.২০১১, সময় : রাত ৮টা
৮. তরি বিশ্বাস (৩৪), পিতা : আবদুল মালেক বিশ্বাস, গ্রাম : চন্দ্রপুর, কালিয়া, নড়াইল, তারিখ : ১৩.১০.২০১১, সময় : বিকাল ৫টা

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

নড়াইলে প্রাচীনকাল হতে হিন্দু মুসলিম শ্রেণির বসবাস দেখা যায়। তবে খুব অল্পসংখ্যক খ্রিষ্টান ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষ নেই। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে বিভিন্ন শ্রেণি বা গোত্রের মানুষ (বংশীয়ভাবে শ্রেণিকরণ করা) বসবাস করে। প্রাচীনকালে বিশেষ করে জমিদারি শাসন বা ব্রিটিশ শাসনামলে হিন্দু অভিজাত শ্রেণির মানুষেরা পরতেন ধুতি-পাঞ্জাবি এবং ক্ষেত্রবিশেষে কোট-টাই, প্যান্ট-শার্ট এবং সাধারণ হিন্দু শ্রেণির মানুষগুলি পরিধান করতেন ধুতি-পাঞ্জাবি, ধুতি-কোর্তা, ধুতি-ফুলহাতা শার্ট (কলারওয়ালা, কোমরের নিচ পর্যন্ত ঝুল, দুপাশে ২টা পকেট, বুকের উপর ১টা পকেটওয়ালা জামার নাম ফুলশার্ট) অতি দরিদ্র শ্রেণির হিন্দুগণ ধুতি-গেঞ্জি পরিধান করতেন। অন্যদিকে মুসলিম শ্রেণির মানুষের মাঝে কৃষিজীবী বা সাধারণ মুসলমানেরাও ব্রিটিশ আমলে ধুতি-পাঞ্জাবি, ধুতি-কোর্তা কিংবা ধুতি-গেঞ্জি ব্যবহার করতেন। ১-২ ভাগ অভিজাত মুসলমান পাজামা-পাঞ্জাবি, প্যান্ট-শার্ট ব্যবহার করতেন। পাকিস্তানি শাসনামল অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পোশাকের এই ধারাবাহিকতা দেখা যায়। অবশ্য এর পর ক্রমাগত পোশাকে পরিবর্তন লক্ষ আসে এবং বর্তমান হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণির মানুষ সাধারণভাবে সবসময় লুঙ্গি গেঞ্জি পরিধান করেন।

ঘরের বাইরে গমনের জন্য প্রাচীন হিন্দুরা কেউ কেউ ধুতি-পাঞ্জাবি এবং গড়পড়তা অধিকাংশ মানুষ প্যান্ট-শার্ট পরিধান করেন। অন্যদিকে মুসলমান শ্রেণির প্রাচীন মানুষ কেউ কেউ লুঙ্গি-পাঞ্জাবি, লুঙ্গি-ফুলশার্ট পরিধান করেন এবং গড়পড়তা সব শ্রেণির মুসলমান পাজামা-পাঞ্জাবি কিংবা প্যান্ট-শার্ট ব্যবহার করেন। অভিজাত শ্রেণির হিন্দু-মুসলমান সবসময় প্যান্ট শার্ট, কোট-টাই ব্যবহার করেন এবং ঘরে কেউ কেউ ট্রাউজারশার্ট কিংবা লুঙ্গি-শার্ট ব্যবহার করেন। মহিলাদের পোশাকের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রাচীনকালে হিন্দু-মুসলিম সকলেই শাড়ি-ব্লাউজ ব্যবহার করতেন। কিশোরী, যুবতি উভয় শ্রেণীর মেয়েরা ফ্রক পাজামা ব্যবহার করতো।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পোশাকেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। গ্রামীণ জনপদ ও শহরে সকলক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণির যুবতী-কিশোরী মেয়েরা পাজামা-কামিজ অর্থাৎ থ্রি-পিস ব্যবহার করে এবং ঘরের বাইরে অর্থাৎ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার ক্ষেত্রে কেউ কেউ জিন্স প্যান্ট শার্ট এবং অন্য সকলেই থ্রি-পিচ, টু-পিচ, পাজামা-শার্ট পাঞ্জাবি ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় আধুনিক পোশাক পরিধান করে। একটু বয়স্ক শ্রেণির কর্মজীবী কিংবা সাধারণ গৃহিণী মহিলাদের ২-৩ অংশ মাত্র শাড়ি পেটিকোট ব্লাউজ কিংবা পেটিকোট ম্যাক্সি ইত্যাদি পরিধান করেন। কিন্তু ঘরের বাহিরে বিভিন্ন

www.pathagar.com

অনুষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনে যাত্রার সময় হিন্দু মুসলিম অধিকাংশ রমণীগণই থ্রি-পিস ব্যবহার করেন। পারতপক্ষে সময়ের দ্রুততায় লক্ষ করা যাচ্ছে বাঙালি পোশাকের ঐতিহ্য বর্তমান সমাজে বাংলাদেশের সর্বত্রই প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে এবং এ ধারাবাহিকতার বিপরীতে নড়াইল অঞ্চলও নয়।

১৯৪৭ সালের আগেও হিন্দু মুসলমান পুরুষরা প্রায় ধুতি, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা শাড়ি পরতো। এসময় ধুতি ও শাড়ি পরার কৌশলও ছিল ভিন্ন। যেমন আগেকার দিনে গ্রামের মেয়েরা আটপৌরে শাড়ি পরতো। বর্তমানে পুরুষ মহিলাদের মধ্যে পোশাকে বেশ পরিবর্তন এসেছে। এখনও শাড়ি, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি পরলেও পুরুষেরা প্যান্ট ও শার্ট, হাফ-ফুল হাতা গেঞ্জি, টি শার্ট এবং মেয়েরা ম্যাক্সি, স্যালোয়ার-কামিজের দিকে ঝুঁকছে। মেয়েরা শাড়ি পরলেও আটপৌরের জায়গায় কুচি দিয়ে শাড়ি পরে থাকে।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

প্রাচীনকাল হতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নড়াইল অঞ্চলের মানুষেরা কাঁচা ঘরবাড়িতে বসবাসে অভ্যস্ত ছিল। ঘরগুলির বৈচিত্র্য বলতে চারচালা, ছয়চালা, আটচালা কিংবা নিম আটচালা ঘর প্রায় সর্বত্র দেখা যেত। বাঁশের চটা কিংবা বাঁশের বেতি দ্বারা ঘরের বেড়া তৈরি দেখা যায়।

ঘরগুলি উলুখড় কিংবা টিনের দ্বারা চালাগুলি ঢাকা থাকতো। কিংবা সুন্দরবন থেকে আমদানিকৃত গরানের কাঠ এবং গোলপাতার ঘরও নড়াইলে প্রচুর দেখা যেতো। নড়াইল উপজেলার পশ্চিমপ্রান্তে শেখহাটি ও বিছালী এবং তুলারামপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত কিছু কিছু ঘরবাড়িতে মাটির বেড়া দ্বারা ঘেরা দেখা যায়।

বাংলা ঘরগুলিতে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি যথা- রুয়ো, বাতা, খাম বা খুটি, আড়া পাইড়, গলার বাতা ইত্যাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঁশের ব্যবহার দেখা যেতো। দোচালা ঘরগুলিতে সুন্দরীর গরান কচা এবং ধানের নাড়া কিংবা গোলপাতা কিংবা শন বা শনখড় দিয়ে চালা তৈরি দেখা যেতো। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি চাকরিজীবী শিক্ষিত মানুষগুলিকে ইট, কাঠ, সুরকি দিয়ে সেমিপাকা ঘর তৈরি করতে দেখা যায়। দুই একটা ভবন দেখা যায় সেগুলিও ইট, বালু সুরকির তৈরি।

বর্তমানেও বিশ ভাগ গ্রামের মানুষ ঘর নির্মাণের কাজে তাল, নারকেল ও বাঁশের খুঁটি, বাতা, আড়া হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। বেড়া হিসেবে পাটখড়ি ও বাঁশের চটা ব্যবহার করেন।

আর ছাউনিতে বিছালি, শন, গমের কাঁটা ব্যবহার হয়। অনেকে ঘর ঠান্ডা রাখার জন্য মাটির দেয়াল দিয়ে ঘর নির্মাণ করেন। তবে সমাজ পরিবর্তনের ধারায় খেটে খাওয়া মানুষদের জীবনমানেও পরিবর্তন আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায় নিম্নবিত্তরাও ইট ও টিনের তৈরি ঘর নির্মাণের দিকে ঝুঁকছে। এখানে বসতবাড়ির বিশ ভাগ পাকা, পঁয়ত্রিশ ভাগ আধা পাকা এবং পঁয়তাল্লিশ ভাগ কাঁচা বাড়ি।

বর্তমান সময় অধিকাংশ গৃহ ভবন সজ্জিত এবং গ্রামাঞ্চলে সেমিপাকা অর্থাৎ টিনের চাল কিন্তু মেঝে, দেয়াল ইটের তৈরি এবং প্রতিটি ঘরই বেজঢালাই করে নির্মাণ করা হচ্ছে।

এসব ঘরের মাঝে টাইলস বসানো দেখা যায়। তাছাড়া অতীতে দুই একটা বাড়িতে এবং বর্তমান কিছু কিছু বাড়িতে টালি দিয়ে ঘর তৈরি করতে দেখা যায়। প্রাচীনকালে কেবল নড়াইল জমিদারগণ পাকা ইমারত তৈরি করেছে দেখা যায়। ইমারতগুলি সুলতানি আমলের ভাস্কর্যে সৌকর্যমণ্ডিত। তবে শহরাঞ্চলে অধিকাংশ গৃহ এখন পাকা। আরসিসি ঢালাই করে ভবনগুলি নির্মাণ করা হয়।

www.pathagar.com

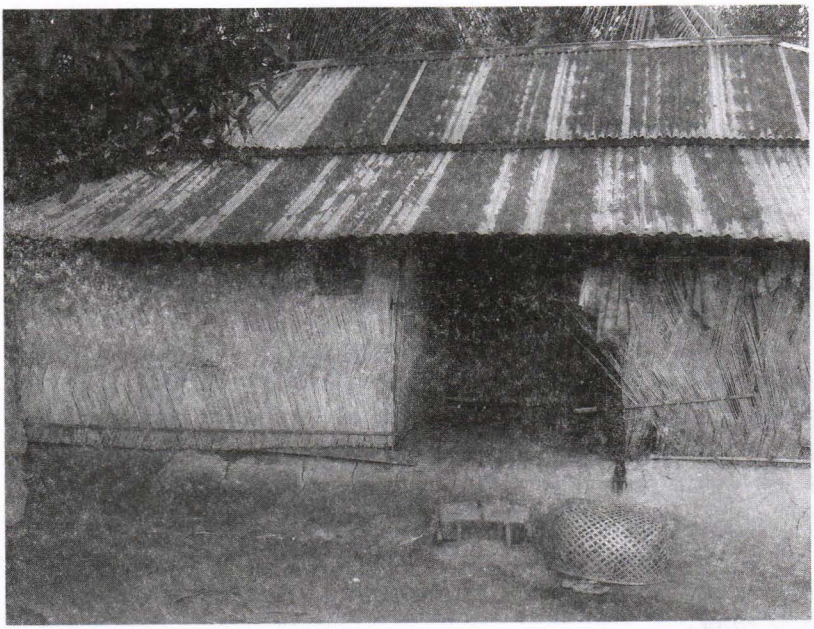

বাংলা ঘর

www.pathagar.com

লোকসংগীত

নৈমিত্তিক জীবনের আচার-আচরণ, খাদ্য-পোশাক, সামাজিক জীবনযাপন, বিবাহ কিংবা সাংস্কৃতিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সাযুজ্য লক্ষণীয়। পলল সমৃদ্ধ পল্লি প্রকৃতির নৈসর্গিক রূপ মাধুর্যে মানুষ এমনিতেই সুরের প্রতি আকৃষ্ট উদার ও নরম মনের। এজন্য সংগীত এ অঞ্চলের মানুষের লোকবিনোদনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। সারা বছরই অঞ্চলের মানুষগুলির মাঝে কোনো না কোনো গান লেগেই থাকে। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে জারিগান, কবিগান ও পদাবলি কীর্তন গান যথেষ্ট জনপ্রিয়। এছাড়া পল্লিগীতি এবং ভাটিয়ালি গানসহ মাঝে মধ্যে ধুয়োগান, বারাসিয়া গান ও গাজির গান কোথায়ও কোথায়ও অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। অতীতে এ জেলায় যাত্রাগানের দল থাকলেও বর্তমান সময় যাত্রাগান মোটেও দেখা যায় না। তবে যাত্রাগানের প্রতি এক শ্রেণির মানুষের ভালোলাগা ঝোঁক এখনও লক্ষ করা যায়।

পল্লিগীতি ও ভাটিয়ালি গান সারা বছর মাঠেঘাটে কিংবা রাস্তার চলমান পথিকের কণ্ঠে গুন গুন সুর কিংবা দরাজকণ্ঠের উচ্চকিত সুরে গীত হয়। এজন্য বিশেষ কোনো লগ্ন, সময় কিংবা আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না। দুঃখ ভুলতে কিংবা সুখের প্রকাশে পথচারী আপন মনে গেয়ে যায় ভাটিয়ালি কিংবা পল্লিগীতি গান। এ সকল গানকে সাধারণত প্রকৃতি, প্রেম কিংবা সৃষ্টিতত্ত্বসহ হামদ ও নাত-এ রাসুল শ্রেণির বলে ধরে নেয়া যায়। এলাকায় বিজয় সরকারের ভাটিয়ালি, মোসলেম বয়াতির ধুয়ো, কিবরিয়া বয়াতির নাত-এ রাসুল, রওশন বয়াতির বিচ্ছেদ বহুল প্রচলিত দেখা যায়। পথচারীদের গাওয়া ৯৫ শতাংশ গানই উল্লিখিত লোক কবিদের লেখা ও সুরারোপিত। ৫ শতাংশ লোকগান সংগৃহীত কিংবা দেশে বহুল প্রচলিত সংগীতের মধ্য হতে বেছে নেওয়া । এলাকার হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে রামায়ণ গান যথেষ্ট পরিমাণ গীত হয়। এলাকার রামায়ণ গানের সার্থক শিল্পী ছিলেন কবিয়াল বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী। তাঁর রামায়ণ গান হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষ শ্রেণির মানুষ শ্রবণ করতো, উপভোগ করতো এবং অনেককে বিমুগ্ধ আবেগে আপ্লুত হতে দেখা গেছে। ধর্মীয় প্রভাবে রামায়ণ গান এখনও গীত হয় তবে ভালো শিল্পীর অভাব দেখা যায়। এলাকার সিংগাশোলপুর ইউনিয়নের শোলপুর গ্রামের অমিয়কান্তি বিশ্বাস শখের বশে মাঝে মধ্যে রামায়ণ গান করেন । নিম্নে লোকসংগীতের নাম, ফর্ম, গায়নগীতি ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো।

১. সারিগান

সারিগান মূলত এক ধরনের কর্মসংগীত। লোকসংগীতের ধারাই সারিগানের উৎস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। ছাদ পেটানোর সময়, নৌকাবাইচের প্রতিযোগিতায়, ক্ষেতে কাজ করার সময় বা ধান ভানার ক্ষেত্রে সারিগান গাওয়া হয়।

www.pathagar.com

রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ পৈলো,
গাও তোলোরে ও ভাই লক্ষ্মণ রাম কেঁন্দে মলো॥

ওই ওরে-পিতৃসত্য পালন করতে- আমি এলাম বন
সঙ্গে এলো সীতাসতী অনুজ ভাই লক্ষ্মণ॥
বনবাসে এলাম আমি দেশে মলো পিতা,
পঞ্চবটি বনে এসে হারা হইলাম সীতা,
সীতা গেলে সীতা পাবো প্রতি ঘরে ঘরে,
প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ হারালে, ভাই বলিবো কারে॥
গাও-তোলো গাও-তোলো লক্ষ্মণ চলো দেশে নাই,
এ সংসারে মিলবে নারে তোমার মতো ভাই॥
রচনা : স্বভাব কবি বিপিন সরকার
বাহিরডাঙ্গা, পৌরসভা, নড়াইল।[১]

কালিয়া উপজেলার সারিগান

কালিয়া উপজেলার তথা নড়াইল জেলার লোকসংস্কৃতিতে সারিগান একটি অন্যতম সংযোজন। জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে পরিবেশিত এ গান শ্রমসংগীত (work song) হিসেবে গণ্য হলেও এ গানের সংজ্ঞা নিয়ে লোক-বিজ্ঞানীদের মধ্যে আছে মত পার্থক্য। মুহম্মদ আব্দুল হাই নদীনালার সঙ্গে সম্পৃক্ত এ গানকে 'action song' বলে উল্লেখ করেছেন।[২] 'সারি' শব্দের অর্থ শ্রেণি বা পঙ্‌ক্তি।[৩] ওয়াকিল আহম্মদ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করেছেন সৃ + নিচ অর্থাৎ গমন করানো। দাঁড় বেয়ে নৌকাকে এগিয়ে নেয়া।[৪] চর্যাপদে 'সারি' শব্দটি 'বীণার ছড়' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে (১৪৯৪) সারিগানের উল্লেখ আছে। আর শ্যামচাঁদ গুপ্তের (১৭৭৪-১৮৫৪) রচনা সংগ্রহ করে রামপ্রাণ গুপ্ত সারিগান নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে এ গানের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়েছিল বোধ করি, মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর-এর আমল থেকে।[৫]

কর্মরত অবস্থায় সমবেতভাবে পরিবেশিত সারিগানে সাধারণত আধ্যাত্মিক, বীরত্বব্যঞ্জক, হালকা প্রেমমূলক বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়। এছাড়া, সমাজ স্বীকৃত ও সমাজ বহির্ভূত প্রেমও সারিগানের বিষয়বস্তু হতে পারে।[৬] নদীমাতৃক গান হিসেবে শ্রেণিভেদ সত্ত্বেও ভাটিয়ালি গানের সঙ্গে যেমন সারিগানের মিল আছে, তেমনি শ্রমসংগীত হিসেবে বর্ষাকালে কলসের ওপরে বসে ধানের ছড়া কাটবার সময় কিংবা ধান লাগানোর মৌসুমে ধান ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করার সময় পরিবেশিত বারাসিয়া গানের সঙ্গে এ গানের মিল আছে। একইভাবে মিল খুঁজে পাওয়া যায় ছাদ পেটানোর সময় সারিবদ্ধভাবে পরিবেশিত বারাসিয়া গানের সঙ্গে। নড়াইল জেলায় প্রচলিত সারিগানের এমন আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যে, সারিগান ও বারাসিয়া গান আলাদা করে চেনা যায়। আমরা তবুও আলাদা করে সংগৃহীত সারিগানের নমুনা প্রদান করছি।

১
তেত্রিশ কোটি দেবদেবীগণ বাজির নৌকায় এলো রে
হারে তোমরা জয়ধ্বনি দাও সবাই॥

www.pathagar.com

ওরে বিশ্বকর্মা নাও গড়ালো দিবারাত্রি জেগে
মহেশ্বরের বরে নৌকা চলে পবন বেগে রে
ওরে আগা নৌকায় খাণ্ডা হাতে দাঁড়ালো মা কালী
ব্রহ্মা বিষ্ণু মধ্য নৌকায় শিব ঠাকুর রয় হালি রে॥
ওরে বাইছে যারা নৌকায় তারা বৈঠা নিল করে
স্বর্গ হতে দেবগণে পুষ্প বৃষ্টি করে রে॥
জয়গুরু বলিয়া বৈঠা যখনে টান দিলো,
মকর বাহিনী গঙ্গা তখন ভাসিয়া উঠিলো রে॥
অসীম বলে যুবক ভাইরা তোমাদের জানাই
তোমরা কিন্তু দেশের সম্পদ মনে রেখো ভাই রে॥

২

জয় বাংলা বলিয়া আমরা গেয়ে যাব দেশের গান
হারে আমরা বাংলা মায়েরই সন্তান॥
ওরে বাংলাদেশের নদী করে সাগরের সন্ধান
হাল ধরে পাল তুলে মাঝি গাহে সারিগান রে॥
ওরে বাংলাদেশের মাঠেঘাটে ফলে সোনার ধান
আমাদেরই খাটনির ফসল, বিশ্বপতির দান রে॥
ওরে বিশ্বকবি সোনার বাংলা রেখেছিলো নাম
কবি নজরুল গেয়ে গেলো বাংলার জয়গান রে॥
হিন্দু মুসলিম- বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান এক মায়ের সন্তান
বাংলা মায়ের গুণে মোদের নাইকো অভিমান রে॥
অসীম বলে বাংলা মায়ের চরণে জানাই
চির নির্বাণ হলে মাগো বক্ষে দিও ঠাঁই রে॥

৩

মনের আগুন জ্বলে দ্বিগুণ কেমনে জ্বালা জুড়াই
এসো আমরা সবাই মিলে সারিগান গাই রে॥
হিংসা, নিন্দা, মান, অভিমান করে সমজ্ঞান
সবাই মিলে গেয়ে যাবো মধুর সারিগান রে॥
একত্মবোধ থাকে যেন সারা জীবন ভরে
কোনো শক্তি ভয় করবো না বিশ্ব চরাচরে রে॥
হিংসা নিন্দা ছেড়ে দিয়ে অমর হয়ে থাকো
দীনবন্ধু বলে শেষে জীবন ভরে ডাকো রে॥
অসীম বলে দীনবন্ধু তোমাকে জানাই
শেষের দিনে যেন তোমার অভয় চরণ পাই রে॥

লোহাগড়া উপজেলার সারিগান

কর্মরত অবস্থায় সমবেতভাবে গেয় এক বিশেষ লোকসংগীতের নাম সারিগান। 'সরি' কথাটির মানে শ্রেণি। যখন কোনো শ্রেণির লোক একটি কর্মে রত হয়ে কর্মের সঙ্গে

www.pathagar.com

সঙ্গে গান করে থাকেন, সেই গান হলো সারি গান। সারিগানের পদগুলি এক ধরনের। সাধারণত চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার ছন্দ। একজন পদগুলি গাইবে, পিছনে অন্যদল গোড়ার দুটি লাইন গাইবে।

এর সুর টানাটানা ও চড়া এবং খুব জমাট। নৌকা চালানোর সময়, ছাদ পেটানোর সময়, ধান বা পাট কাটার সময় সমবেত কণ্ঠে যে গান গাওয়া হয় তাকে সারি গান বলা হয়। সারি গানের সাথে শারীরিক শ্রমজনিত কোনো কাজের যোগ থাকে। নদীমাতৃক নড়াইলে মাঝিমাল্লারা এই গান বেশি গেয়ে থাকে। এই গান সাধারণত নৌকাবাইচ, শব্দ তানের পর নৃত্য সহকারে গেয়ে থাকে। দিঘলিয়া ইউনিয়নের আকরাবাড়ি গ্রামের সন্তোষ বিশ্বাসের সারিগানের দল রয়েছে। আশ্বিন মাসে বিলে কাজ করার সময়, দুর্গাপূজায় এবং বড়দিয়ার নবগঙ্গা ও নড়াইলের চিত্রা নদীতে নৌকাবাইচের সময় সারিগান গেয়ে থাকে।

সোনার কমল ভাসিয়ে কেরে জলেতে দিলো
আমার মা বুঝি কৈলাসে চলিলো
ঐ ওরে কালী ঘাটের কালী মাগো, কৈলাসে ভবানী,
বৃন্দাবনে রাধে তুমি গোকুলে গোপিনী
যাত্রা কালে সঙ্গে আমার এসেছিলো গুণের ভাই,
ওরে লক্ষ্মণ গা তোলো দেশে যাই॥
বনে মলো বনরাজি, দেশে মলো পিতা
গুণের ভাই ছেড়ে হারা হলাম সীতা।
ওরে লক্ষ্মণ গা তোলো দেশে যাই॥
সীতা গেলে সীতা পাব প্রতি ঘরে ঘরে
গুণের ভাই লক্ষ্মণ হারালে ভাই বলিবো কারে।

ওরে লক্ষ্মণ গা তোলো দেশে যাই॥
যে কালেতে আইলাম বনে, সীতা ছিলো ছোটো
দিনে দিনে বাড়ে সীতা বাকল হলো খাটো।
ওরে লক্ষ্মণ গা তোলো দেশে যাই॥[৭]

অর্থ : মলো-মারা গেল, আইলাম-এসেছিলাম, বাকল-এখানে পরিধানের বস্ত্র বোঝাচ্ছে।

২. মেয়েলি গীত

গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজব্যবস্থায় নানান ধরনের আচার অনুষ্ঠান রয়েছে। সেসব আচার অনুষ্ঠানে কেবল মেয়েরাই দল বেঁধে গান গেয়ে থাকেন। আর এ গানগুলি মূলত মেয়েলি গীত হিসেবে পরিচিত। মেয়েলি গীত পরম্পরাগতভাবে পরিবেশিত হয়ে আসছে। তবে বিয়ের গীত মেয়েলি গীতের মধ্যে অন্যতম।

সদর উপজেলার মেয়েলি গীত

উড়ে যায় রে পক্ষ রে – পড়ে গাছের ডালে রে,

www.pathagar.com

হারে পক্ষ, কওদি আমার দুঃখিনী মার খবর – কিনা রে
পক্ষ কয় হে কুলের বউ
তোর মার খবর নেয় না কেউ
কি কবো তোর দুঃখিনী মার কথা - কিনা রে॥
তোমার মাধোন না নয় ত্যাল
তোমার মাধোন না খায় ভাত
ওরে হারে, তোমার জন্যে কাঁন্দে রাস্তার
পাগোল– কিনা রে॥

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে রে–পথের কাঁদা নথে রে
চলো না চলো না আমার বাপের দেশে – কি নারে॥
তোমার বাপের দেশে রে–চোর ও ডাকাত আছে রে
কাইড়া নেবে আমার হাতের ঘড়ি – কি নারে॥
আমার বাপের দেশে রে–চেয়ারম্যান মাতব্বর আছে রে
আনে দেবে তোমার হাতের ঘড়ি – কি নারে।[৮]

ওপার দিয়ে যায় ওরে সাধের কুমার
এপার চাঁন্দের বাজার – কি নারে
সেই না বাজারে কিনবা হারে–কুমার যাবে নিয়া রে,
ছুরমান বিবি কিনবা নাকের ব্যাশোর রে॥
ঐনা বাজারে যাইয়া রে–সাধের কুমার দেবে কিনে রে
সেই বাজারে কিনবা
ছুরমান বিবি কিনবা গলার হার ওরে॥
ঐনা বাজারে যাইয়া রে–সাধের কুমার সাথে নিয়া রে
সেই বাজারে কিনবা ছুরমান বিবি কিনবা ঢাকাই শাড়ি রে॥
ঐনা বাজারে যাইয়ারে–কিনবা কোমরের বিছা রে
পায়ের মল কিনিও ছুরমান বিবি কিনবা আলতা সাবান রে॥[৯]
গাঙের ঐনা কুলেতে জোড় কদমের গাছ ওরে
তারই ডালে বাইনছে বাসা দারুণ কোকিল রে॥
পানি আনতে গাঙে যাই- ঐ পাখির গান শুনতে পাই
বহুদিনের চেনাসুরি গাইছে কোকিল রে॥
ঐ পাখি কেউ ধরে না- ঐ পাখি কেউ মারে না
ও যে আমার বাপও ভাইয়ের পোষা পাখি রে॥
ঐ পাখি গান গাইয়ে যায়- মা জননীর কথা কয়,
বাপও ভাইয়ের খবর কইছে দারুণ কোকিল রে॥
আমার মাধোন কাঁন্দে যায়- আমার দেখতি মনে চায়
আমার বাবায় নিয়ে যাবে আমায় নাওরে॥[১০]

www.pathagar.com

কালিয়া উপজেলার মেয়েলি গীত বা বিয়ের গান

মেয়েলি গান বা বিয়ের গান বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের একটি অনিবার্য প্রসঙ্গ। গ্রামীণ মহিলারা সমবেতভাবে বসে মেয়েলি ভাষায় কখনো পণের টাকা প্রসঙ্গে, কখনো বহু দূরে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে, কখনো বিয়ের যাবতীয় উপকরণকে কেন্দ্র করে, এরকম বহু বিষয়কে নিয়ে গান পরিবেশন করেন। আর যে মেয়েটির বিয়ে সে মেয়েটির মা ঐদিন উপোস থাকেন। বিয়ের পরে তিনি একটু ডাবের পানি খান। সে ডাবটিও কেটে পরিষ্কার করে রাখা হয়। একটি মেয়ের বিবাহের কারণে তার মা-বাবার মনে যে কষ্টের আগুন জ্বলে উঠে তা থেকে তাৎক্ষণিক উপশম দেয়ার উদ্দেশ্য থেকে এ গানগুলোর পরিবেশনা।

১

কাইয়ো (কাক) ডাকে কা কা করে পেঁচো ডাকে ডালে রে
সাধু গা তোলো গা তোলো
গা তোলে মোর গুণের সাধু চলো যাই মোর দেশে রে
কোন্ বা হলুদের হলুদ কিনে সাধু আমায় করছো বিয়া।
সেওনা হলুদ বসে রইছে তোমার মাধনের লাইগা॥
কাইয়ো ডাকে কা কা করে পেঁচো ডাকে ডালে রে
ওঠো মোর গুণের সাধু চলো যাই মোর দেশেরে।
কোন্ বা কাপুড়ের কাপুড় আইনা সাধু আমায় করছো বিয়া
সেওনা তাঁতিকার বসে রইছে সাধু তোমার
চাচিজানের লাইগা॥

২

নয়া গাঙের নয়া মাঝি ফেরে বাঁকে বাঁকে
মাঝির হাতের সোনার বৈঠা আমায় করো পার।
দিনতো গেলো সন্ধ্যা হলো মাঝি পারঘাটায় বসিয়া
আমার হাতের সোনার আংটি মাঝি তোমায় করবো দান।
নয়া গাঙের নয়া মাঝি ফেরে বাঁকে বাঁকে...
আমার আছে রূপ যৌবন মাঝি তোমায় করবো দান।
নয়া গাঙের নয়া মাঝি ফেরে বাঁকে বাঁকে...
আমার আছে কাঁচা যৌবন মাঝি তোমায় করবো দান॥[১১]

৩

কাঁচা হলুদের যে না রং আমার দুলাভাইয়ের সেই না রং
রোদ্দুরে ঘামলো দুলাভাইয়ের মুখ ওরে॥
দুলাভাই যদি আম্মাজান হও আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দাও
দুলাভাই যদি খালাজান হও আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দাও
দুলাভাই যদি দিদিজান হও আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দাও
দুলাভাই যদি নানিজান হও গামছা দিয়ে মুছিয়ে দাও

www.pathagar.com

দুলাভাই যদি চাচিজান হও রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দাও
দুলাভাই যদি ফুপুজান হও আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দাও॥[১২]

লোহাগড়া উপজেলার মেয়েলি গীত

এখানকার বিয়ের গানগুলি গ্রামের সরল সরল মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতির অভিব্যক্তি। অন্তঃপুরে নারী কণ্ঠে আজও বিচিত্র বিয়ের গীতের চল আছে।

লোহাগড়া, মল্লিকপুর, নলদী, কাশিপুর, নওয়াগ্রাম, কোটাকোল, শালনগর, জয়পুর ইউনিয়নসহ, তেলকাড়া, বরগাতি, দিঘলিয়া, লুটিয়া, খালচর বিভিন্ন গ্রামে সীমিতভাবে হলেও বিয়ের গীতের প্রচলন রয়েছে। হিন্দু, মুসলমান সম্প্রদায়ের গান প্রায় একই ধরনের। বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিবাহ পর্বের প্রথম গায়ে হলুদ থেকে শেষ বিয়ের দিন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে এবং সময়ে উভয়ের বাড়িতে মেয়েলি গীত পরিবেশিত হয়। বিশেষভাবে ছেলে বা মেয়েকে গোসলের পূর্বে ধান, দূর্বা, সরিষার তেল, হলুদ, কাঁচা দুধ বরণ কুলোতে রেখে কপালে ছোঁয়ায় এবং নেচে নেচে বিয়ের গীত গায়। গোসলের পরে নতুন কাপড় পরিধান করে মিষ্টি ও সিন্নি মুখ করায়। সমাজ পরিবর্তনের ধারায় গ্রামীণ মানুষের জীবনে পরিবর্তনের ঢেউ লাগায় ঐতিহ্যবাহী এসব মেয়েলি গীত হারিয়ে যেতে বসেছে। বর্তমানে নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তদের মধ্যেই এই বিয়ের গীতের কিছুটা চল রয়েছে। তবে মধ্যবিত্তদের মধ্যে নেই তা নয়। ইতনা গ্রামের আকিরুননেছা (৬৫) এখনও নিজ গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে মেয়েলি গীত গেয়ে থাকেন। খাতনা, বিয়ের অনুষ্ঠানে তার ডাক পড়ে।[১৩]

বিয়ের গীত

১

আয় সরা বরণ কুলো
বকুল ফুলের মালা
ভগবতি বরে বরণ
আকাশে ওঠে তারা।
এতোদিনে ছিলিরে কুলো
ঋষির দোকানে
আজ কেন আইছ রে কুলো
রাম সীতার বরণে।
এতদিনে ছিলে সিঁদুর
মুদিরও দোকানে
আজ কেন আইছ রে সিঁদুর
রাম সীতার বরণে।
অর্থ : আইছরে-এসেছ।

২

রাম বসবে চতুর দুলায় সীতা বসবে বামে
অর্ধেক অঙ্গ ভিজল রামের সীতার নয়ন জলে।

www.pathagar.com

কিসের জন্নি কাঁন্দ সীতা বলো না আমারে
থুয়ে আইছি আমার মাধন সদা ওঠে মনে রামরে।
ঘরে আছে আমার মাধন সাধন বলো তারে
অর্থ : থুয়ে আইছি-রেখে এসেছি।[১৪]

৩ (মেয়ে পক্ষ)

নকল সোনার গয়না দিলি গয়না ভালো না,
কন্যারে তোর বরের কাছে যাইতে দেবো না।
বরের বাবা মিষ্টি আনলো মিষ্টি ভালো না,
কন্যারে তো বরের কাছে যাইতে দেবো না।

৪

নন্দুলাতে কিসের জয় জয় শুনি
নন্দরানি দেচ্ছে বুঝি কৃষ্ণের মুখে ননি।
তোমরা তো সব পুড়ো রোজো মণি
ভালো হলো আজ্ঞে আমরা নিল মণি।
নন্দুলাতে কিসের জয় জয় শুনি
নন্দরানি দেচ্ছে বুঝি কৃষ্ণের মুখে ননি।
তোমরা তো সব পুড়ো রোজো মনি
ভালো শাড়ি আনছি আমরা সেজবে নিল মণি॥

৫ (ছেলে পক্ষ)

কৃষ্ণ কালো কোকিল কালো
কালায় কালায় মিলন হলে রামের বর্ণ ভালো।
মালা রে তোর জন্ম কোন্ খানে
আমার জন্ম শুনতে পাবি মালীরও দোকানে।
মালা রে তুই লাগবি কোন্ কাজে
রাজার ছেলের বিয়ে হবে লাগবে তার মস্তকে।
মালা থোওগো ঘরে।
কৃষ্ণ কালো কোকিল কালো
কালায় কালায় মিলন হলে রামের বর্ণ ভালো।
মোটুক রে তোর জন্ম কোন্ খানে
আমার জন্ম শুনতে পাবি ফুলেরও দোকানে।
মোটুক রে তুই লাগবি কোন্ কাজে
রাজার ছেলের বিয়ে হবে লাগবে তার মস্তকে।
মোটুক থোও গো ঘরে।
কৃষ্ণ কালো কোকিল কালো
কালায় কালায় মিলন হলে রামের বর্ণ ভালো।
পাঞ্জাবি রে তোর জন্ম কোন্ খানে
আমার জন্ম শুনতে পাবি কাপড়ের দোকানে।

www.pathagar.com

পাঞ্জাবি রে তুই লাগবি কোন্ কাজে
রাজার ছেলের বিয়ে হবে লাগবে তার গায়ে।

পাঞ্জাবি থোওগো ঘরে॥
অর্থ : থোওগো-রাখো, মোটুক-মাথার মুকুট।[১৫]

৬

উসতে লাগালাম সারি না সারি
লতাপাতায় ঘিরলাম বাড়িরে
আমার, কোমরে কোমরে গুগরি বাজে রে॥
সেই না গুগরির বাজন শুনে
মিয়া ভাইজানের শালী পাগল রে॥
সেই না উসতে বাজারে বেচে
কিনলাম একহান ফিতে রে॥
সেই না ফিতে দিতি যাইয়ে খালাম ভাবির হাতের কান মলারে।
অর্থ : উসতে-উচ্ছে, গুগরি-গুঙুর, একহান-একটি।[১৬]

৭

আয় সরা বরণ কুলো বকুল ফুলের মালা
ভগবতী বরে বরণ আবে ছোটে তারা।
ওকি নারে
কাল ছিলি রে দুবলো রাস্তার দুই ধারে
আজ তুমি আইছ রে দুবলো লিজারও বরণে।
কাল ছিলি রে হলুদ আগানে বাগানে
আজ তুমি আইছ রে হলুদ লিজারও বরণে।
কাল তুমি ছিলি রে সাজের হাঁড়ি পালের ঐ দোকানে
আজ তুমি আইছ রে সাজের হাঁড়ি লিজারও বরণে।
কাল তুমি ছিলি রে প্রদীপ অন্ধকারে পড়ে
আজ তুমি জ্বলে উঠলে লিজারও বরণে।
ওকি নারে

অর্থ : আবে-আকাশে, দুবলো-ঘাস, আইছরে-এসেছ, আগানে বাগানে-যেখানে সেখানে।

৮

গাংগেরও কূলে কাঁচা হলুদের গাছ ওরে
খরাতে করে ঝিকিমিকি
ওকি আহারে মেঘেতে করে টলমল॥
গোসল কি গোসল ভালো করে
ওকি আহারে গোসল কি গোসল ভালো করে।
কোথায় যে আছ মা জননী বসে রে

www.pathagar.com

আইসে যে দ্যাখা দ্যাও রে
তোমারও মেয়ের মুখে।
হলুদ কি হলুদ ভালো দ্যাও রে
ওকি আহারে গোসল কি গোসল ভালো করে।
কোথায় যে আছ দাদি জান তুই বসে রে
আইসে যে এখানে দেখা দ্যাও রে।
তোমারও নাতিরে বরণ কি বরণ ভালো করে॥
অর্থ : গাংগেরও-নদী, আইসে-এসে।[১৭]

৯ (ছেলে পক্ষ)

আশি মনের হলুদের গুড়ো,
আরো বরণ কুলো নাড়ে
ছেলে মানুষ করিছি আমি
পালকির দরজা খুলিয়া দ্যাখ,
বউমা বুঝি কালো নারে।

১০ (মেয়ে পক্ষ)

আশি মনের হলুদের গুড়ো,
আরো বরণ কুলো নাড়ে
মেয়ে মানুষ করিছি আমি
পালকির দরজা খুলয়া দ্যাখ,
জামাই বুঝি কালো নারে।

১১ (বাচ্চাদের খাতনা দেওয়ার পর গোসলের গীত)

তেলে হলুদ মাখে রে নীল কুমার
যাইও সিড়ি ঘাটে রে
হলুদ বালো মাকে রে নীল কুমার।
গোসল বালো করে রে
গোসল বালো করে রে নীল কুমার।
সাবান বালো মাকে রে নীল কুমার।
লুঙ্গি বালো পরে রে
সিঁড়ি ঘাটে যাইয়ে রে নীল কুমার।
ক্ষীর বালো খায় রে নীল কুমার।

অর্থ : মাকে-মাখে, নীল কুমার-একজনের নাম, বালো-ভালো, ঘাটে-পুকুর বা নদীতে গোসল করার জায়গা।[১৮]

১২

রাস্তা দিয়ে আয়ে যায় ঝিলমিল ঝিলমিল চাদর গায়,
যায় রে আয়ে ইসলাম মণ্ডলের বাড়ি যায়।
অত কথা আমি শুনবো না পঞ্চাশ টাকা ভাঙ্গিবো,

www.pathagar.com

এই না ঘড়ি কিনিবো আমি মিলন করিবো।
ইসলাম সওদাগরের হাতে ঘড়ি নাড়ে।
অর্থ : আয়ে-মেয়ে, কিনিব---কিনবো ।[১৯]

লোহাগড়া উপজেলার মেয়েলি গীত

১

রাম বসবে চতুর দুলায়
সীতা বসবে বামে
অর্ধেক অঙ্গ ভিজলো রামের
সীতার নয়ন জলে।
কিসের জন্নি কাঁন্দ সীতা
বলো না আমারে
থুয়ে আইছি আমার মাধন সদা
ওঠে মনে রামরে।
ঘরে আছে আমার মাধন সাধন
বলো তারে॥
অর্থ : থুয়ে আইছি-রেখে এসেছি।[২০]

২

ভ্যাদা মাচে কোচ ভাংগচে
আগে না জানতাম
গলায় বাদায় বশশির কালা
ছিপ দরিয়া মারে টান॥
সাজতি কুচতি ভালোপাসি
গয়না পালি হই যে খুশি
মিনষে আমার মলঠের রাজা
দিলো নারে ঠিকলিহান॥
মিষ্টি মিষ্টি কতা দিয়ে
প্রেম অরতো সে আমায় নিয়ে
কতো সতো রসের কতা
আমি নাকি তার পরানহান॥
কাজ যদি সারা হয়
বাড়োই তহন কিচুই নয়
নানির কতা পড়তিছে মনে
কিনে দিতি চায় না পান॥[২১]

অর্থ : দরিয়া-ধরে, ভ্যাদামাছ-রয়নামাছ, বশশির কালা-বড়শির কাঁটা, মিনষে-স্বামী, মলঠে-কৃপণ, রসের কথা-মিষ্টি কথা,বাড়োই-যারা করাত দিয়ে গাছ চেরাই করে, ছিপ-যে কাঠ দিয়ে বড়শির সুতা বাঁধা হয়, অরতো-করতো, তহন-তখন, কিচুই-কিছুই।

www.pathagar.com

৩. বাউল গান

বাউল সংগীত অমৃত প্রেমসংগীত হিসেবে চিহ্নিত। নড়াইল জেলায় বাউল সংগীতের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। কারণ এখানকার শ্যামল প্রকৃতি, আঁকাবাঁকা ক্ষীণস্রোতবাহী নদীর বয়ে যাওয়া, ছায়াঘেরা বনবীথি শিল্পীকে বাউল হবার প্রেরণা যোগায়। এ অঞ্চলে বাউল গানের আলাদা ঘরানা গড়ে ওঠেনি। ২-৪ জন আধুনিক শিল্পী মাঝে মধ্যে বাউল গান পরিবেশন করে থাকেন। তাছাড়া এখানে জারিগানের বয়াতি ও কবিগানের সরকার পালাগানের প্রয়োজনে দুই একটি বাউলগান অনুষঙ্গ গীত হিসেবে পরিবেশন করে থাকেন।[২২]

গায়নরীতি

১. পোশাক : বাউল গায়ক সাধারণত এক রঙের পোশাক আর মাথায় পাগড়ি বেঁধে গান পরিবেশন করেন। ২. অঙ্গভঙ্গি : এ গানে নাচ একটি আবশ্যকীয় উপাদান। হেলে দুলে নাচের ভঙ্গিতে বাউল গান পরিবেশন করা হয়। ৩. সহযোগী শিল্পী : বাউল গানে ২-৪ জন সহযোগী শিল্পী থাকে। তারা গান পরিবেশনায় উৎসাহিত করে এবং নাচের তালে তালে অংশ নেয়। ৪. ব্যবহৃত যন্ত্র : প্রাচীন বাউল গানে কেবল একতারা ব্যবহৃত হতো। কিন্তু বর্তমানে একতারা, দোতারা, আড় বাঁশি, তবলা, সারিন্দি, খুঞ্জরি, খোমক, হারমোনিয়াম বাউল গানের অন্যতম যন্ত্র।[২৩]

১

আমার অমানিশা মনে তোমার প্রেমের পরশ দিও
যত দূরে থাকি দয়াল সাথী করে নিও॥
সময় অসময়ে তুমি পারে ডেকে নিও॥ঐ
কুল মাখলুকাত, তুমি আবহায়াত, তুমি সকলের দাতা
তোমার সৃষ্টি, যা করি দৃষ্টি, তুমি সবারই শ্রোতা
দয়াল তোমার নামে যে নাম গাঁথা, তারে চিনতে দিও॥
তুমি দয়ার ভাণ্ডার, বিশ্বের মাঝার, আমি কাঙ্গাল অভাগা
কুকর্ম-সুকর্ম জেনে তাই সে কর্মে মন লাগা
আমার পাপে ভরা মন বিহগা, তাই মোরে ক্ষমিও॥
যেমন পঙ্গুলে লঙ্ঘিছে গিরি তোমারই রহমতে
বিনা আঁখি পায়সে সাথী অচেনা চলার পথে
মোবারক কয় আঁধার রাতে, তব নুরের পরশ দিও॥ ঐ

নাত-এ-রাসুল

সে নুর জাতে তাই ছিপাতে পাক নুরী সাঈ জাল্লেশান
গুপ্ত ছিলো ব্যক্ত হলো তাই এলো পাক - পাঞ্জাতন॥
৫৭০ শেষে- রবিউল আওয়াল মাসে
১২ই সোমবার নিশির শেষে, আরবে উদয় তপন।
তার আগমনে এই ভুবনে অন্ধকার হয় নুর রওশন॥ ঐ

www.pathagar.com

হুর গেলেমান, জানায় সালাম- ফেরেস্তারা পড়ছে কালাম
তাঁর প্রেমেতে সারা আলম- দোলায় দুলছে ফুলবন।
যত জীন এনছান আর পির পয়গম্বর- তাঁর প্রেমে ঝরায় নয়ন॥
তাঁর প্রেমেতে মক্কাবাসী- ঘর ছেড়ে কেউ হয় উদাসী
আকাশ হতে চন্দ্র আসি– তাঁর পাক হাতে করে চুম্বন।
সেদিন নদনদী আর বন-উপবন - ফলে জ্বলে সু-শোভন॥
বনের পশু চিনলো যাঁরে- সেই মানুষ জাবেরের ঘরে
মরা পুত্র যাঁর ফুৎকারে- দুজনে পেলো জীবন।
মোবারেক না চিনে তারে- দিনে দিনে হয় পতন॥

২

আমি যে তোমার পাপী গোনাগার–ক্ষম হে দয়াল অপরাধ আমার
তুমি রহিম রহমান, তুমি আল্লাহ মেহেরবান
ছোবাহান সুলতান, তুমি করুণা ভাণ্ডার॥
কুল মাখলুকাত তোমার সৃষ্টিরই কৌশল
শোভা বর্ধন করে এই ভূ-নভোমণ্ডল
তোমার রবিশশীদ্বয়- যেন বিজলি চমকায়
অপরূপ মনোমুগ্ধময়- লীলা চমৎকার॥ ঐ
সৃষ্টিরও স্রষ্টা তুমি সর্বশক্তিমান
সাক্ষ্য বহন করিছে তাই পবিত্র কোরআন
তোমার নাইকো তুলনা- ওগো মালিক রব্বানা,
করতে সাধনা- শক্তি দাও পরোয়ার দেগার॥ ঐ
পাহাড়সম অপরাধ করেছি জীবনে
সৌপর্দ করিলাম ঐ রাতুল চরণে
আমি তোমার চরণদাস- রেখ তোমার চরণ পাশ
প্রেম ভক্তি বিশ্বাস- শুধু সম্বল যে আমার॥ ঐ
আমার বলতে নাহি কিছু সব যে তোমারি
তবদ্বারে দাঁড়ায়ে করুণার ভিখারি।
ওগো বন্ধু দয়াময়- তোমার সাইফুল ক্ষমা চায়
আমার মুর্শিদের উসিলায়- কর বিপদ উদ্ধার॥ ঐ
ভালোবাসার কেমন জ্বালা সখী আগে বুঝিনি
তার বিরহ অনলে পুড়ে মরি দিবা যামিনি॥
প্রথম যেদিন হল দেখা শিমুল তলি গাঁয়
চোখাচোখি হল দু'জন মিলন পিয়াসায়
আমার মনঃপ্রাণ হরণ করে নেয়- ঐ বাঁকা চোখের চাহনি॥ঐ
কিবা ছিলাম কিবা হলাম বসে ভাবি তাই
নিশি ঘুমঘোরে যেন ঐ মুখ দেখতে পাই
সে বিনে আর কিছুনা চাই- সে প্রত্যাশার দিন গুনি॥ ঐ
কি দিয়ে কি হরে নিল ভাবি সর্বক্ষণ

www.pathagar.com

তার মায়াজালে জড়াইলো আমার অবুঝমন
তার স্বজল যুগোল নয়ন- যেন তৃষিত চাতকিনি॥ ঐ
না পাওয়ার কি বেদন কত নিদারুণ
দিবানিশি বুকের মাঝে জ্বলে সে আগুন,
সাইফুলের এই পোড়া জীবন- যেন শায়খ
বেধা হরিণী॥ ঐ[২৪]

৩

রসিক হয়ে রসের ভজন কর সদায়
রসে যদি আকার পড়ে- রসে বলে তার অর্থ হয়॥
নিভাইয়ে মদন জ্বালা- কামের ঘরে দিয়ে তালা
কর না সদায় রসের খেলা- লয়ে প্রকৃতির আশ্রয়
নয়ন বানে নিরিখ রেখে- অতীব সাবধানে থেকে
বিবিধ মসল্যা মেখে- পান করব রস সব সময়॥ ঐ

নব রসের উদ্দীপনা- দেহ হবে কাঁচা সোনা
কেটে যাবে পঁচা নোনা- মদনের আর কিবা ভয়
মহা কামের আকর্ষণে- রসরতি চলবে উজানে
আরাম পাবি এই ভজনে- নিষ্কাম প্রেম রতির খেলায়॥ ঐ

ভবে যত রসিক সুজন- জানে তারা রসের ওজন
অষ্টশক্তি বানের ভজন- করে তারা সিদ্ধ হয়
হবে বামমদনের ভালোবাসা- রূপের ঘরে বাঁধবি বাসা
পরকিয়া রূপের নেশা- থাকবি সুদিনের দশায়॥ ঐ

বাহ্যেন্দ্রিয় অন্তর মুখী- কৃষ্ণ সুখে হবি সুখি
রস হবে রে শতমুখী- প্রেম বানে ভুবন ভাসায়
বিনোদ কেবল লোভে মেতে- ক্ষণ কামানন্দ পেতে
কাম-কামনা যেতে শুতে- লাভের ধন তার পিঁপড়ায় খায়॥ ঐ

হ্লাদিনির বশ এই শৃঙ্গার রস- আনন্দাংশে প্রকাশ পায়
মধুর রসে মাখা শৃঙ্গার, রসিকে তা জানতে পায়॥
বান আর গুণ পুরুষ প্রকৃতি- মধুর রসে সে আস্বাদ রয়
ভাবে শৃঙ্গার নিতি নিতি- মধুর রসে সে আস্বাদ রয়।
বান থেকে সম্ভোগ শরীরে- প্রকৃত রস পান করে
গুণ যে বিপ্রলব্ধা ঘরে- অপ্রাকৃত শৃঙ্গার সাধয়॥ ঐ

পঞ্চবান পুরুষ প্রভাব- গুন মিশলে তার গোপী স্বভাব
বানে গুণে হইলে ভাব- শৃঙ্গার তারে কয়।
কিশোর কিশোরী দু'জন- শৃঙ্গার রসের মুরতি হন,

www.pathagar.com

সর্বোত্তম শৃঙ্গার সাধন- চণ্ডীদাস তার প্রমাণ দেয়॥
শৃঙ্গারে পঞ্চধাকরণ- পঞ্চবানে সাধ ও মন
রসরতি তোর হবে উজোন- রাগের ওজন সিদ্ধ হয়।
রাগের ওজন বলি তারে- থাকগে গিয়ে গোপন করে
স্বরূপেতে আরোপ সেরে- থাকবি রে যুগল সেবায়॥
৬৪রস রাগের কারণ- ২৭ ভেঙ্গে ৯ তে মিলন
তাই করবে ৩ নিপুণ- তবেই রাগের ভজন হয়
নিত্যবামে দিয়ে চিত্ত- পান কর রস অবিরত
বিনোদ কেবল গাধার মত- জলে নেমে জল ঘোলায়॥[২৫]

৪

স্বপনের প্রভাত আমার জীবনের খেলা,
আসা যাওয়া খালি হাতে পথে একেলা।
কে তুমি মিলালে এমন মধুর মেলা
তোমার জীবনে নেই বিরহ জ্বালা।
জানি না যে কি বাসনা মনেতে তোমার,
তোমার বিরহে পরান কাঁন্দে যে আমার
কাঁন্দাইয়ে আমারে তুমি গোপনে দেখ,
আমার কাঁন্দনে তুমি কি সুখে থাক।
তবু যদি মনে রাখ- ওগো একেলা
কেয়ামতে পথ আমার থাকে উজালা॥ ঐ
পাখি গায় পাখির গান আনন্দ মনে,
কেন গায় কেবা শোনে বসে গোপনে
ফুলবনে দেখি কত কুসুমের হাসি
কে যেন দেখেছে হাসি নিরালে বসি
কত ভালোবাসাবাসি গাঁথি হে মালা,
তোমার চরণে আমি কাননবালা॥
কলতানে নদী যায় সাগরের দিকে
ফিরিয়া না আসে যেন কাহারে দেখে
সাগর বুকেতে ওঠে ঢেউয়েরই উচ্ছ্বাস
বিরহী মোসলেমের এই দীর্ঘ নিশ্বাস
আমার আর প্রিয় গৃহবাস না সাজে একেলা
এসো তুমি আমি মিলে বাজাই একতালা॥

৫

বন্ধু আমার পীরিত বোঝে না
বন্ধু পরকে ভালোবাসে - থাকে পরবাসে– আমাকে দেখা দেয় না॥
একলা ছিলাম বাসর ঘরে- যেন নাম ধরে কে ডাকলো মোরে গো.
ডাক শুনিয়া হইলাম দেওয়ানা।
আমায় ডাক দিয়ে জাগাইয়ে- কোথা গেল পলাইয়ে, শূন্য হেরি বিছানা॥ ঐ

www.pathagar.com

চাতক রইলো মেঘের আসে- মেঘ বর্ষিলো অন্য দেশে-গো
চাতকিনির আশা মিটল না।
আমার মনে বড় অনুতাপ- দিব তারে অভিশাপ, ফিরে যেন আসে না॥ ঐ
তার নাইকো মাতা নাইকো পিতা, নাইকো তাহার ভগ্নি ভ্রাতা গো
একা থাকে একলা একজনা।
আমি মনে ভাবি তাই- সে ছাড়া মোর বান্ধন নাই, সমান আমরা দুইজনা॥ ঐ
আমি থাকি বন্ধুর ভাবে- কেহ ২ মনে ভাবে গো
মোসলেম একজন গানের মস্তানা।
ভাবি কেবা আমায় গাওয়ায় গান আমি কেন গাহি গান, আমি তাহা জানি না॥ ঐ

৬

স্বামী আমার পরানের পরান
স্বামী আমার দেলের বাতি – স্বামী মোর তছবি কোরান॥
স্বামী আমার গলার মালা–স্বামী আমার প্রেম পেয়ালা গো
স্বামী জানে প্রেমের জ্বালা- স্বামী মোর আসমানের চাঁন॥ ঐ
স্বামী আমার মাথার বেণি–স্বামী আমার চোখের মণি গো
আমি স্বামীর সোহাগিণী – নিয়েছে জাত কুলমান॥ ঐ
স্বামী আমার শঙ্খ চুড়ি–স্বামী আমার পরান শাড়ি গো
স্বামী আমার মনময়ূরী – স্বামী মুখের মিষ্টিপান॥ ঐ

স্বামী আমার নৌকার মাঝি–স্বামীর কথায় আমি রাজি গো
স্বামীর ভাবে মোসলেম মজি- নিরালে গায় স্বামীর গান॥ ঐ

৭

আমি অপরাধী- ওহে গুণনিধি- তুমি যে দরদি- বড়গো,
তোমার গুণের নেই সীমা–কর আমায় ক্ষমা- ক্ষমিলে ক্ষমিতে পারগো॥
আসিবার কালে সঙ্গে ছিলে তুমি–নইলে কি সাধে আসিয়াছি আমি,
আমায় ক্যানবা পাঠালে প্রপঞ্চ ভূমি- তুমি যে চক্রধর- গো॥ ঐ
তব শক্তি বলে জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে–রবিশশী তারা শূন্য পথে চলে
ষড়ঋতুর ফলে এ মহী মণ্ডলে–প্রকৃতি কি সুন্দর গো॥ ঐ
অযোনীসম্ভব তুমি আদিপুরুষ–যোনী ভেদে আমি পঞ্চ তৎপুরুষ
প্রাণীবর্গ সব ষষ্ঠী তৎপুরুষ–তুমি যে পুরুষেশ্বর গো॥ ঐ
তুমি ধরণির বুকে সুধারাশি ঢাল–পর্বত শিখরে সাগরের জল তোল
মোসলেম তোমার যে পথেতে চাল –চলিতে অগ্রসর গো॥ ঐ

৮

বেদনার বালুচরে, জীবনের খেলাঘরে–ব্যথা বাজে বিষাদের সুরে...
হায় মোর অতীতের স্মৃতি মনে করে॥
নীতি ভাবি যাবো ভুলি –অতীতের স্মৃতিগুলি–ক্লান্ত হৃদয় সহিবারে।ঐ
তৃষিত নয়নে চেয়ে মনের জানালা পাশে,

www.pathagar.com

জীবনের আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে অবশেষে–২
না পাওয়া বেদনাজলে- অনিবারে পলে পলে,
ধূসর এ মনোআঙ্গিনা ভরে॥ ঐ
বুঝিনিকো ব্যথাগুলি সোনায় সোহাগাসম,
একাকার হয়ে মিলে মিশেছে হৃদয়ে মম –২
কেমনে ভুলিবো ব্যথা- হৃদয় সোনালি লতা,
যাতনা বাড়ায় ধীরে ধীরে॥ ঐ
সব স্মৃতি মুছে যাবে খেলাঘর ভেঙে গেলে,
বালু বেলা ভেসে যাবে সমাধিতে অতলে –২
তবু না পাবো জীবনে- জেনেছি মেনেছি মনে,
রওশন আমি বুঝেছি অন্তরে॥ ঐ

৯

বিশ্বের সকল দৃশ্যে তোমার প্রকাশ চমৎকার
সৃষ্টি তোমার খেলার পুতুল –২ বিশ্ব তোমার খেলাঘর॥
জীবনের প্রকাশে তুমি গভীর প্রণয়ে,
পিতৃবিন্দু ধারণ করাও মাতৃ আলয়ে –২
বিশ্বে প্রাণের উন্মেষে-তুমি রয়েছ মিশে,
বাল্য, কৈশোর, পৌঢ়, বৃদ্ধ, যৌবন বিলাসে –২
চলছে খেলা প্রেম পরশে- লুকোচুরির অভিসার॥ ঐ
ছন্দহারা জীবনবীণায় তুমি কান্নার সুর,
সকরুণ বিয়োগে তুমি বেদনা বিধুর –২
তুমি যৌবনে যুগপৎ-আশা নিরাশার সংঘাত,
ভীরু মনের শাখায় ফোঁটাও প্রেমের পারিজাত –২
মহাপ্রস্থানে ভয়ংকর নির্ঘাত- আলোতে সুপ্ত আঁধার॥
সরসিত কর বিশ্ব প্রভাত সমীরে,
প্রলয়ের ডম্বরু তুমি বৈশাখি ঝড়ে –২
তুমি তরঙ্গের দোলা – আবার বসন্তের লীলা,
কুসুম অঙ্গে আবির রঙ্গে করিছ খেলা –২
তুমি নিত্যবৃত্ত জীবন বেলা- ভালোমন্দের ভেদ বিচার॥ ঐ
সর্বব্যাপী বিমল রূপে বিশ্ব অপরূপ,
রূপ অরূপে জড়িয়ে তোমার চিন্ময়ী স্বরূপ –২
তোমায় দেখেছি বুঝি – তাই আজ হারায়ে খুঁজি,
তোমার করুণা ভিন্ন হে দয়াল নেই কোন পুঁজি –২
রওশন তোমার কাঙ্গাল সাজি –দাঁড়াই করুণার দুয়ার ॥ঐ[২৬]

১০

শত অপরাধ ক্ষমিও দয়াল- আমি যে তোমার প্রেমেরই কাঙ্গাল
তুমি দয়াল দয়াবান- তুমি রহিম রহমান
ছুবাহান সুলতান, সর্ব জীবের হও সম্বল॥ ঐ

www.pathagar.com

অনাদির আদি তুমি হও বিশ্বপতি–সুন্দরের সুন্দর তুমি অগতির গতি
তুমি গোলক ও ভূলোক- তুমি হও বিশ্বপালক
সাগরের ঝলক- তুমি ঢেউয়েতে উত্তাল॥ ঐ
চলে চন্দ্র সূর্যগ্রহ তারা তোমার ইশারায়–
নভোমণ্ডল ভূমণ্ডলে যাহা কিছু রয়
কত সাগর ও নদী– বহে নিরবধি
সহস্র জলধি- তার জল করে টলমল॥ ঐ
ভালোবেসে সৃষ্টিকর মানবের বাগান–
বললে গোলামি করিবে তোমরা এ আমার বিধান
তোমরা হলে পথভ্রষ্ট- পাবে সীমাহীন কষ্ট
কোরানে স্পষ্ট –প্রমাণ করলেন জুলজালাল॥ ঐ
সীমাহীন দয়াল তোমার দয়ার নেই সীমা
সর্ব জীবের আহার জোগাও তোমার মহিমা
কত সুমিষ্ট ও ফল– দেখি অফুরন্ত জল
বক্কার তোমার পাগোল– তুমি তার সম্বল॥ ঐ

১১

হারাইয়েছি যারে, পাবো কি তারে, খুঁজিলে কি জীবন ভরে
পাবনা তারে আর খুঁজলে জীবন ভরে–যতই ভাসি আঁখি নীরে॥ ঐ
কত ভালোবাসা, বুক ভরা আশা, থাকিব সুখে চিরকাল
কেমনে ঘুচাইবো জ্বালা- গলেতে বিচ্ছেদের মালা
দেহ পুড়ে হলো কালা- তারে পাবো কি ফিরে॥ ঐ
ফোঁটা ফুলের গেঁথে মালা- সাজাইয়ে বরণ ডালা
রাখিয়াছি আসবে প্রাণ সাথী –আশার প্রদীপ জ্বেলে আছি চেয়ে দ্বার খুলে
যদি আসে ভুলে- এ দুঃখের কুঠিরে॥ঐ
শেষ জীবনের শেষ দেখা- দিও এসে প্রাণসখা
থাকিব একা- বসে নিরালে।
পাগোল বক্কারের আরতি- পাই যেন হে প্রাণও সাথী
রহিল এই মিনতি- তোমার দুয়ারে॥ ঐ[২৭]

১২

আমার চলা– কবে হবে এই পথের শেষ সম্ভব নয় তা কারো বলা॥
অজানা এক সারথীর রথে, কবে কোন্‌দিন নেমেছি পথে
বিরাম বিহীন চলি আমি দিবস রাতে।
কত দেখে এলাম পথে পথে–পথিকের পান্থশালা॥ ঐ
দিন কয়েক থাকিয়ে সেখানে, বাহির হলাম বাহিরের উঠানে
দিশেহারা ঘুরি আমি কিসের সন্ধানে।
আমি বুঝিনাতো ক্ষুদ্রজ্ঞানে – কার খেলা এইসব খেলা॥ ঐ
আমার মত গ্রহ নক্ষত্র, ভিন্ন পথে কেউ নয় একত্র

www.pathagar.com

মহাশূন্যে অভিসারে চলে দিনরাত্র।
তাদের বাদ প্রতিবাদ জানি মাত্র, চলে নিঝুম নিরালা॥ ঐ
পাগল বিজয় বলে ওরে আমার মন–পরিচালক আছে রে একজন
কোথা যাবি জেনে তোর কি আছে প্রয়োজন,
তোর পথের শেষ হবে তখন, গিয়ে তাঁর চরণ তলা। ঐ

জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটা কি?
তোমায় বহুনামে ধরা ধামে কত রকমে ডাকি॥
কেহ তোমার বলে ভগবান/ গড বলে কেউ করে আহবান
কেহ খোদা, কেউ যিহদা, কেউ কয় পাতিয়ান
গাইলাম জনম ভরে মুখস্থ গান, মুখবোলা টিয়াপাখি॥ ঐ
সকল শাস্ত্রে শুনিতে যে পাই/তোমার নাকি পিতামাতা নাই
তোমার নামকরণ কে করলো আমি বসে ভাবি তাই
তুমি নামি কি অনামি হে সাঈ, আমরা তার বুঝিবা কি? ঐ
কেহ পিতা কেহ পুত্র কয়/ বন্ধু বলে কেউ দেয় পরিচয়
সকলের সকল তুমি আবার কারো কিছু নয়
দয়াল তোমার যে আসল পরিচয়, কে জানে তা কিনা কি? ঐ
পাগল বিজয় বলে মনের কথা কই/আমি খাটি ভাবের পাগল নই
গোল বেঁধেছে মনের মাঝে কাজেই পাগল হই
আমার বুকে যা নাই মুখে তা কই– কাটাকান চুলে ঢাকি॥ ঐ[২৮]

বাউল গান

১

তোমার রহমতের পাক দরজা খুলে রেখ প্রিয়,
সম্ভব হলে দয়াল আমায় ক্ষমা করে দিও॥
আমি এক দুরন্ত, দুর্দান্ত রে তোর একান্ত পাপীও॥ ঐ
আমার পাপের চেয়ে তোমার দয়া অনেক গুণে বেশি
তুলনামূলক আমি দোষীর চেয়েও দোষী
তোমার অফুরন্ত গুণরাশি- ঐ গুণে ক্ষমিও॥ ঐ
তোমার আইনের বিচারে ক্ষমা করা না সম্ভবে
অসম্ভবকে সম্ভব করা তোমাকেই সম্ভবে
একাজ তোমার দ্বারাই সম্ভব হবে- অসম্ভব যদিও॥ ঐ
আমি দো-দেল বান্দা কলমা চোর এক অধম কুলাঙ্গার
তুমি অনাথবন্ধু করুণা সিন্ধু রহমতের ভাণ্ডার
ভাণ্ডারি তোর ভাণ্ডারের দ্বার- আর একবার খুলিও॥ ঐ
ক্ষমা গুণে তুমি শ্রেষ্ঠ দয়া গুণেও তাই,
গুণাতীত গুণ তোমার যে গুণের সীমা নাই
কাঙ্গাল কেবর কয় তোর ঐ গুণে সাঁঈ-ত্বরিব আমিও॥ ঐ

www.pathagar.com

২

ধন্য মহাবিশ্বের পরিচালক, যিনি বরকতের ভাণ্ডার
মহামহিমান্বিত মহাগৌরবান্বিত, মহাগুণান্বিত, গুণ যাঁর।
যারে ভাবে নিখিল নভে দিবা ছোবে– সাম
আকাশ ভরা তারার মেলা গায় যার গুণগান
ভুবন মোহন তৃষিত সে নাম- ঘোষিত চরাচর॥ ঐ
মহান আরশ অধিপতি তিনি জিনিয়া বিশ্বকুল
ত্বরিতে নিঃস্বে পাঠালে বিশ্বে কত নবি রাসুল
যুগে যুগে কত আল্লার মকবুল – ধরা করে গুলজার॥ ঐ
তাঁর দয়ার ভাণ্ড, কত প্রকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ডে নির্ণয়
করিতে নারে এই বিশ্বের নরে সেবা কত মৃন্ময়
যার সেরূপ ও স্বরূপ হয়েছে চিন্ময় –তার খুলেছে রুদ্ধদ্বার॥ ঐ
প্রকম্পে আদ্রি-গিরি হিমাদ্রি নিন্দ্রিত যার ভরে
সাগর প্রশান্ত হয়েছে শান্ত একান্ত মানিয়া যাঁরে
শত সম্ভ্রমে তারে কাঙ্গাল কেবরে – সপেছে জীবনের ভার॥ ঐ
মুর্শিদ বিনা কে হবে তোর পারের কাণ্ডারি
যদি স্বগুণে নির্গুণে সে তোর বেয়ে নেয় অচল তরী॥

৩

যদি পাড়ি দিবি অগাধ জলে-মরো মুর্শিদের চরণ তলে
পড় হরদমে হরদমে দেলে- আল্লাহ হাজরী জিকিরি
যদি মুর্শিদ দয়া করে- করিলেও করতে পারে
তাই থাকতে হবে নিরিখ ধরে – তার হয়ে পদের ভিখারি॥
যখন দৃষ্টি হবে আলেকপন্থি–মুখে ফুটবে উজ্জ্বল কান্তি
ঘুচে যাবে মনের ভ্রান্তি – শান্তি পাবি ফুরফুরি
তাইতো থাকতে হবে নিরিখ ধরে–ব্যাধে যেমন পক্ষী মারে
তেমনি এক নিরিখে থাকগে পড়ে- যথা বাণ ধরে রয় শিকারি॥
যদি ধরার মতো ধরতে পারো–মরণের আগেতে মরো
সময় থাকতে করণ সার- এদিন হলো আখেরি
মরণ বাদে সেধন চাবি–স্মরণ মাত্র অমনি পাবি
বিনাদামে কিনে নিবি– সেত দোকানদার মনোহরী॥ ঐ
তাইতো থাকগে মন সন্তর্পণে–আশেক রূপে এক ধেয়ানে
মুর্শিদ রূপ দর্পণে – তারে দেখতে পাবি নিহারী
সাঁঈজি মোছলেম শাহ দরবেশে বলে
কেবর চাঁদ মোর অবোধ ছেলে
তুমি জাহাজের খবর লইলে – হয়ে আদার ব্যাপারি॥ ঐ

৪

খেলবি যদি প্রেমের খেলা, খেলা ফেল বেলা যায়

www.pathagar.com

যে খেলায় লা শরিকালা শরীক হয়ে প্রেম খেলায়॥
ষোলো কোঠায় মেরে তালা- খেলরে রসিকের খেলা
যাবে জ্বালা মনরে ভোলা- থাকবে না শমনের ভয়॥ ঐ
উঠে, দ্বি-দলের পর সহস্রারে- তুমি আর সে একই ঘরে
ঘরের জানালা দাও বন্ধ করে- কপাট লাগাও দরজায়॥ ঐ
রেচক পূরক বন্ধ করে- বসে রও কুম্ভকের ঘরে
দেখবি সে প্রেম সরোবরে- উঠে মৌজা ঢেউ খেলায়॥ ঐ
তবে হবে ঠিক ঠিকানা- হলে মুর্শিদ রূপের রূপ নিশানা
ঐ রূপে হইয়ে ফানা- আনাল হক মুনছুরে গায়॥ ঐ
কয় দরবেশে মোসলেম আলী- শোনরে কেবর তোরে বলি
তুমি ছন্দে শেখ পদাবলি– যাহা গুরু শিক্ষা দেয়॥[২৯]

কালিয়া উপজেলার বাউল গান

বাউল কোনো ধর্মীয় মতবাদ নয়। এটি একটি সাধনার ধারা। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে এ মতবাদ, গান এবং সাধনা গ্রহণ করে তা পালন করতে পারে। এটি একটি অন্য রকম সাধনার ধারা। এটি শাস্ত্রবিরোধী সাধনা। এ সাধনায় মনের মানুষ অর্থাৎ দেহ ব্যতিরেকে আত্মাকে খোঁজার চেষ্টা। বাউলরা স্বর্গ ও পরলোকে বিশ্বাসী নয়। এরা দেহবাদী বলে দেহের ভেতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খোঁজার চেষ্টা করে।

বাউল গানের সুর সম্পর্কে কেউ বলেছেন বঙ্গীয় রাগিণী, কেউ বাউলের গেয় সুর, কেউ রামপ্রসাদীর মতো সুর বলে মন্তব্য করেছেন। বাউল একটি সম্প্রদায় হলেও এ শব্দের অর্থ বিভিন্ন রকম। কেউ বলেন উন্মাদ বা দিব্যোন্মাদ, কেউ বলেন অন্যতর বায়ু। কেউ প্রেম বিহ্বল বা আত্মহারা অর্থে বাউল শব্দটি ব্যবহার করতে আগ্রহী।

কালিয়া উপজেলায় এ সম্প্রদায়ের লোক না থাকলেও বাউলধারার প্রচুর গান প্রচলিত আছে। সংসারত্যাগী বা এ ধারার মানুষ না হলেও এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা এ ধারার অনেক গান লিখেছেন।

১

কাম নদীতে বান ডেকেছে রে মন মাঝি সামাল সামাল
আগম নিগম না জানিলে তরী যে তোর হবে বানচাল॥
তরীর মাঝি হওয়া চাই ভালো
গোল চিনে চলো হালে তালে বৈঠা জলে ফেলো
দাঁড়ি-মাল্লা ঘাটে চলো, নইলে তরী যাবে রসাতল॥
নদীতে কাম কুম্ভির রয়
সে কারো করে নাকো ভয়
মরা মানুষ খায় না সে জ্যান্ত মানুষ খায়
যে জন বেহুঁস হয়ে তরী চালায় তারে নেবে জলের তল॥
ঝড় উঠেছে ঈশান কোণে চললি তুই সাগর পানে

www.pathagar.com

মরণ তোর সন্নিধানে কি যেন কি কয়
তুই চেয়ে দেখ তোর সম্মুখ পানে মরণ ভংকরকল॥
নগেন কয় ওরে অবুঝ মন চিনলি না সেই প্রেমের মহাজন
গোন না জেনে ব্যয়ে ব্যয়ে হারালি জীবন
তুই পাড়া[১] বেঁধে কর নিরূপণ ছাড়াবে ঝড়-বাদল॥
১.পাড়া- চরি, খোঁটা।

২

আল্লাহ আল্লাহ বল মোমিন আল্লাহ আকবর
পুলসিরাতে পারের দিনে নবি হবে পারের কাণ্ডার
সেদিন নবি হবে পারের নাবিক যদি ঝড় তুফানে ভয়ংকর॥
ভবনদী পাড়ি দিতে হবে রে একদিন
নিবে আল্লাহ নামের নৌকায় তুলে রাসুল তার জামিন
তুফান কেটে চলবে নৌকারে ও যার পুরো আছে দশের ঘর॥

বিষয় বৈভব পৃথিবীর মান পৃথিবীতে রবে
শূন্য হাতে একদিন আবার চলে যেতে হবে
যেদিন কাল শমন পাঠাবে ভবে রে ডিগ্রি দিবে নিলামদার॥

কামিনী কাঞ্চনের মোহে হয়ে একাকার
লোকের কাছে কয়ে বেড়াই সব আমার সব আমার
যেদিন প্রাণ পাখি তোর উড়ে যাবে রে পাবে একখান মাটির ঘর॥
অধীন গোলাম বলে সময় থাকতে নবির কথা মানো
আল্লাহ নামের নৌকায় চড়ে নবির বাদাম টানো
দেখবি সহজে পার হবি ভবপার নবিজি হবে কাণ্ডার॥ গোলাম রহমান কালিয়া।

৩

বিন্দু ধরে সিন্ধু চেন মন।
বিন্দু বিন্দু করে সিন্ধু হলো রে সৃজন।
বিন্দু ধারণ না করিলে হবে না সাধন ভজন॥
আদিতে যে হয় নিরাকার বিন্দু ধরে নামলো সাকার
অন্তে আবার বিন্দু আকার বিন্দুতে হয় রূপের গঠন॥
অন্তে হয় অন্তস্থ বিন্দু -এ বিন্দু রসের সিন্ধু
যাহার ডাইনে পড়ে বিন্দু কাটতে লাগে দশ জনন॥
বিসর্গ বিন্দু বিষয় চিহ্ন জীব পারে না করতে ছিন্ন
আশি লক্ষ যোনি ক্রমে তার করতে হয় ভ্রমণ॥
চন্দ্র বিন্দু চন্দ্রের পরে চন্দ্র কভু ছোঁয় না তারে
ওঁং বলে সেই বিন্দু আবার করছে জীবের উদ্ধারণ॥
সুরেশ বলে বিন্দু ধরে বাঁয় বসাও তা কলকৌশলে
চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগে তার একেতে হয় মোক্ষ গমন॥
সুরেশ, ছোটকালিয়া।

www.pathagar.com

৪. ধুয়োগান

লোকসংগীতের ক্ষেত্রে ধুয়োগান এক অনন্য সম্পদ। ভাবুক মন সাধনার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অতুল সম্পদ আবেগময় সুর আর বাণীর সমন্বয়ে রচনা করেন ধুয়োগান। কখনও এ গান হয় প্রশ্নবোধক, কখনও প্রশ্নের উত্তর, কখনও দেহতাত্ত্বিক, কখনও উপদেশমূলক, কখনও সমাজ চিত্রের স্বরূপ। বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক অঞ্চলের মত নড়াইলেও ধুয়ো গানের লীলাভূমি। পেশা হিসেবে কেউ কখনও ধুয়োগান পরিবেশন করেন না। গ্রামে গঞ্জে খেটে খাওয়া মানুষেরা ভালোলাগার টানে ধুয়োগান করেন। কয়েক বছর আগেও এখানকার কৃষকরা আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে পানিতে আউশ ধান, পাট কাটার সময় এ গান করতেন। এখানে ধুয়োগান রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ বিজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছেন মোসলেম উদ্দিন বয়াতি, তছির উদ্দিন বয়াতি, সোনাউল্লাহ বয়াতি, মোক্তাদির ফকির, মাছিম গোঁসাই, প্রফুল্ল গোঁসাই, পাগলা কানাই প্রমুখ। নড়াইলে মোসলেম উদ্দিন বয়াতির 'সখিনার বিলাপ' শিরোনামে ধুয়োগানটি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইতনা ইউনিয়নে ধুয়া গানের দল রয়েছে। এ অনুষঙ্গ হিসেবে ঢোল, প্রেমজুড়ি ও হারমোনিয়াম থাকে।[৩০]

এ গানের সাথে জড়িতরা সবাই সাধারণ কৃষক ও শ্রমিক। বিভিন্ন বাড়িতে দাওয়াত হলে এরা গান গাইতে যায়।

১

১৩২৭ সনে বৈশাখের শুক্রবারে শব্দ শুনি কানে
আমি উপর দিকে চাইয়ে দেহি উড়োজাহাজ চলে
ঐ জাহাজের সারেং ব্যাটা দুরবিনোনা ধরে
বাংলাদেশে কি কি আছে ইংরেজ তদন্ত করে দ্যাহে
যত সব যুব নারী দাঁড়াইয়ে সারি সারি উপর দিকে চাইয়ে
এক সকি কয় আর এক সকিরে জাহাজ চালায় কোন্ ফিকিরে
আমি যার কাছে যাই সেইতি বলে জাহাজ গেছে আমার ধার দিয়ে
আমাগে যেমন পুড়া কপাল জন্মেছি নাংলা চাষার ঘরে
জাহাজ যখন যায় রে চলে আমি তহন বারান্দায় বসে
দুয়ো ধরলাম কইসে
আমি ফজর আলী দিবানিশি জগতে আমরা আইছি মিছো॥

অর্থ : চাইয়ে-চেয়ে, দেহি-দেখি,-দূরবিনোনা-দূরবিন, দ্যাহে-দেখে, সকি-সখি, ফিকিরে-পদ্ধিতিতে, নাংলা-অতি সাধারণ।

২

আমি বুধবারের দিন আশায় করে যাব কোলকাতায়
যশোর হইতে টিকিট কাইটে নামলাম যাইয়ে শিয়ালদায়
কতরঙ্গ দেহিলাম টেংরাই
কত ছাগল গরু হচ্ছে জোবই ভাই সকলই চচ্ছে কলেরই দ্বারায়
আমি বলি গঙ্গারই ফোল দেখতে চোমৎকার
দুই পাশে দুই শিকল টেনে রেখেছে ফোল শূন্য ভর

www.pathagar.com

কত মানুষ গরু টিরাম গাড়ি হইয়ে যাচ্ছে পার
ধন্য ধন্য মিসতিরির বাহার
বউ বাজারে যাইয়ে দেহি দোকান খোলা নেই
বিলেতি মাল কিনতে মানা সওদাদীতে দেওগো মন
সবে বল বন্দে মা তরম সলিম বলে ভাই সকল
আমার মন ভজেরি কানাই॥[৩১]

অর্থ : কাইটে-কেটে, যাইয়ে-গিয়ে, টেংরাই-একটি জায়গার নাম, কলেরই-আধুনিক যন্ত্র, ফোল-পোল বা ব্রীজ, টিরাম গাড়ি-ট্রাম গাড়ি, হইয়ে-হয়ে, মিসতিরির-মিস্ত্রি, সওদাদীতে-ব্যবসায়।

৩

কোথাহে বিশ্ববন্ধু কৃপাসিন্ধু নাম ধরিলে
ফোরকানে নিজেই প্রকাশ করিলে।
কোথাহে বিশ্ববন্ধু কৃপা সিন্ধু নাম ধরিলে
তুমি বিশ্বপালক, জ্ঞানের আলোক, সর্বজীবে বর্ষিলে
আরও চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা-গো (২·বার)
দয়ালচান শূন্যের উপর ভাসালে, লতায় পাতায় চমক লাগালে
তুমি নিজেই কবি কাব্য ছন্দেগো–মোসলেমকে চারণকবি সাজালে॥ ঐ
এ জীবের হায়াত, মউত, রেজেক দৌলাৎ তোমার হাতে
শুনি তাই ওলি লোকের মুখেতে, এ জীবের হায়াত মউত, রেজেক দৌলাৎ তোমার হাতে।
তবে কি কারণে দুঃখী তাপি মরছে ভাতের জ্বালাতে–বুঝি ধনী তোমার পাড়াপরশি গো (২বার)–
তারা সব থাকে ২-৩ তালাতে- গোস রুটি খায় নিত্য প্রভাতে
মত মন্ত্রী মেম্বর চেয়ারম্যান ভিলার গোদয়ালচান সব দিলে তাদের হাতে॥ ঐ
যা হওয়ার তাই হইলো আমি একজন অপরাধী
তুমি হও নির্গুণের গুণনিধি, যা হওয়ার তাই হইলো আমি একজন অপরাধী
তুমি নিজামকে করলে আউলিয়া হয়ে দয়াল দরদি
আমি ঐ আশাটুক মনে নিয়ে গো (২ বার)
হয়েছি তোমার কাছে ফরিয়াদি- যা করো হে রব্বকুল হাদি
আমি নাও ভাসালাম তোমার নাম নিয়ে–অধমকে ক্ষমা করো যদি॥ঐ[৩২]

ধুয়োগান (কর্মসংগীত)-

বিজ্ঞান বলে- ভূমণ্ডলে নিত্য নতুন আবিষ্কার
মানুষের অসাধ্য ভাবে কিছু নাইরে আর
শূন্যের পরে রকেট চলে- ছবির মানুষ কথা বলে

টোকির হলে- দেখতে পাই তা চমৎকার।
আবার নিমেষে পাই বিশ্বের খবর- থাকলে ঘরে ট্রানজিস্টর

www.pathagar.com

আর এক কীর্তি টেলিভিশন মানুষের ছবি যায় সাত সাগরের পার। ঐ
হয়ে রঞ্জনপতি মানব জাতি পেয়েছে বড় আরাম
এক্সেরেতে পড়ছে ধরা শরীরের ব্যারাম
আবার নতুন কিছু পাবার জন্যে রকেট চলে মহাশূন্যে
মাটির মানুষ পৌছায় গিয়ে চন্দ্রধাম
এখন যন্ত্র বলে সবই চলে পায়ে চলা হাতের কাম
শুধু মরণ বারণ করতে পারলে- এ ভবে কেউ নিত না খোদার নাম॥ ঐ
যত কিছু করলো নিজেদের সুখের কারণ,
এটেম বোমা হলো বিশ্বের অকালে মরণ
এই এটমের বিভীষিকা হিরোসিমা নাগাশিকা
নিমেষে লক্ষ লোক হারায় জীবন
নিজেদেরই মরণ অস্ত্র তৈয়ের করছে মানবগণ
ভেবে বিপিন বলে করিস নারে- নিজেদের ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন॥ ঐ

কর্মসংগীত : ছাদ পেটানো গান

ওলো ছোট বউলো ছোট বউ তোরে আমি বলি
সব দুঃখ তোর ঘুচে যাবে- আমার সাথে গেলি-লো ছোট বউ
কার জন্যে দাঁড়াইছ রাজপথে?
ছোট বউলো ছোট বউ- তোর কপাল দেখি খালি–
সোনার টিকলি গড়ে দেব- আমার
সাথে গিলি-লো ছোট বউ–কার জন্যে দাঁড়াইছ রাজপথে?
ছোট বউলো ছোট বউ তোর গলা দেখি খালি
সাতনরি হার গড়ে দেব- আমার সাথে গিলি লো ছোট বউ
কার জন্যে দাঁড়াইছ রাজপথে?
ছোট বউলো ছোট বউ তোর কান দেখি খালি
বাহারি দুল গড়ে দেব- আমার সাথে গিলি লো ছোট বউ
কার জন্যে দাঁড়াইছ রাজপথে?
ছোট বউলো ছোট বউ- তোর বুক দেখি খালি
চন্দ্র গলা ব্লাউজ দেবো- আমার সাথে গিলি- লো ছোট বউ
কার জন্যে দাঁড়াইছ রাজপথে?
ছোট বউলো ছোট বউ তোর শাড়িতে দেখি তালি
নীলাম্বরী কিনে দেবো আমার সাথে গিলি-লো ছোট বউ
কার জন্যে দাঁড়াইছ রাজপথে?
ছোট বউলো ছোট বউ তোর পা দেখি খালি
চার গুছি মল গড়ে দেব- আমার সাথে গিলি লো ছোট বউ
কার জন্যে দাঁড়াইছ রাজপথে?
আর কিছুতো চাই না আমি সাধের মিয়া ভাই
চল যেথায় ইচ্ছা ঘর বাঁধিতে যাইলো মিয়া ভাই-
তোমার জন্য দাঁড়াইছি রাজপথে॥

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিক সংগীত সাধারণত পূজাপার্বণ কিংবা মানত থাকলে অথবা স্রষ্টাকে ভালোবেসে পাবার আকিঞ্চনে সন্ধ্যায়, গভীর রাতে সুরের মূর্ছনা প্রাণের আকুতি প্রকাশের জন্য গীত হয়। আনুষ্ঠানিক সংগীত সাধারণত ভজন সংগীত হয় এক্ষেত্রে পদকীর্তন, গাসসির গান, হরিসংগীত, নাত-এ-রাসুল, হামদ সব শ্রেণির গানগুলি আনুষ্ঠানিক সংগীতের ধারায় আনা যায়। আনুষ্ঠানিক সংগীতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়। যথা- হারমোনিয়াম, ঢোল, আড়বাঁশি, মন্দিরা, কাঁস ইত্যাদি যন্ত্র অনুষঙ্গ এখানে উপস্থিত। হরিসংগীতের ক্ষেত্রে ধুতি পাঞ্জাবি কিংবা ধুতি-গেঞ্জি, নামযজ্ঞের জন্য গেরুয়া ধুতী ও গেঞ্জি, কীর্তনের জন্য ধুতি-গেঞ্জি, নাত-এ-রাসুল, গাসসির গান, হামদ ইত্যাদির জন্য লুঙ্গি পাঞ্জাবি কিংবা পাজামা-পাঞ্জাবি ব্যবহৃত হয়।[৩৩]

৫. বারাসে/বারোমাসি গান

কালিয়া উপজেলার বারাসে গানের ভাষা এমনই যে তা জনবসতিপূর্ণ এলাকায় গাওয়া হয় না। এ গান বিলের জলের কলস বেঁধে ধান কাটার সময় অথবা ধান নিড়ানোর সময় উচ্চৈস্বরে পরিবেশিত হয়। ছাঁদ পিটানোর সময়ও এ গান গাওয়া হতো। খোলা মাঠে দুই দল শ্রমিকের মধ্যে প্রতিযোগিতার মতো এ গান পরিবেশিত হতো। এ গানে কখনও সঙ্গতিপূর্ণ ভাষা কখনও অসঙ্গতিপূর্ণ ভাষা ব্যবহৃত হয়। কেউ মালঞ্চ গাইলে আর একজন মাধব গাইতেন। এমনই করে মাঠে বাদ্যযন্ত্রবিহীন পরিবেশিত গান হারিয়ে যেতে বসেছে। একটা বিশেষ প্রজন্মের দ্বারা পরিবেশিত এ গান তাদের মৃত্যু, দেশত্যাগ, অন্যত্র অভিবাসনের ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে। আবদুল খালেক (কুটি মিয়া), বয়স ১০০ বছর ৮ মাস। গ্রাম- ছোটকালিয়া, হাড়-পা কাঁপছে তাঁর। স্মৃতি থেকে কিছু হাতড়ে গান অনেকদিন ধরে বারবার পঙ্‌ক্তিগুলো আউড়িয়ে কিছু গান দিতে পেরেছেন। তিনি এ গানের তুখোড় শিল্পী ছিলেন। গাছের আগায় ৩০ হাত আর মাটির তলায় ৩৫ হাত পর্যন্ত কাজ করেছেন। অর্থাৎ গাছে চড়া ও ইদারা নির্মাণে সিদ্ধহস্ত কুটি মিয়া ছাদ পিটাতেন। দুই দলে বিভক্ত হয়ে এ কাজ করতেন আর বারাসে গান পরিবেশন করতেন।

বারাসে গান এক সময়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। বিলে ধান কাটার ও নিড়ানোর সময় এবং ছাদ পেটানোর সময় পরিবেশিত এ গান যে রমণীদেরও বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল তারও দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ছোট কালিয়া গ্রামের গয়ারাম বিশ্বাসের বারাসে গান শুনে গোবিন্দনগর গ্রামের প্রভাবশালী ও প্রতাপশালী পরিবাবের মেয়ে তাঁকে বিয়ে করার জন্য পাগল প্রায় হয় এবং এক সময় তাঁদের বিয়ে হয়।

১

শীত গেল বসন্ত এলো মধুর ফাল্গুন মাস
বিরহিণীর মনের আগুন জ্বলে বার মাস॥
বিদেশেতে থাকো সাধু বিদেশেতে ঘর
কোন্ রমণী খাওয়াইছে সাধু কাঁচা দুধের সর॥
চারা গাছে ডালিম ধরে পেকে রয় গাছে
উড়ো কাকে এসে ঠোক মারিলে রসতলা যায় ভেসে॥

www.pathagar.com

বিদেশেতে থাকো সাধু করি না গো মানা
দেখে যাবা মজার যৌবন সাধু এসে পাবা না॥
বিদেশেতে থাকো সাধু পথে খাবা কি
কান্ধের গামছা ফেলে দেনা সাধু দুটো ডালিম বেন্ধে দি॥
এক কথা শুনিয়া সাধু ফিরে ফেলে পা
ফিরে যারে দাঁড়ি মাঝি আমার যাওয়া হলো না॥[১৪]

২

তিন সখী যায় জল আনিতে
আগের সখী কালো
পাছের সখীর দাঁতে মাজন
ঘাট করেছে আলো॥
বিয়ের কথা ভালো কথা
জানে সর্বলোকে
বিয়ের কথা মন্দ কয়
কোন্ বা মহাজনে॥
মহাজনের নাগলো পালি
হাত ধরে বসাতাম॥
হাত ধরে বসায়ে
দুই চার কথা বলতাম॥
সবার চেয়ে ভালো ইলিশ
মাছের কোল
তার চেয়ে ভালো
যুব নারীর কোল॥
ও কালারে, পথ ছাড় রে কালা
যাই রে ঘাটে
হালো কিষেণ আলো বাড়ি
কলসিতে নাইকো জল॥

৩

আমার বাড়ি যাবারে বিনোদ, বসতি দিবো পিঁড়ে
জলপান করতে দেবো রে বিনোদ, শালু ধানের চিঁড়ে।
শালু ধানের চিঁড়ে নয় রে বিনোদ, পারাংশি ধানের খৈ
গাছের পাকা সফরি রে বিনোদ, গামছা মোড়া দৈ।
আমার বাড়ি যাবা রে বিনোদ, চাড়ায় কাটবে পাও
শুকনো কালে দিবো রে ঘোড়া বর্ষা কালে লাও[১]।
ওপার বসে বাজাও রে বাঁশি বিনোদ, এপার বসে শুনি
উড়ে যাবার আশা করি রে বিনোদ বিধি পাখা দেয়নি।[১৫]

১. লাও- নাও, নৌকা।

www.pathagar.com

লোহাগড়া উপজেলার বারাসে

কৃষকরা এক সময় জমিতে গাতা করে চাষ করতো এবং ফসল কাটতো। জমিতে কাজ করার সময় সারাদিন বারাসে/বারোমাসি গান করেছে আর কাজ করেছে। পাশাপাশি দুই গাতা এক মাঠে এলে তো কথাই ছিল না। সারাদিন দুই পক্ষ পালা দিয়ে মুখে গান গেয়েছে আর হাতে করেছে কাজ। গানে মন ডুবে থাকায় কাজের শ্রম তারা অনুভব করতে পারতো না। বারোমাসি কথার ভেতরই বারোমাসের নাম থাকাটা স্বাভাবিক। উপজেলায় এক সময় এ গানের চল থাকলেও এখন এই অমূল্য সম্পদ দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে।

১

শীত গেল বসন্ত এল মধুর ফাল্গুন মাস
বিরহিণীর মনে আগুন জ্বলে বারো মাস।
শুকনো ডালে বসে কোকিল করে মধুর গান
আর ডাকিস না কালো কোকিল আমার উড়িলো পরান।
বিদেশেতে যাবা বন্ধু বারণ করি না,
দেখে যাবা ভরা যৌবন বন্ধু এসে পাবা না।
বিদেশেতে যাবা বন্ধু পথে খাবা কি,
কাঁধের গামছা ফেলে দাও দুটো ডালিম বেঁধেছি।
ঝাঁড়ের বাঁশও কেটে সাধু বানায় দাঁড়ের কুড়ো
দেখে যাবা ভরা যৌবন এস পাবা বুড়ো।
এই কথা শুনিয়া সাধু ডাঙ্গায় ফেলে পা
ফিরে যারে মাঝি মালা আমার যাওয়া হলো না॥
অর্থ : দাড়ের কুড়ো-নৌকার বৈঠা, ডাঙ্গায়-নদীর তীর।

২

ওরে শীত বসন্ত সুখের সুময় পতি নাই যার ঘরে
তুই বল না আমায় ননদিনি থাকবো কেমন কইরে॥
খাটের পরে দুইটি বালিশ থাকে পাশাপাশি
ঘুম আসে না হায় রে চোখে নয়ন জলে ভাসি॥
কতো ব্যতা মনের কথা বলবো তারে শুইয়ে
কেমন কইরে বিদেশেতে থাকো আমায় থুইয়ে॥
এমন যদি থাকবে তুমি করলে ক্যানো বিয়ে
ওরে বারেক আসে এই কতাটি যাও না আমায় কইয়ে॥

রাতি দিনি চিঠি লিখি ভিজে চোখের জলে
হয় না দয়া অভাগীরে মরবো কলসি নিয়ে গলে॥
অর্থ : কইরে-করে, থুইয়ে-রেখে, কইয়ে-কয়ে।[৩৬]

৬. ভাটিয়ালি

লোহাগড়া উপজেলার নদীতে নৌকা বা লঞ্চে চলা নদীর পারের ওপর দৃশ্য মনকে যেমন আকৃষ্ট করে তেমনি ক্ষীণ গতিতে বয়ে চলা তরঙ্গ মেলার দোলানিতে আনমনেই

www.pathagar.com

মাঝির মনে সুরের স্মৃতি স্বপ্ন হয়ে দোলা দেয়। মাঝি অবলীলাক্রমে গেয়ে যায় সুখ-দুঃখ, বিরহ-বেদনার গান।

এ গানই ভাটিয়ালি গান নামে অভিহিত। বহু বছর আগ থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ বিশেষ করে নড়াইলের মধুমতি-নবগঙ্গা নদীতে পাল তুলে মাঝি মনের আনন্দে নৌকা চালায় এবং ভাটিয়ালি গান গায়। এখনও হাটে-ঘাটে, মাঠে-নদীর বুকে ভাটিয়ালি গানের সুর তন্ময় করে তোলে।

যারা নড়াইলের জারিগান, কবিগান, ভাবগান, কীর্তন গান, পরিবেশন করতেন বা করে থাকেন তাঁরা নিজস্ব গানের আসরে অতীতে এবং বর্তমানেও ভাটিয়ালি গান অনুষঙ্গ গীত হিসেবে পরিবেশন করে থাকেন। নড়াইলের কবিয়াল বিজয় সরকার ও জারি সম্রাট চারণকবি মোসলেমের আবির্ভাবের পর এ এলাকায় ভাটিয়ালি একটি প্রসিদ্ধ লোকসংগীত হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[৩৭]

৭. পল্লিগীতি ও আঞ্চলিক গান

পল্লিগীতি

পল্লিগীতির সুর এ অঞ্চলের মানুষের মনে আজও দোলা দেয়। প্রমাণ মেলে স্রোতস্বিনী মধুমতি, নবগঙ্গাসহ বিভিন্ন নদীতে ভেসে যাওয়া নৌকা ও নৌযানের মাঝি ও যাত্রীদের পল্লিগীতির ভরাট সুরে কিংবা ধানের ক্ষেতে কৃষকের গেয়ে যাওয়া গানে বা সন্ধ্যাকালে রাখালের বাড়ি ফেরার পথে একাকী বা দল বেঁধে সমস্বরে পল্লিগীতি গানের সুরেলা আওয়াজে।[৩৮]

আঞ্চলিক গান

খাজুর গাছে চোমর বারইছে তোরে আনে দেবো
সন্ধের নস ঝাড়ে আনে জাউ নান্দে খাবো,
ঠিলে ধুয়ে দেরে বউ গাছ কাটতি যাবো।
ঠুঙ্গা আইনে দে দড়া আইনে দে
বালি ধারা খান কই,
ঠিলের গলায় কানাচ লাগা বেলা গেলো ঐ।
বালির চুঙ্গা আনে দে দাউ ধারাব,
কাচি পুড়া ফিটে বানাইয়ে তাতে নসদে ভিজাব।
বিয়ানে সকালে সেই থাল ভরে দিবো
আমি রোদি বসে সেই ফিটে মজা কইরে খাবো।

অর্থ : চমোর-খেজুরের ফুল, নস-রস, জাউ-চাল ও রস দিয়ে তৈরি ক্ষীর, ঠিলে-ছোট কলস, ঠুংগা-দা, দড়ি ও রশি রাখার একটি পাত্র, কানাচ-গলার রশি, কাচি পুড়া-চালের গুড়ো দিয়ে এক প্রকার চিতল পিঠা, রোদি-রৌদ্রে, ফিটে-পিঠা, নান্দে-রান্না করা, বিয়ানে-ভোরে, বালির চুংগা-দা ধার দেবার যন্ত্র ইত্যাদি।[৩৯]

লোহাগড়ার লোককবি আব্দুল গফুরের লেখা একটি আঞ্চলিক গান

নবগঙ্গা নদীর পাড়ে আমার ছোট্ট বাড়ি

www.pathagar.com

ছোট্ট ব্যালায় দেখেছি তারে কেউ দিতো না পাড়ি
নবগঙ্গা নদীর বুকে করতো কুমীর বাস
এখন সেথায় চাষি ভাইরা করিছে চাষ বাস।
যেথায় ছিল পানির গোলা সেথায় বড় চর,
মাঝে মাঝে দেখেছি আবার অনেক বাড়িঘর।

পাল তুলে সে নৌকাগুলো আসে নাই ফিরে,
নবগঙ্গার বক্ষখানি গেছে ফাঁড়ে চিরে।
বাছির নৌকা বাইচ দিয়ে সব গাইত সারি গান,
এক কালেতে ছিলো রে ভাই নবগঙ্গার মান।
গরু বাছুর আনত ঘাটে স্নান করাতে ভাই,
জল শুকায়ে গেছে বলে কেহ আনে নাই।
জল আনিতে যায় না কেহ কল পুতিছে বাড়ি
নবগঙ্গার দুঃখের কথা সদায় পেচাল পাড়ি।

অর্থ : পানির গোলা-নদীতে যে স্থানে বেশি গভীর থাকে, ফাঁড়ে চিরে-চর পড়ে নদী ছোট হয়ে যাওয়া, স্নান-গোসল, কল-টিউবওয়েল, সদয়ে-সব সময় ইত্যাদি।[৪০]

৮. অষ্টক গান

নড়াইলের অন্যতম লোকগীতি হলো অষ্টক গান। বসন্তকালে অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তির আগে পরিবেশিত এ গানে রাধাকৃষ্ণ, শিব-দুর্গা, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি ছাড়াও পণপ্রথা, সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গ, কৃষি সমস্যা, বৃক্ষ রোপণ, সমাজের অসংগতি বা শিক্ষামূলক বিষয় ইত্যাদি অষ্টক গানের বিষয়বস্তু। অষ্ট সখীর সহযোগে এই গান পরিবেশিত হয় বলে একে অষ্টক বলা হয়েছে। এটি একটি গোষ্ঠীবদ্ধ নৃত্যসহ সাঙ্গিতিক পরিবেশনা। সামনে ৭-৮জন ছেলেমেয়ে এবং পেছনে ১০-১২জন শিল্পী হারমোনিয়াম, বেহালা, বাঁশি, কাঁসি, করতাল সহযোগে এ গান পরিবেশিত হয়। এ গান কমবয়সি ছেলেমেয়েরা মুখে স্নো, পাউডার, লিপস্টিক, মেকআপ করে মেয়েরা শাড়ি ও অলংকার পরে ছেলেরা রঙিন ড্রেস পরে নেচে নেচে গান পরিবেশন করেন। নওয়াগ্রাম ইউনিয়নের রায়গ্রাম, দিঘলিয়া ইউনিয়নের দিঘলিয়া, লোহাগড়া পৌরসভার নারানদিয়া, কৃষ্ণপুরসহ বিভিন্ন গ্রামে এখনও মাঝে মধ্যে অষ্টক গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। লোহাগড়া পৌরসভার নারানদিয়া গ্রামে শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (৫০), নওয়াগ্রাম ইউনিয়নের রায়গ্রামের বিধান গাছি (৪০), অনিল বিশ্বাসের (৪৫) অষ্টক গানের দল রয়েছে।[৪১]

অষ্টক গান (চণ্ডিদাস রজকিনী)

১

ঘাটে কে গো তুমি নবীন কিশোর– কোথায় তোমার বাস
আমি যখন বসন কাচি, নবীন তখন ধরো মাছ
আর কি তুমি পাওনা সময় গো–নিত্য আস অবর বেলায়

www.pathagar.com

বোঝ না সময় অসময় লো নবীন–
থাকো আড় নয়নে চেয়ে লো লজ্জায় মরে যাই॥

২

তুমি শুনো শুনো রূপসী লো পরিচয় আমার –আমি ব্রাহ্মণ কুমার
আমি এপার বসে বাই যে বরশি –আমার মৎস্য রয় ওপার
আমি তাইতে চাহি ওপার পানে লো–কখন মাছে বড়শি টানে লো ধনী
টানে যদি টানে লো ধনী–ও তাই আড় নয়নে চাহিল বড়শি করিবার।

৩

তোমার মাছ ধরা কি সাধন ভজন মাছ ধরা কি ধ্যান–ওগো ব্রাহ্মণ সন্তান
এখন বড়শি বেয়ে মাছ না পেয়ে –তুমি ছিপে কামড়াও ক্যান
আর আমি আসবে না লো–বসন আর কাচবোনা পাটে লো নবীন
ও তাই আজ হতে মাছ বাঁধলো –গো বড়শিতে তোমার।

৪

চণ্ডীদাস আর রজকিনী প্রেমের মহাজন–এ প্রেম করে আর কয়জন এক মরণে দুইজন মরে বড় অপূর্ব ঘটন–অদ্য লক্ষ প্রেম শিকলে মিলন হল শুভক্ষণে তোমরা জয়ধ্বনি করগো যত বামাগণ॥[৪২]

অর্থ : বড়শি টানে-বড়শি খাওয়া, তাইতে-তাতে, পাটে-ঘাটে।

অষ্টক গান শিব ঠাকুরের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত গান হলেও এ গানের বিষয় যতখানি অন্য প্রসঙ্গ যেমন রাধাকৃষ্ণ বা অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে বিবর্ধিত, ততখানি বা আদৌ শিব ঠাকুরের প্রসঙ্গ নিয়ে নয়। বালা গানের সঙ্গে অষ্টক গানের যে মৌলিক পার্থক্য তা হলো সুরের। তাছাড়া, বিষয়গত দিক থেকে উভয় গানের সাদৃশ্য আছে। এ গানের নাম অষ্টক হওয়ার পেছনে দু'টো কারণ আছে। প্রথম কারণ, এ গান অষ্ট সখী সমন্বিত হয়ে পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয় কারণ, এ গান আট চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু মজার বিষয়, এ গান অষ্ট সখী মিলে নাও গীত হতে পারে। আবার আট চরণের কমও হতে পারে, বেশিও হতে পারে। এ সুবাদে বলা যায় 'আইনের লৌহ ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে/ প্রাণ শুধু পায় তার প্রাণে।' এ গানের মধ্যে এ গানের পরিচিতি লুকিয়ে আছে।

১

ওমা জগৎ জননী, তুমি তরাও তারিণী
পারঘাটাতে তুমি মাগো হলে পারের তরণী॥
তুমি শুনো ভবনী আমি সাধন জানি
সর্ব জীবের মাতা তুমি হলে শিবের ঘরনি॥
তোমার যত ভক্তগণ তোমায় করতেছে স্মরণ
দয়া করে জগৎ মাতা দাও তোমার রাঙা চরণ॥

২

চলছে ভীষণ কলিকাল, তাতে মায়ে লোক প্রবল
গানবাজনা আর নামযজ্ঞতে ওরাই বাঁধায় হট্টগোল।

www.pathagar.com

যত যুবতি মেয়ে তারা চলে ডাট দিয়ে
যুবক ছেলের মন ভুলাচ্ছে ওড়নার আঁচল গায় দিয়ে।
যত সুন্দরী মেয়ে কাজল দেয় ডাগর চোখে
তাদের চোখের ভঙ্গি দেখলে কত সাধু মুরশিদ যায় বেঁকে॥[৪৩]

৩

গৌর নিতাই দুটি ভাই তাদের গুণের সীমা নাই
জীব তরাতে ঘোর কলিতে এলেন গৌরাঙ্গ গোঁসাই॥
মধুর হরি নাম দিয়ে নিজ জগৎ মাতায়ে
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে নাম দিচ্ছে বিলায়ে॥
কত বাজিতেছে খোল আর কত মাদল
সবে মিলে বাহুতুলে বলে হরি হরিবোল॥[৪৪]

অষ্টক গান (ক্ষুদিরামের ফাঁসি)

নিরুপমা : কোলে আয় প্রাণরাম ও ক্ষুদিরাম দুঃখিনীর সন্তান
জীবনে আর পাবো নাত- কোলে আয় ভাই জন্মের মতো
তোরে কোলে করে জুড়াই এ জীবন॥

ক্ষুদিরাম : করি এই মিনতি তোমার প্রতি শুনগো প্রহরী
হাতের বাঁধন দাওগো খুলে– উঠবো আমার দিদির কোলে
আমি মুছাই দিদির নয়নের বারি॥

নিরুপমা : আমি আজ কতকাল দেখি না তোমার চাঁদ বদনখানি
কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ আঁখি– কেমনে ভাই তোরে দেখি
একবার কোলে আয় মোর নয়নের মণি॥

নিরুপমা : ওরে তোরাতো মায়েরই ছেলে মাকি তোদের নাই
প্রাণে কিরে নাই মমতা- বুঝি সনা জননীর ব্যথা
একবার খুলে দে মোর এ দুঃখ জুড়াই॥

ক্ষুদিরাম : তুমি এক পুত্রের শোকে দিদি কাঁদিও না আর
কোটি পুত্রের মর্মব্যথা- সহিছে মোর ভারতমাতা
বল কে করিবে ইহার প্রতিকার॥

৯. পটের গান

'পট' শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হলেও পটের গান বলতে আমরা বুঝি ছবির গান বা ছবিকে কেন্দ্র করে রচিত গান। কথাটি অন্যভাবেও বলা যায়, গানকে কেন্দ্র করে পটে আঁকা ছবি। বিষয় দু'টির মধ্যে কোন্‌টি আগে আর কোন্‌টি পরে তা ঠিক করে বলা সম্ভব নয়। কেননা, এমনও হতে পারে, গ্রামীণ কোনো বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেউ গান বাঁধলো, সেই বাঁধা গানের ওপর ভিত্তি করে আঁকা হলো একটি ছবি। গ্রামাঞ্চলে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার সাদামাটা ছন্দবদ্ধ বর্ণনাকে ছবির মাধ্যমে উপস্থাপন করার জন্যে

www.pathagar.com

যে গান এবং ছবির সমন্বয় হয়, তাকেই বলা হয় পটের গান। কালিয়ার জুশালা গ্রামে একদা এ গানের দল ছিল। আমাদের সংগৃহীত গানগুলো ঐ অঞ্চলেরই সৃষ্টি। এ গানের সুর খুবই সাধারণ। ইদানীং এ গান গ্রাম্যতা বর্জিত অথচ গ্রাম্য প্রকরণকে ধারণ করে সচেতনভাবে চলমান কোনো ঘটনা বা কোনো বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই মাধ্যমকে গ্রহণ করা হচ্ছে। কেননা, পটের গান এমন একটি মাধ্যম যেখানে ছবিও আছে এবং তার বর্ণনার জন্যে গানও আছে। ফলে বিশেষ কোনো বিষয় বিজ্ঞাপিত করতে এ মাধ্যম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ গান পরিবেশনের কৌশল হলো :

একটি ক্যানভাসের ওপর বিভিন্ন রকমের বা বিষয়ভিত্তিক ছবি আঁকা থাকে। ক্যানভাসটিকে গুলিয়ে রাখার জন্যে দু'টি লাঠি ব্যবহৃত হয়। পটটি দেখানোর সময় গোলানো অংশটি খুলে দেয়া হয়। আর দেখানো অংশটি অন্য একটি লাঠিতে গোলানো হয়। পটের ছবি উন্মোচিত হলেই মূল গায়ক বা গায়িকা ছবির বয়ান পেশ করেন। গায়কের দুই পাশে থাকেন দুই বা তিনজন করে সহশিল্পী। বাদ্যকর হিসেবে থাকেন একজন ঢুলি, খঞ্জনি বাদক একজন। মূল গায়েন বা বর্ণনাকারী কিংবা দলের সবাই গেরুয়া রঙের পোশাক পরতে পারেন।

১

আরে আম গাছে টিম টিম
বরই গাছে বাসা
নিমের মার ছেলে হয়েছে
চিংড়ি মাছের খোঁসা।
সমস্বরে : হায় রায় রাজুবালা
বিরহে তোর প্রাণ তো বাঁচে না।

২

আরে তিন সখী যায় জল আনিতে
মধ্যের সখী কালো
আগের সখীর দাঁতে মাজন
ঘাট করেছে আলো।
সমস্বরে : হায় রায় রাজুবালা
বিরহে তোর প্রাণ তো বাঁচে না।

৩

আরে উত্তর ডাঙ্গায় গাই বিয়েইছে
বাছুর নেলো চিলি
ঢেঁহির সোনাই ভাঙ্গে গিলি
গাই দোয়াইব কিসি?
সমস্বরে : হায় রায় রাজুবালা
বিরহে তোর প্রাণ তো বাঁচে না।

৪

আরে উত্তর ভাঙ্গায় মাছ

www.pathagar.com

গাবাইছে
পুঁটি বাধল জালে
জামাইরে কামড়াইছে সাপে
বিষি মরলো মায়ে।
সমস্বরে : হায় রায় রাজুবালা
বিরহে তোর প্রাণ তো বাঁচে না।

৫

আরে নড়ালে গো হাতিরে ভাই
আড়ে ওড়ে চায়
সামনে একটা কলাগাছ পালি
আমনি ভাঙ্গ যায়।
সমস্বরে : হায় রায় রাজুবালা
বিরহে তোর প্রাণ তো বাঁচে না।

৬

আরে মাঝির গাতির গাঙ্গদেরে ভাই
কুম্ভির ভাসে যায়
মরা মানুষ খায় না তারা
তাজা মানুষ খায়।
সমস্বরে : হায় রায় রাজুবালা
বিরহে তোর প্রাণ তো বাঁচে না।

৭

আরে উলুবনের বাঘ রে ভাই
ঢুলু ঢুলু চায়
মরা মানুষ খায় না তারা
তাজা মানুষ খায়।
সমস্বরে :হায় রায় রাজুবালা
বিরহে তোর প্রাণ তো বাঁচে না।

৮

আরে ছোটখাট মিয়ারে ভাই
মুখে চাপা দাড়ি
পাকা ধানে গরু দিয়া
হুক্কা টানে বাড়ি।
সমস্বরে : হায় রায় রাজুবালা
বিরহে তোর প্রাণ তো বাঁচে না।

৯

আরে উদোয় পুরির আমরে ভাই
এক পিঠে তার কালো

www.pathagar.com

তাড়াতাড়ি বিদায় করেন
বেলা চলে গেল।
সমস্বরে : হায় রায় রাজুবালা
বিরহে তোর প্রাণ তো বাঁচে না।

১০
আরে এই বাড়ির এই বাড়ির কত্তা
বড়ই ভাগ্যবান
ঘরে যাবে বাক্স খোলবে
টাকা করবে দান।
সমস্বরে : হায় রায় রাজুবালা
বিরহে তোর প্রাণ তো বাঁচে না।[৪৫]

আনুষ্ঠানিক সংগীত পটগান

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এলাকায় পটগান নামে এক প্রকার গান গীত হতে দেখা যেত। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে গান হারিয়ে গেছে। এরপর রূপান্তর নামক সংগঠন এর (প্রধান কার্যালয় খুলনায় অবস্থিত) নির্বাহী পরিচালক স্বপন গুহ লোক সংস্কৃতির নানা বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সুন্দরবনের সন্নিকটে মংলায় লোক থিয়েটার পরিবেশের উপর একটা ওয়ার্কশপ করতে যান। ওয়ার্কশপের বিষয় কৃষিজীবন ঘনিষ্ঠ থিয়েটার। তিনি এ থিয়েটারকে লোকনাট্য নামকরণ দিয়েছেন। কারণ লোকনাট্যের বিশেষত্ব হলো স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও অঞ্চলে প্রচলিত জনপ্রিয় লোকসংগীতের সুরে নাটকের চরিত্র কথা অভিনয়ে চিত্রিত করা। যাহোক ১৯৯২-৯৩ সালে স্বপন গুহ (বাড়ি-নড়াইল) মংলায় সুভাষ বিশ্বাসের অনুরোধে তার এলাকায় লোকনাট্যের ওয়ার্কশপে একজন শিক্ষক কৃষ্ণপদ অধিকারী বলেন, এলাকায় এক সময় পটগান ছিল। অতঃপর অন্য একজন প্রধান শিক্ষক অমল বিশ্বাস পট গানের আঙ্গিক ও ধারাক্রম বর্ণনা করেন। এরপর স্বপন গুহ হারিয়ে যাওয়া লোকজ এ ধারাটিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াসে উদ্যোগ নেন এবং তার চিন্তায় ও নির্দেশনায় ১৯৯৬ সালে ৫ জুন সর্বপ্রথম রামপাল বাগেরহাট অঞ্চলে পটগান দেখানো হয়। এরপর নড়াইলের মানুষের পুনরুদ্ধারকৃত এ গানটি নড়াইলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পায় এবং কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে বর্তমানে পটগান যথেষ্ট জনপ্রিয়ভাবে পরিবেশিত হয়। স্বপন গুহ পটগানকে বাঙ্গল লোকজীবনের নানাবিধ সমস্যা সংকটের বিষয় কিংবা দেশের যে কোনো বিষয়বস্তু যেটির ব্যাপক প্রচার ও সচেতনতা আবশ্যক তেমন বিষয় বস্তুর উপর পটগানের কাহিনি নির্মাণ করেন। তবে তিনি সাধারণত এলাকাভিত্তিক পরিচিত লোককবির সুরে কাহিনির ছন্দগুলি সুরারোপ করেন। বর্তমানে লাওস, ভারত, শ্রীলংকা ও চিনে বাংলার পটগান ঐ দেশীয় ভাব, ভাষা ও সুরে পরিবেশিত হচ্ছে। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব নড়াইলের লোকসংস্কৃতির অন্যতম ধারক স্বপন গুহ মহাশয়ের।

পটগানের মূল লক্ষ্য

ক. শিক্ষামূলক যে কোনো বিষয় স্থানীয় সুরে কাহিনি বিন্যাসিত করে তা পরিবেশন করা।

www.pathagar.com

খ. লোকনাট্য ফর্মে পটগান পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াতের দিকে লক্ষ রেখে পটগানে ব্যবহৃত জিনিসপত্রগুলি সহজ সহনীয় করা হয়েছে।

গ. পটগানের বিষয় বিন্যাসে নির্দিষ্ট কোনো ধারাকে আবশ্যক না ভেবে নমনীয় করা হয়েছে। ভবিষ্যতে চিন্তাবিদগণ প্রয়োজনে সেই সময়কার জীবনঘন উপজীব্য বিষয়ে যাতে পটগান পরিবেশন করার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন।

পোশাক ও জনবল

নড়াইলে উদ্ভাবিত পটগানে একজন মূল গায়েন ২ জন পটচিত্র (যা কাহিনির প্রয়োজনে কাহিনি বিন্যাসে কাহিনির চরিত্র কিংবা দৃশ্যাবলী ক্যানভাসের উপর লোকশিল্পীদের দ্বারা অঙ্কন করা হয়) ধরে রাখে। ১ জন ঢোল বাজায়, ১ জন খঞ্জনি বাজায় এবং এক পাশে তিনজন সহশিল্পী করে দুই পাশে ৬ জন সহশিল্পী দোহারের কাজ করে। মূলগায়ক গেরুয়া রঙের পোশাক পরিধান করে পটগানে অংশগ্রহণ করে। খঞ্জনি ও ঢোল বাদক গেরুয়া রঙের পোশাক পরিধান করে। ব্যবহৃত যন্ত্র হলো ঢোল, খঞ্জনি, হারমোনিয়াম আড়বাঁশি, কাঁস, মন্দিরা, খোমক, দোতারা খোল বা মৃদঙ্গ ইত্যাদি।

পরিবেশনের কৌশল

মঞ্চে যন্ত্রের তালে তালে প্রথমে শিল্পীবৃন্দ প্রবেশ করে দুইজন পটচিত্র ধরে পিছনে দাঁড়ায়। একজন খঞ্জনি ও ১জন ঢোল নিয়ে মূল গায়কের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যন্ত্রে প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ দেয়। দুই পাশে ৩জন করে মোট ৬ (ছয়) জন দোহার দেশীয় যন্ত্র নিয়ে সুর ও যন্ত্র অনুষঙ্গ দেয়। মূল গায়ক কাহিনি ধারাবাহিকভাবে মুখে এবং সুরে সুরে বয়ান করেন। সুরে বয়ানের ক্ষেত্রে দোহারগণ সাথে সাথে সুর ধরে গান গায়। সাধারণত কাহিনিকে সংক্ষিপ্ত বিষয় যথা ৩০-৪০ মিনিটের স্থায়িত্বে নির্মাণ ও পরিবেশন করা হয়। যন্ত্রের তালে কাহিনির প্রয়োজনে ছোট ছোট অঙ্গভঙ্গি যেটাকে পটনাচ বলা হয়- পটগানে দেখা যায়।[৪৬]

আনুষ্ঠানিক সংগীত

১

ওগো প্রাণ সজনী একাকিনী কেন বা গেলাম জল আনিতে
দেখলাম রক্তবরণ ভুবনমোহন- মন চলে না গৃহে যেতে॥
একাকিনী গেলাম ঘাটে- দেখলাম পুষ্করিণী এটে
রূপ যেন বিজলী ছোটে- দেখলাম সেরূপ কটাক্ষেতে
মনঃপ্রাণ নিল চোরে- হরিরূপ চক্ষে হেরে
দিবানিশি গুন গুন স্বরে- প্রাণ কাঁদে তাঁর বিরহেতে॥ ঐ
দেখে এলাম কি অপরূপ জীবনে দেখি নাই সেইরূপ
দেখে সেই রূপের স্বরূপ- পারি না আর ভুলিতে।
যেদিকে ফিরাই আঁখি- হরিময় সেই দিক দেখি
তবে ঝরঝর ঝরে আঁখি- বুক ভাসে চখের জলেতে॥ ঐ
শুধু গৌর রূপ নয় কখন- ভিতরেতে রক্ত বরণ

www.pathagar.com

দেখে সেই রূপের কিরণ- চিক লেগেছে চক্ষেতে
তড়িত বিদ্যুতের মতো- ঝলক দেয় অবিরত
আমার প্রাণ হয়েছে ওষ্ঠাগত- দেখতে চায় সে প্রাণ নাথে॥ ঐ
গোসাই মহানন্দের এই মিনতি করবো আমরা হরিপতি
গুরুপদে হবে আরতি- পারবি তারে ধরিতে
ডেকে কয় তারকচন্দ্র- অশ্বিনী তোর কপাল মন্দ
হরিচাঁদের পদ বিন্দু- ভজলি না সংসারে মেতে॥ ঐ

২

যেমন মলিনামুখী চাতকিনি পাখি জলদ বান্ধববিনে
যেন না হেরি চন্দ্রিমা বদনে কালিমা চকোরিণী নিশিদিনে॥
সখী! আজি তেমনি ধারা- বিনে মনোচোরা–সদা ঝরে দুটি আঁখি।
দিলে যে জ্বালা কেশবে- সয়েছি সেসবে- আরকি আছে বাকি।
সখী! যে বাঁশির সুরে- মনঃপ্রাণ হরে- ভুলাতে কুলকামিনী
ঐ শুনলো সঙ্গিনী- সে বাঁশির ধ্বনি- ঠিক যেন বজ্রের ধ্বনি॥
সখী! দেখ দেখ চেয়ে দাঁড়িয়ে কালিয়ে- মাথায় মোহন চূড়া
যেন মৃদু সমীরণে- সুধীর গমনে- নবঘনে করে উড়া॥
বনের বনফুল মালা- খসাইয়া কালা- মেরেছে আমার গায়
যেন করে নবঘন- শিলা বরিষন–তেমনি লেগেছে আমায়॥[৪৭]

১০. হালুই গান

এ অঞ্চলে লোকসংগীতের আরও একটি উল্লেখযোগ্য ধারা হলো হালুই গান। পৌষ মাসের শেষের দিকে যুবক ছেলেমেয়েরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমনের নতুন ধান, নগদ অর্থ সংগ্রহ করে এবং শেষের দিনে এ সমস্ত চাল দিয়ে বনভোজনের আয়োজন করে। এই ধান সংগ্রহ করার সময় দলবদ্ধভাবে এই গান গেয়ে থাকে। এ গানের বাদ্যযন্ত্রগুলো হলো : সিঙ্গেল বাঁশির হারমোনিয়াম, তোতা বাঁশি, অষ্টক ঢোল এবং লাঠি বা ছড়া।

গায়নরীতি

এ গানে একজন থাকে দলনেতা। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে এ গান পরিবেশন করা হয়ে থাকে। কোনো বাড়ি ঢুকবার সময় দলনেতা একটি ছড়া বলেন। আর পেছনে সবাই (৫-৭জন) হালুই বলে সায় দেয়। এরপর প্রধান গায়ক গান পরিবেশন করেন এবং দলের অন্য সদস্যরা শুধুমাত্র গানের গোড়ার চরণ বা স্থায়ী অংশটুকুতে গলা মেলান।

ছড়া

ছিয়ে নড়ে ছিয়ে নড়ে- হালুই
ঝুপ ঝুপোয়ে টাহা পড়ে-হালুই
এট্টা টাহা পালাম রে-হালুই

www.pathagar.com

বান বাড়ি গেলাম রে-হালুই
তার দেহে বড় আশা-হালুই
বান বাড়ি ঘুঘুর বাসা-হালুই
আয় আশা পরসে-হালুই
নেওয়া বাগুন ধরসে-হালুই
নেওয়া বাগুনির চিকিন বিচি-হালুই
দাও ধান দু-চার খুচি-হালুই
দাও ধান পায়ে যাই-হালুই
বাস্তের নামে ফুল জলে বাড়োই-হালুই

অর্থ : ছিয়ে-ছিঁকে, টাহা-টাকা, এট্টা-একটি, ধরসে-ধরেছে, বাস্তের-বাড়ি।

১

ওরে মাধব পার করে দাও বেলা নাই
মিথিলাতে যাবো আমি দাঁড়াবার আর সময় নাই
শুনো শুনো ওরে মাধব ভাগ্যের সীমা নাই
তোমায় লয়ে পার হইবে আজ গোলকের গুসাই॥
গঙ্গা বলে আইগো দিদি দেখিবি এক রূপ
ভাসিয়া উঠিল গঙ্গা মকর বাহিনী
সকালে উঠিয়া রাজা হাতে দিবে দড়ি
বলে দেখি স্বর্ণ নৌকা কোথা থেকে পেলি॥

অর্থ : আইগো-এসো।[৪৮]

২

আরে শোনেন সবে ভক্তি ভরে করি নিবেদন
মুক্কিম বাবুর কিসতির কতা শোনবেন দিয়া মন॥
মুক্কিম বাবু চ্যান করিত শানবাঁধা ঘাটে
ঘাড়ে গামছা হাতে ঘটি চ্যান করিতে যান
এ্যামন সুময় দুই চাপরাসি হাতে দড়ি দেয়
হাতে দিল হাত রশি পায়ে দিলো বেড়ি
ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গ্যালো ফরিদপুরের বাড়ি
ওরে ফরিদপুরের বাড়ি নয়রে ফরিদপুরের জেলা
মুক্কিমের মা কাঁইন্দে সানে ফাছাড় খাইয়ে
মুক্কিমের মেয়ে কাঁইন্দে আর বুঝি আসপে না বাবা
চ্যাপটা সন্দেশ নিয়ে॥[৪৯]

অর্থ : কিসতির-গল্প, কতা-কথা, চ্যান-গোসল, চাপড়াসি-পুলিশ, ফাছাড়-পিছন দিকে পড়ে যাওয়া, আসপে-আসবে, কাইন্দে-কেঁদে।

এ উপজেলার দিঘলিয়া ইউনিয়নের আকরাবাড়ির গ্রামের সন্তোষ কুমার বিশ্বাসের (৫৫) হালুইগানের একটি দল রয়েছে। তার দলে রয়েছেন একই গ্রামের গোবিন্দ পাল, শান্তি

www.pathagar.com

রাম পাল, সুভাস পাল ও কৃষ্ণ সরকারসহ অনেকে। নওয়াগ্রাম ইউনিয়নের রায়গ্রামের বিধান গাছি (৪০), অনিল বিশ্বাস (৪৫), যুধিষ্ঠির বিশ্বাস (৪৫) মৌসুমে হালুই গান গেয়ে থাকেন। লোহাগড়া ইউনিয়নের কামঠানা গ্রামে হালুই গানের একটি দল রয়েছে। ইতনা ইউনিয়নের ইতনা, দৌলতপুর, লোহাগড়া পৌরসভার গোপিনাথপুর গ্রামে হালুই গানের দল থাকলেও গত কয়েক বছর ধরে হালুই গান হচ্ছে না। পৌষ মাসের শেষের দিকে দলবেঁধে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে চাল ও নগদ অর্থ সংগ্রহ করে পৌষের শেষ দিনে খিচুড়ি রান্না হয় ও আনন্দ করে।[৫০]

১

ওগো শোনো সবে ভক্তিভাবে করি নিবেদন
নতুন একটা হালুই আমি করিতেছি বর্ণন॥
অমর হইবেন বলে রাবণ দুরাচার
সীতাকে রাখিল নিয়ে হাঁড়ির ভিতর॥
একদিনেতে মন্দাদারী দেখিতে পাইলো
শক্র বলে সাগরের জলে ভাসাইল॥
ভাসিয়ে বাঁধিল হাঁড়ি জনকের চরে
শতেক হাল জুড়ে জনক জমি চাষ করে॥
ফালে সীতা পাইয়ে বড় সন্তুষ্ট হইলো
আদরে আহ্লাদে তারে পালন করিলো॥
সবে বলে সীতা দেবী কন্যা জনকের
গোলাম বলে তা মানি না কন্যা রাবণের॥
এই পর্যন্ত এই পাঁচালি খ্যান্ত দেয়া যায়।
অন্য স্তরে যাব আমরা করেন গো বিদায়॥

২

ওগো যশোদা কৌশল্যা রানি বড়ই ভাগ্যবান
তাহার ঘরে জন্ম নিল কৃষ্ণ বলরাম॥
রানি এসে বলে কৃষ্ণ ননি খাইল কে।
আমি তো খাই নাই ননি বলাই খেয়েছে॥
এই কথা শুনিয়া রানি বাঁধলেন কৃষ্ণের হাত
লম্ফ দিয়ে ধরে কৃষ্ণ শ্রীকদম্বের ডাল॥
এমন যে কদম্বের গাছটি, গাছটি নাহি হেলে
পাপিষ্ঠ কদম্বের গাছ পড়ে হেলে দুলে॥
শোনো শোনো শোনো মাগো তোমারে জানাই
আর ননি করবে না চুরি তোমার কানাই।
এই কথা শুনে রানি ছেড়ে দিল তারে
বুকেতে জড়ায়ে ধরে মুখে চুম্বন করে॥
এই পর্যন্ত এ পাঁচালি শেষ করে যাই
টাকা পয়সা কিছু দিন অন্য বাড়ি যাই॥[৫১]

www.pathagar.com

৩
ওগো কলি কালে ঝি বউয়েরা কলি অবতার
পালকি থেকে নেমে বলে কোন্ ঘর আমার।
ছোট ঘরে যাবো না বড় ঘরে যাবো
বড় ঘরে যায়ে আমি দুটি কথা কবো।
দুটি কথা বলে আমি আলাদা হয়ে যাবো
আলাদা হয়ে যায়ে আমি দুধে ভাতে খাবো।
এই বলিয়া এ বাড়ির গান ইতি টেনে যাই
বাস্তু ঠাকুরের নামে কিছু সাহায্য দেন সবাই॥[৫২]

৪
নয়ন মেলো কথা বলো ওগো গুণের ভাই
কাঁদুক সীতা অশোক বনে চল দেশে যাই॥
ঐ ওরে –সীতা গেলে সীতা পাব প্রতি ঘরে ঘরে
ওরে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ হারালে ভাই বলিবো কারে॥
ঐ ওরে – বিমাতা মন্ত্রণা করে পাঠাইলো বন
বন হতে হরিলো সীতা পাপিষ্ঠ রাবণ॥
ঐ ওরে – পিতৃসত্য পালিবারে এসেছিলাম বন
তুমি ভাইডি আমার সাথে ছিলে এতক্ষণ।
ঐ ওরে – আমায় তুমি কাঁটা দিয়ে যেওনাক ভাই
তোমাহারা হলে আমি বাঁচিতে না চাই॥
ঐ ওরে –এই পর্যন্ত জানি সায়ার গাহি বাড়ি বাড়ি
ওস্তাদ মোদের বিপীন সরকার বাহিরডাঙ্গা বাড়ি
ঐ ওরে –আমরা কজন মিলেমিশে হালুই গেয়ে ফিরি
ধান দিবা কি চাউল দিবা আন তাড়াতাড়ি॥[৫৩]

১১. তলই হরির লুট ও বাঁধুটি গান

কালিয়া উপজেলার মাউলী গ্রামে বাঁধুটি (বান্ধাটি) গান নামে এক প্রকার গানের প্রচলন আছে। এ গানটি অনেক কাল আগে থেকে প্রচলিত। যে আমলে চিকিৎসা ব্যবস্থার তেমন প্রসার হয়নি, আর গ্রামে তো নয়ই, সেই আমলে কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ওজনের সমপরিমাণ ভোগ (এ ভোগ সামগ্রীতে ডাব, নারিকেল, কলা, আরও বিভিন্ন ফলাদিসহ বাতাসা ও অন্যান্য দ্রব্য) দেয়া হতো। এটি অবশ্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ হওয়ার পরই দেয়া হতো। এরকম অনুষ্ঠানকে বলা হতো তলই হরির লুট। এই অনুষ্ঠানে যে গান পরিবেশিত হতো তাকেই বলা হয়েছে বাঁধুটি গান। এ গানগুলো পূর্ব রচিতও হতো আবার তাৎক্ষণিক রচিতও হতো। আমরা এ জাতীয় গানের নমুনা দেবার চেষ্টা করছি।

১
রাধার প্রেমানন্দে মেতেছে চাঁদ,

www.pathagar.com

গৌরাঙ্গ রায় হরি বলে নয়ন জলে বুক ভেসে যায়
গৌরাঙ্গ রা রা রা রা রা রা
ওমনি ধা বলে পড়লো ধুলোয়।
ছিল কাল অঙ্গ এবে গৌরাঙ্গ ওই ঠেকে রাধার প্রেম দায়
হরি বলে নয়ন জলে বুক ভেসে যায়॥
নাচে নিত্যানন্দ রায় রামনন্দ ও তার মধ্যে
নাচে চাঁদ গৌরাঙ্গ রায়
হরি বলে নয়ন জলে বুক ভেসে যায়॥
(আখর)
ধন্য ধন্য ধন্যরে নিতাই এমন দয়াল দেখি নাই
ওসে মার খেয়ে দয়া করে তার গুণের সীমা নাই॥

২

হরিবল বল রসনা বদনে
মন তোর আর হবে না মানব জনম ভাঙলে মাথা পাষাণে॥
মন তোর সকলি ভ্রান্ত হরিনাম মহামন্ত্র
কলির জীব উদ্ধারিতে যায় নিত্যানন্দ।
নিতাই আনিয়ে গোলকের বস্তু বিলাচ্ছে আপন মনে॥
হারে জগাই মাধাই যে ছিলো তার হাতে
নিতাই মার খেলো মার খেয়ে দয়াল নিতাই হরি নাম দিলো॥
জগাই বলে ওরে মাধাই ধর নিতাইর চরণে
আমার দয়াল নিতাইর চরণে ধরবে
নিতার মার খাইয়ে দয়া করে ধরবে
আমার নিতাইয়ের মতো দয়াল নাইরে
নিতাইর সোনার অঙ্গে রুধির ধারা
নিতাইর জপমালা ভেসে যায়॥

৩

ওরে কে গেলো হরিনাম শুনায়ে আমি আগে জানি না
এ নাম মধুর চেয়ে মিঠা লাগে গো এ নাম অন্তে যেন ভুলি না॥
হরিনাম শুনায়ে কোথায় গেলো ওরে
কোথায় গিয়ে লুকাইলো খুঁজে পেলাম না॥
যে নামেতে মনঃপ্রাণ হরে
রাখিতাম হৃদয় মাঝারে ছেড়ে দিতাম না॥
যে নামেতে শিব ভিখারি
ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী নারদ বৈরাগী
এ নাম শ্মশানে মশানে যাবে গো
নামের অন্ত কিছু পেলাম না॥

মণিকান্ত বিশ্বাস পিতা : হাজারীলাল বিশ্বাস, মাতা : বাণীরানী বিশ্বাস, মাউলী।

www.pathagar.com

১২. বালা বা শ্লোক গান

চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে দিঘলিয়া, রায়গ্রাম, লোহাগড়া, কৃষ্ণপুর, নারানদিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বালা বা শ্লোক গান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সাধারণত ৭ থেকে ৮ ফুট লম্বা চিকন কাঠের ওপরে শিবসহ ১০জন দেবতার মূর্তি খোদাই করা পাট মাথায় নিয়ে চৈত্র মাসের শেষের কয়েকদিন ধুপ, ধুনো দিয়ে পূজার্চনা করা হয়। পটের সম্মুখে ঢাকের তালে তালে নেচে নেচে যে শ্লোক গান গাওয়া হয় তাকে বালা বা শ্লোক গান বলে। সাধারণত দিনে ও সন্ধ্যার দিকে এই গান গেয়ে থাকে। লোহাগড়া পৌরসভার নারানদিয়া গ্রামের শিক্ষক সত্যেন মাস্টারের (৫০) অষ্টক গানের দল রয়েছে। প্রতি বছর চৈত্র মাসে তার নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামে অষ্টক ও বালা গান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তার কাছে বেশ কিছু অষ্টক এবং বালা গান সংরক্ষিত রয়েছে।[৫৪]

বালা গান

১

শিব বলে পার্বতী শোন দিয়া মন
পথমুক্ত হইলো না যাইবো কেমন।
জয়া বিজয়া চলে চন্দন ছিটে দিয়ে
হরগৌরী গঙ্গায় বলে হরষিত হয়ে।
অমক জায়গার অমক তুমি কোথা আগমন
শিব যাচ্ছে স্নান করতে পথে কি কারণ।
অমক জায়গার ওমক তুমি অমক জায়গায় যাও
শিবের ধ্বনি দিয়ে সবে স্নান করতে যাও।

২

আগেতে চালান ধুপ সূর্য অধিপতি
ভূত নাচে প্রেত নাচে দিয়ে করতালি।
ইন্দ্র ইররানি দিয়ে করতাল
সবার কল্যাণে ধুপ লও এইবার॥
উত্তরে চালান ধুপ পর্বত হিমালয়
কৈলাশ ছাড়িয়ে দেবী আসরেতে আয়॥
আয় আয় কালিকা দেবী রক্তবর্ণ হয়ে
ধুপ পোড়া খাও তোমার কার্তিক গণেশ লয়ে॥
পশ্চিমে চালান ধুপ ঠাকুর জগন্নাথ
পুণ্য জন্ম না হইলে যে চড়েছে রথে॥
এসো এসো জগন্নাথ এসে দেও বর
ঢাকির কল্যাণে ধুপ লও এইবার॥

দক্ষিণে চালান ধুপ গঙ্গা ভগীরথি
ভগীরত আনিল গঙ্গা বংশ উদ্ধারিতে॥
এসো এসো জগন্নাথ এসে দাও বর
দৈলতের কপালে ধুপ লও এইবার॥[৫৫]

www.pathagar.com

১৩. হ্যাঁচড়া পূজার গান

ফাল্গুন মাস যাওয়ার ৭ দিন বা ৩ দিন আগে সূর্য ওঠার পূর্বে এ অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের ছোট ছেলেমেয়েরা ও মায়েরা বন্য ফুল তুলে কুলোয় সাজিয়ে গ্রামের শীতলা তলায় (যেখানে বারোয়ারি পূজা হয়) রোগ, শোক থেকে মুক্তি চেয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে। এসময় তারা ছন্দে ছন্দে এক ধরনের প্রচলিত গান করে। যাকে হ্যাঁচড়া পূজার গান বলে।

১
ওঠো ওঠো সূর্য ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়ে
তোমারে বোরে নেবো তেল সিন্দুর দিয়ে॥
ওঠো ওঠো সূর্য ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়ে
তোমারে বোরে নেবো ফুল চন্দন দিয়ে॥
ওঠো ওঠো সূর্য ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়ে
তোমারে বোরে নেবো তিল তুলসি দিয়ে॥
এবার বছর যাওরে গুসাই খোস পাচড়া নিয়ে
সামনের বছর আইসরে গুসাই শঙ্খ শাড়ি পরে॥
অর্থ : বোরে-বরণ করা, আইসরে-আসা।

২
হ্যাঁচড়া মাগিলো তোর ফ্যাচড়া চুল
তাইতে দেবো আমি ভাটি ফুল॥
ভাটি ফুলে যদি না ন্যায় মন
তাইতে দেবো আমি ঘাস ফুল॥
ঘাস ফুলে যদি না ন্যায় মন
তাইতে দেবো আমি সোজনে ফুল॥
সোজনে ফুলে যদি না ন্যায় মন
তাইতে দেবো আমি লেবু ফুল॥
অর্থ : হ্যাঁচড়া-এলোমেলো, ন্যায়-নেওয়া।[৫৬]

ক. সংগীত পরিবেশন কৌশল ও দর্শকদের প্রতিক্রিয়া

মাটি অথবা খাট পেতে আবার কাঠের মঞ্চ তৈরি করে অনুষ্ঠান করা হয়। মঞ্চের এক পাশে মহিলারা এবং বাকি তিন পাশে পুরুষেরা বসে। মঞ্চ সাধারণত মধ্যখানে বা আসরের এক পাশে তৈরি করা হয়। এক সময় এসব গান শুধু মুখ দিয়ে গাওয়া হয়ে থাকলেও যুগের পরিবর্তনে মাইক ও প্রয়োজনীয় সাউন্ড ব্যবহার করা হয়। গ্রাম বাংলার জনপ্রিয় এসব গান দর্শকশ্রোতারা গান শুনে সন্তুষ্ট হলে আবার ভালো না লাগলেও ভালোমন্দ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এসব শিল্পীদের কারো বাচনিক ভঙ্গি ভালো। কোনো কোনো দলের পোশাক পরিচ্ছদ খুবই ভালো এবং এক ধরনের পোশাক থাকে। কারো কণ্ঠ সুরেলা। কারো উপস্থাপনার ঢং এবং অঙ্গভঙ্গি চমৎকার।[৫৭]

www.pathagar.com

১৪. কর্মসংগীত ও উৎসব-অনুষ্ঠানের গান

কোনো কিছু করার আগে সেই কাজের জন্য সুরে সুরে মঙ্গল প্রার্থনা করতে যে গান গাওয়া হয় তাকে আনুষ্ঠানিক সংগীত বলে। এক সময় লোহাগড়া উপজেলার ইতনা, মলিকপুর, কোটাকোলসহ বিভিন্ন ইউনিয়নে আমন ধান কাটবার সময় কৃষক নতুন পোশাক পরে উঠানে কাস্তে, ধামা, কুলো রেখে এক জায়গায় আগুন ধরিয়ে ধান, দূর্বা, ফুল নিয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করে গান গাওয়ার প্রচলন ছিল। উৎসব বা অনুষ্ঠানে গীত সংগীত বলতে বিয়ের গীত, নামকীর্তন, পদাবলি কীর্তন, খাতনা উপলক্ষ্যে গীত ইত্যাদি গানকে বোঝায়। সারিগান, ছাদ পিটানো গান কর্মসংগীতের মধ্যে পড়ে। আবার উৎসবের সময়ও সারিগান পরিবেশন করে থাকে। এসব আনুষ্ঠানিক সংগীত, কর্মসংগীত ও উৎসব-অনুষ্ঠানে গীত সংগীত এ উপজেলার লোহাগড়া, দিঘলিয়া, কোলা দিঘলিয়া, লুটিয়া, ইতনা, জয়পুর, রায়গ্রাম, রামপুরাসহ বিভিন্ন গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।[৫৮]

ছাদ পিটানো গান

১

ও যারে ছেইড়ে এলাম অবহেলা করে
সেকি আবার আসিবে ফিরে।
পুষা পাকি ছেইড়ে দিয়ে
শূন্য খাঁচা লইয়ে
আমি আর কতদিন কাঁদবো রে
দেশ-দেশান্তরী হইয়ে।
সে ছিলো মোর বুকের মানিক রে
একন চলে সে সাপের সিরে,
ও সেকি আবার আসিবে ফিরে।
সে ছিলো মোর আদার গরের
পুণ্য মাসের চাঁদ,
আমি আর কতদিন রাকবো রে
অন্তরে বুজাইয়া রে।[৫৯]

অর্থ : ছেইড়ে-ছেড়ে, পাকি-পাখি, একন-এখন, আদার-আঁধার, রাকবোরে-রাখবো, গরের-ঘর, বুজাইয়ারে-বোঝানো, সাপের সিরে-এখানে শত্রু বোঝানো হচ্ছে ইত্যাদি।

২

তুমি আর ডাইকো না
পানের বন্দু আমার নাম ধরিয়া।
অনেক রাতে গুম বেঙ্গে যায়
তুমার ডাক শুনিয়া রে বন্দু
তোমার ডাক শুনিয়া।

www.pathagar.com

ফুলে যকন মদু তাকে
কতই বমর আসে,
ফুলের মদু শুকাই গেলে
কেউ না ভালোবাসে।
তুমি মদু খাইয়া যাও উড়িয়া
বেইমানই করিয়া বন্দু বেইমানই করিয়া।
তুমি আর ডাইকো না
পানের বন্দু আমার নাম ধরিয়া।
অনেক রাতে গুম বেঙ্গে যায়
তোমায় ডাক শুনিয়ারে বন্দু
তোমার ডাক শুনিয়া।
তাই পরদেছি কয় মন উতালা
পরদেছি কয় মন উতালা।[৬০]

অর্থ : ডাইক-ডাকা, পানের-প্রাণের, বেঙ্গে-ভেঙে, গুম-ঘুম, তুমার-তোমার, যকন-যখন, মদু-মধু বমর-ভ্রমর, উরিয়া-উড়িয়া, পরদেছি-বিদেশী ইত্যাদি।

৩

কোকিলা আর ডাকিস নারে ঐ কদম ডালে
বন্দু মুক্ত গলার মালা,
সুক বসন্ত সুকের কালে।
বন্দু নাইরে পাশে
মুক্ত গলার হার ছিড়ে পড়লো রে জলে।
অর্থ : সুক-সুখ, বন্দু-বন্ধু ইত্যাদি।[৬১]

গায়নরীতি

এখানে সংগীত একক ও দলীয় উভয়ভাবেই গাওয়া হয়। যেমন : একক সংগীত হলে কোনো অনুষ্ঠানে শিল্পী মঞ্চে উঠে একা মাইক্রোফোন ব্যবহার করে গান করেন। গানকে শ্রুতিমধুর করার জন্য যন্ত্রীরা অনুষঙ্গ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তাকে সাহায্য করে। আবার দলীয় বা কোরাস সংগীত হলে শিল্পীদের সবাই একই সাথে গান করেন। এখানে শিল্পীদের সবাই মাইক্রোফোন ব্যবহার করে থাকেন। একক সংগীতের মতো দলীয় সংগীতকে শ্রুতিমধুর করার জন্য যন্ত্রীরা অনুষঙ্গ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকেন। জারি, কবি, ভাব বা এ জাতীয় গানে একজন প্রধান গায়ক থাকেন। চার থেকে পাঁচজন থাকেন দোহার বা সহশিল্পী। এখানে প্রধান গায়ক মূল গান পরিবেশন করেন। সেখানে দোহাররা গানের নির্দিষ্ট চরণ গেয়ে প্রধান গায়ককে সাহায্য করে থাকেন। অবশ্য এসব গানে দোহাররা মিলিত কণ্ঠে আলাদাভাবেও গান পরিবেশন করে

www.pathagar.com

থাকেন। অষ্টক, সারিসহ এ জাতীয় গানে শিল্পী নৃত্য ও গান একই সাথে পরিবেশন করেন।[৬২]

পোশাক

এ অঞ্চলে আনুষ্ঠানিক ও ধর্ম সংগীতসহ বিভিন্ন সংগীতে নির্দিষ্ট পোশাক পরেন। যেমন : হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় সংগীতে শিল্পীরা নির্দিষ্ট রং-এর পোশাক পরেন। জারি, কবি, ভাব, গাজির গীতসহ এ জাতীয় গানে শিল্পীরা পাজামা ও পাঞ্জাবি পরেন। মহিলা শিল্পীরা শাড়ি পরেন। এছাড়া এ অঞ্চলে বাউলগানের শিল্পীরা কখনও কখনও গেরুয়া পোশাক পরেন। তবে বাইরের বাউল শিল্পীরা যখন এ অঞ্চলে গান গাইতে আসেন তখন অবশ্য তারা গেরুয়া পোশাক পরেই গান পরিবেশন করে থাকেন। একক গানে নির্দিষ্ট পোশাক না থাকলেও বিভিন্ন পার্বণ ও জাতীয় দিবসকে সামনে রেখে নির্দিষ্ট পোশাক পরে গান গাইতে হয়। তবে একক গানে নির্দিষ্ট পোশাক বাধ্যতামূলক নয়।[৬৩]

ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের নাম

বিভিন্ন সংগীতে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয়। তবে অধিকাংশ সংগীতেই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। এসব গানে যেসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয় সেগুলো হলো হারমোনিয়াম, তবলা, খোল, করতাল, প্রেমজুড়ি, ঢোল, আড়বাঁশি, দোতারা, তোতাবাঁশি, একতারা, খমক, তবলা, অষ্টক ঢোল, কাঁস, কর্নেট, ক্লার্নেট ইত্যাদি।[৬৪]

শারীরিক কলাকৌশল

জারি, কবি, ভাব, গাজির গীত, পালাগানসহ এ ধরনের গানে শিল্পীদের বাচনভঙ্গিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। আবার পোশাকের বিষয়টিও কম নয়। এখানে কারো বাচনিক ভঙ্গি ভালো। আবার কারো পোশাক ভালো। বাউল গানে অঙ্গভঙ্গি এবং হেলে দুলে গান করতে হয়।

গান গাওয়ার সময় কারো উপস্থাপনার ঢং এবং শারীরিক অঙ্গভঙ্গি চমৎকার। এই জাতীয় গানের অনেকে একটু অঙ্গভঙ্গি এবং হেলে দুলে গান পরিবেশন করে প্রধান শিল্পীকে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। অষ্টক, সারিগানে খুব রঙিন পোশাকের আধিক্য এবং মেকআপ লক্ষ করা যায়। এখানে শিল্পীরা নেচে নেচে হেলেদুলে গান করেন।[৬৫]

১৫. জারিগান

জারিগানের ফর্ম ও গায়নরীতি

নড়াইলে সর্বাধিক জনপ্রিয় লোকসংগীত জারি। জানা যায়, ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে এ জেলায় জারিগানের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এদেশের জারিগানের প্রবাদপুরুষ প্রয়াত মোসলেম উদ্দিন জারিগানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে এক্ষেত্রে আলাদা ঘরানা সৃষ্টি করেছেন।

www.pathagar.com

জারি একটি দলীয় সংগীত। ১. বয়াতি : বয়াতি জারিদলের মূল গায়ক। কখনও কখনও এদের জারির সরকার বলা হয়। ২. দোহার : যন্ত্রী-অনুষঙ্গী এবং সুর-অনুষঙ্গীদের দোহার বা পাইল বলা হয়। দোহার বা পাইলের মধ্যে একজন থাকে প্রধান দোহার, যাকে ডানের পাইল নামে আখ্যায়িত করা হয়। ৩. ব্যবহৃত যন্ত্র : হারমোনিয়াম, ঢোল, কাঁস, মন্দিরা, আড় বাঁশি, সানাই/কর্নেট। প্রাচীন জারিতে খুঞ্জুরি নামক যন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। একটি দলে যন্ত্রী থাকেন ৩-৪ জন।

জারিগানের আসরের প্রথমে প্রধান দোহার বা ডানের পাইল অন্যান্য সহযোগী দোহার নিয়ে জারিগানের শুরুতে সৃষ্টিকর্তার নামে বন্দনাগীতি পরিবেশন করেন; এরপর স্রষ্টার উদ্দেশ্যে সকল দোহার মিলে উপস্থিত শ্রোতা দর্শকদের মাঝে মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে একটি ভজনগীতি পরিবেশন করেন। জারিগানের ভাষায় এ গানটিকে ধুয়ো গান নামে আখ্যায়িত করা হয়। এটাও বন্দনা আসর নামে পরিচিত। দুইদলের দোহাররা বন্দনা আসর শেষ করার পর তৃতীয়বার প্রধান গায়ক মঞ্চে আসেন। তিনি দর্শকশ্রোতাদের সাথে সালাম বিনিময় করে একটি বন্দনাগীতি পরিবেশন করবেন। এর পর তিনি সুরে সুরে কিংবা পাঁচালির ঢংয়ে প্রতিপক্ষকে ঐ দিনের জারি পালার প্রশ্ন করবেন এবং প্রশ্নের বিষয় সম্পর্কে কিছু বয়ান করবেন। এক পর্যায়ে প্রতিপক্ষকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে আসবেন। এরপর প্রতিপক্ষ মঞ্চে গিয়ে একই ধারায় জারি পরিবেশন করবেন।

জারিগান কমপক্ষে দু'টি জারি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক বিতর্ক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। জারিগানের আঙ্গিক মোতাবেক একজন বয়াতি প্রশ্ন করেন এবং প্রতিপক্ষের বয়াতি এর জবাব প্রদান করেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গানের পালা নির্ধারণ করা হয়। যেমন : হিন্দু-মুসলিম, নারী-পুরুষ, শরিয়ত-মারেফত, গুরু-শিষ্য, ইত্যাদি। আমাদের ধর্মীয় ও সমাজ জীবনে এ গানের যেমন গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি এ গান এদেশের মাটি ও মানুষের কথা বলে। গ্রামের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী এখনও এ গানকে তাদের প্রাণের গান হিসেবে পছন্দ করেন। জেলার তাঁরাপুর গ্রামের জারি সম্রাট মোসলেম বয়াতির সুযোগ্য সন্তান জারিয়াল অধ্যক্ষ রওশন আলী এ জারিগানকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। বর্তমানে এ উপজেলায় বেশ কয়েকজন জারিগানের সাথে যুক্ত রয়েছেন। অবশ্য এদেশের ঐতিহ্যবাহী অন্যান্য লোকসংগীতের ধারার মতোই এ জারি গানও আজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে।[৬৬]

জারিগান ফর্ম

ক. মূল বয়াতি একজন।

খ. যন্ত্রী ও দিশাধারী বা দোহার ৬-৭ জন।

গ. ঢোল, হারমোনিয়াম, সানাই, কর্নেট, কাঁস, মন্দিরা ইত্যাদি যন্ত্রের ব্যবহার আছে।

ঘ. পোশাক সাধারণত পাজামা-পাঞ্জাবি কিংবা পাজামা-ফতুয়া। তবে দোহারদের থাকে একই ধরনের পোশাক।

আসরের বিবরণ

www.pathagar.com

দোহারগণ বা সকল দিশাধারী ও যন্ত্রী মিলে প্রথম একত্রে কিছুক্ষণ গান পরিবেশন করে। যে নির্দিষ্ট মঞ্চে গান পরিবেশন করে এবং যে মঞ্চকে ঘিরে চারিদিকে শ্রোতাবৃন্দ উপবিষ্ট থাকেন সাধারণত ঐ জায়গাটিকে গানের আসর বলে। প্রথম আসরে সমবেত ভাবে ২-৪টা মিউজিক পরিবেশিত হয়। এরপর একটা বন্দনা বা উপাসনা গীতি সমবেতভাবে গীত হয়। এরপর একজন দিশাধারী কিংবা দোহার দাঁড়িয়ে জারি পালার কিছু অংশ পরিবেশন করেন। ঐ দোহারকে প্রধান দোহার বা ডাইনের পাইল বলা হয়। সাধারণত দুইটা পক্ষ বা দুইটা দলের মাঝে জারিগান প্রতিযোগিতামূলক ভাবে পরিবেশিত হয়। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে মুখের ভাষায়, গানের সুরে কিংবা দিশাধারী বা দোহারদের মাধ্যমে প্রশ্নের ধুয়োগানের দ্বারা প্রশ্ন করেন এবং যথারীতি সকল নিয়ম মেনে অর্থাৎ একটা ভজন গানের দ্বারা বন্দনা শেষ করেন। উপস্থিত দর্শক, শ্রোতাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রশ্নের ধারা শুরু করা হয়। স্কুল কিংবা ক্লাবের মাঠ, কিংবা বাজারে অথবা খেলার মাঠ বা বিশেষ কোনো অব্যবহৃত ভিটে, এমনকি কখনও ফসলি ক্ষেতে ফসল তোলার পর সাধারণত জারিগানের আসর জমানো হয়। আসরের চারিদিকে লোকজন বসার ব্যবস্থা থাকতেই হবে। একদিকে একটু দূরে নানা রঙের দোকান পাঠ সাজাবার ব্যবস্থা থাকবে। তক্তা দিয়ে তৈরি ৪ খানা বাংলা খাট কিংবা তক্তা পরপর বসিয়ে খাটের আকৃতি করে ১৮-২০ সাইজের আসর তৈরি করা হয়। আসরের উপর মাদুর কিংবা শতরঞ্জি বিছিয়ে তারপর শিল্পীদের বসার জন্য বিছানার চাদরের ব্যবস্থা করতে হয়। খাটের চারকোনায় বাঁশ দিয়ে তৈরি প্যান্ডেল তৈরি হয়। মোট ব্যবস্থাকে জারি খোলা বলে। প্যান্ডেল নানা রঙিন কাপড়ে সাজানো হয়। এরপর বিদ্যুৎ কিংবা জেনারেটর কিংবা হ্যাজাক লাইটের সাহায্যে আলোকশয্যা তৈরি করা হয়। যাতে বয়াতি চারিদিকে চেয়ে শ্রোতাদের দেখতে পারেন–অন্যদিকে শ্রোতারাও যেন বয়াতিকে দেখতে পারেন। শ্রোতাদের মাথার উপর কাপড়ের সিলিং থাকে। বেশি শ্রোতা হলে সকলকে সিলিং-এর নিচে বসার ব্যবস্থা করা দুষ্কর হয়। ভালো মাইকের ব্যবস্থা থাকে। তবে আগে মাইকের ব্যবহার ছিল না। বয়াতি টাই স্পিকার এবং দোহারগণ স্ট্যান্ড স্পিকার ব্যবহার করে। বয়াতি শ্রোতাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশ্নের জবাব দেন, সুর সংগীত কিংবা পাঁচালির মাধ্যমে। পাঁচালি হলো পদ্যছন্দে ব্যবহৃত ভাষা যা প্রধান বয়াতি বা শিল্পী দাঁড়িয়ে সরস কৌতুকের মাধ্যমে শ্রোতাদের মনোরঞ্জনে এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বা অন্য বিষয় উপস্থাপনে ব্যবহার করেন। মূল গায়ক বা বয়াতি দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ছোট ছোট নাচের মাধ্যমে গান, জারি পালা কাহিনির বর্ণনা কিংবা সংলাপ বিনিময় করেন। জারিগানে বর্ণনা কৌশল যার যত হৃদয়গ্রাহী কিংবা দর্শকশ্রোতার মনঃপূত হয় ঐ শিল্পী বা বয়াতির সুনাম তত বেশি হয়। সাধারণত রাতের বেলা জারিগান অনুষ্ঠিত হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এলাকার মানুষের জীবনযাপন ও চাহিদার ভিত্তিতে বিকেল হতে গভীর রাত পর্যন্ত ও এ গান পরিবেশিত হয়।[৬৭]

জারিগান : (কামরুল বয়াতির জারিগানের বন্দনা)

জারিগানের শিল্পী কামরুল বয়াতি (৪৫), আকরাবাড়ি, দিঘলিয়া ইউনিয়ন, দীর্ঘ ৩০ বছর কবি ও জারিগানের সাথে জড়িত। জারিগান করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

www.pathagar.com

তার গুরু ছিলেন নড়াইলের প্রখ্যাত কবিয়াল বিজয় সরকার। দীর্ঘ ১৬-১৭ বছর তাঁর দোহার হিসেবে কাজ করেছেন।

বন্দনা

আকাম শহরে বাড়ি রিকাপ শহরে ঘর
সেই ঘরে আছে বেটি পরম সুন্দর।
পরম সুন্দর বেটি আজম রাজার মেয়ে
সাধের যৌবন যায় বয়ে তার না হয়েছে বিয়ে।
যৌবন তার রসে ভরা করেছে টলমল
আম জাম দেখলে যেমন জিবেই আসে জল।
এক দিবসে চন্দ্রাবতী সুখে নিদ্রা যায়
খোয়াবেতে হচ্ছে বিয়ে দেখিবারে পায়।
স্বপ্নে দেখিয়া বিবি ভাবে মনে মন
স্বামীর সঙ্গেতে আমি হইবো মিলন।
হেলিয়া দুলিয়া বিবি স্বামীর নিকট যায়
ফুল বিছানায় শয়ন করে জয়নাল মীরের বায়।
স্বামীর বামে শুয়ে বিবি মনের কথা কয়
আমাকে ভুলিয়ে বন্ধু রয়েছ কোথায়।
তোমাকে পেয়ে আমি জ্বালাই মনের বাতি
কত কষ্ট পেলাম আমি শীতকালে রাতি।
শীতকালে রাতি যাহার পতি ঘরে নাই
তার মতো অভাগিনি আর এ জগতে নাই।
এইভাবে যখন রাত পোহাইয়া যায়
আকাম শহরে চন্দ্রাবতী জয়নাল মদিনায়।
স্বপ্নে দেখিয়া বিবি ভাবি মনে মন
দাসীগণের কাছে বলে স্বপ্নের বিবরণ।
ডাইনে বামে পঞ্চদাসী চন্দ্রাবতী ছিল
তার মধ্যে মিনা দাসী লাগায় বড় কলহ।
চন্দ্রা বলে প্রাণদাসী তোমায় দিচ্ছি কইয়ে
গত নিশি স্বপ্নের মাঝে আমার হইছে বিয়ে।
বিয়ে হলি শুন বলি পতি ঘরে নাই
বল দেখি প্রাণদাসী কোথায় তারে পাই।
ফুলের মধু খেয়ে চোর চোলে গেছে বাড়ি
যৌবন রসে ভিজল সখী আমার পরান শাড়ি।
ভিজল শাড়ি হইলাম নারী (বিধবা) একি প্রাণে সয়
একা শুইলে ঘুম আসে না ফুলের বিছানায়।
ফুল বিছানায় বন্ধুর সাথে যদি থাকা যায়

www.pathagar.com

বিনা কাঁথায় গরম ছোটে হাত বুলাইলে গায়।
শুণদাসী শুণরাশি স্বপ্নের বিবরণ
এই বিয়ের কিবা মানে তাই বল এখন।
মিনা বলছে চন্দ্রাবতী তোমায় যদি বলি
কাল সকালে বাড়ি থেকে তাড়াইবে সকলি।
মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে হবে যে তোমার
মক্কার শহরের পাশে মদিনাতে ঘর।[৬৮]
অর্থ : বেটি-কন্যা, খোয়াবেতে-স্বপ্নেতে, কইয়ে-বলে, বুলাইলে-স্পর্শ।

জারিগান : সোহরাব রোস্তম
মূল গল্প : ফেরদৌসি (শাহানামা)
রূপান্তর মৃত চারণকবি মোসলেম উদ্দিন

কায়কাউস নামে বাদশাহ ইরান শহরে,
বড়ই জবরদস্তি ছিল মুল্লুকের উপরে।
সিপাহসালাতে ছিলেন যত নওজোয়ান,
সবার মাঝে প্রধান ছিল বীর রোস্তম পাহলান।
মকর আল্লার মকর ভবে কেবা বুঝতে পারে,
একদিন রোস্তম গেল শিকার করিবারে।
জঙ্গলে-২ রোস্তম ঘুরিয়া বেড়ায়,
খোদার খেলা কোনো বনে শিকার নাহি পায়।
ঘুরিতে ঘুরিতে রাত্রি দ্বি-প্রহর হলো,
সামানশাহ বাদশার দেশে উপনীত হলো।
ক্লান্ত হয়ে ঘুমায় একটা গাছেরই ছায়ায়,
বুলগিরিয়া নামে ঘোড়া গাছে বান্ধা রয়।

সামানশাহ বাদশার কন্যা নাম তহমিনা,
জলকেলিতে সখী সনে হইলো রওয়ানা।
আচানক নজর তাহার দক্ষিণে পড়িলো,
আকাশের চন্দ্র যেন জমিনে হেরিলো।
রোস্তমেরই রূপ দেখে মন মুগ্ধ হলো তার,
মনে ভাবে কেমন করে এর পাইবো দিদার।
সঙ্গে ছিল হীরাদাসী তারে ডাক দিয়ে কয়,
মনের কথা দাসী আজি বলিবো তোমায়।
শুন দাসী প্রাণ উদাসী যদি ভালোবাস,
ঐ ঘোড়া নিয়ে সত্বর করে আমার সঙ্গে আস।
এতেক বলে ঘোড়া নিয়ে দুইজনা চলে,
গোপনে ঘোড়া বেঁন্ধে রাখলো অন্দর মহলে,

www.pathagar.com

পাহলান ঘুম হতে জাগিয়া উঠিলো,
ঘোড়াটি না পেয়ে বড় চিন্তাযুক্ত হলো।
বনে বনে তালাস করে কোথা নাহি পায়,
শেষে বাদশাহর দরবারে যেয়ে আরজ জানায়।
আপনার দেশে এসে আমি আমার ঘোড়াটি হারাই,
ইহার ন্যায্যবিচার আমি আপনার কাছে চাই।
বাদশাহ বলে পাহলান আমাকে বাতাও,
কি নাম তোমার কোথায় বাড়ি আমাকে জানাও।
রোস্তম বলে আমার নামটি রোস্তম পাহলান,
পূর্ব-পুরুষ হলো আমার সাম-নুরীমান।
বাদশাহ বলে পাহলাম আমি এই আরজ করি,
অতিথি হইয়া অদ্য থাকুন আমার বাড়ি।
আগামীকাল ঘোড়ার সন্ধান করে দেয়া হবে,
ঘোড়া নিয়ে খুশি হয়ে আপন দেশে যাবে।
এতেক শুনে পাহলান সে বড়ই খুশি হলো,
অতিথি হইয়া ঐদিন বাদশাহর বাড়ি রলো।
গোলামে করিলো খেদমত বাদশাহী সামেনা,
সোনার পালঙ্কের উপর পাতিলো বিছানা।
আগর কুমকুম কত গন্ধ ছিটাইলো,
তার উপরে পাহলানকে বসতে আসন দিলো।
বাদশাই খানা খেয়ে রোস্তম বড় পরিতুষ্ট হলো,
শয়ন করতে বীরবর এক পালঙ্কেতে গেলো।
ঈশার নামাজ পড়ে যখন সালাম ফিরায়,
তার বাম তরফে এক রমণীকে দেখিবারে পায়।
তহমিনার রূপ দেখে তার মনোমুগ্ধ হলো,
হাত তুলিয়া আল্লাহর কাছে মোনাজাত করিলো।
ওগো আল্লাহ বারিতায়ালা পাক-দয়াময়,
আমার জীবনসঙ্গিনী যেন ঐ রমণী হয়।
একমনে একদেলে মোনাজাত করে,
কবুল হইলো দোয়া আল্লারই দরবারে।
পুব আকাশে ভোরের বাঁশি বাজিয়া উঠিলো,
অজু করে ঋজু হয়ে রোস্তম নামাজ পড়িলো।
নামাজ পড়ে রোস্তম বীর সে বাদশাহর কাছে যায়,
আপনার মনের কথা বাদশাহকে জানায়।
রোস্তমেরই কথা শুনে বাদশাহ আলমপনা,
রাজি হলো শাদি দিতে তার কন্যা তহমিনা।
ইসলামি শরিয়ত মতে বিবাহ হইলো,

www.pathagar.com

খুশিতে গোজরান তারা করিতে লাগিলো।

বাসর বিবরণ (ত্রিপদী ছন্দ)

সেদিন বসন্ত আসিলো, মাধবী ফুটিলো, দখিনা মলয় সদা বহে,
সতীপতির সনেতে, কামোদ-বনেতে, মিলন বাসরে সুখে রহে।
দেখিতে দেখিতে, আঁখিতে আঁখিতে, ভাসিলো পীড়িতেরই রস,
বদনে বদনে, রস আস্বাদনে, উভয়ে উভয় হলো বস।
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেম আলিঙ্গনে, ফুটিলো প্রেমেরই জ্যোতি,
বলে মোসলেম কবি, পীড়িতেরই ছবি, জ্বলন্ত রহিবে খ্যাতি।
ফুলেরই মাঝারে, ভ্রমরা গুঞ্জরে, ফুল হতে হয় ফলের গঠন,
খোদারই আদেশে, পুত্র এক আসে, হলো নারীর গর্ভেরই লক্ষণ।
প্রথম মাসেতে, তহমিনা জানিতে, অরুচি মুখে বমি আসে,
কিছু খাইতে চাহে না, মুখে ভালো লাগে না, তুষ্ট থাকে শুধু লেবুর রসে।
কাঁচামরিচ পান্থাভাত, খাইতে বড় লাগে স্বাদ, কচি আম খাইতে লাগে মজা,
রসগোল্লা রসে ভেজা, চানাচুর আর পাপড়ি ভাজা, বেশি মজা খাইতে কলাই ভাজা।
দ্বিতীয় মাসেতে, কাজল বরণ আঁখিতে, ভ্রূযুগল কৃষ্ণবরণ হয়,
তৃতীয় মাসেতে, কমলকান্তিতে, সোহাগিণীর ভ্রান্তি ভেঙে যায়।
চতুর্থ মাসেতে, কোমল অঙ্গেতে, কনকবর্ণের পড়ে রেখা,
পঞ্চম মাসেতে, আলস্য অঙ্গেতে থাকিতে ভালোবাসে একা।

পঞ্চম মাসের গর্ভবতী বিবি তহমিনা,
ভাগ্যলেখা কেউ দেখে না আগে কেউ জানে না।
ইরান হতে এক কাসেদ এসে পাহলানকে কয়,
ইরান রাজ্য বুঝি ধ্বংস হয়ে যায়।

পাহলান বিহনে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে,
ইরান বাদশাহর অনুমতি তোমার এখন যেতে হবে।
এই কথা রোস্তম বীর যখনে শুনিলো,
তহমিনার কাছে গিয়ে বলিতে লাগিলো।
বিদায় দাও বিদায় দাও আমায় ওগো বিবিজান.
এখন আমায়, যেতে হবে শহর ও ইরান।
তোমারই গর্ভে যদি বেটা পয়দা হবে,
এই নাও রক্ষাকবজ ঐ পুত্রের হাতে বেঁন্ধে দেবে।
এই কবজ ঐ পুত্রের হাতে যতক্ষণ থাকিবে,
দেব-দানব রক্ষ-যক্ষ সব ভয়েতে পালাবে।
বিলম্ব সহে না বিবি এখন আমি যাই,
তুমি হেথা থাক সদাই ভেবে মালিক সাঁই।
এই কথা তহমিনা যখনে শুনিলো,

www.pathagar.com

সকরুণ ভাবে দেবী কাঁদিয়া উঠিলো।
তহমিনা বলে আমার আত্মনিবেদন,
পতি বিনে কেমনে বাঁচবে অবলার যৌবন।
এহেন যৌবনকালে যার স্বামী রয় না পাশে,
বল দেখি অবলার প্রাণ ধৈর্য মানে কিসে?
পতিধন পতিপ্রাণ পতি কুলমান,
পতির চরণের নিচে বেহেস্তের বাগান।
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রিয়তম একটু দাঁড়াও তুমি,
জন্মের মতো তোমার রূপ আজ দেখে রাখি আমি।
যাও যাও প্রাণনাথগো করি নাকো মানা,
অবলা সরলা বালা ভুলিয়া যেও না।

বিদায় নিয়ে রোস্তম বীর সে ঘোড়ায় ছওয়ার হলো,
মার-মার শব্দে ঘোড়া ইরানে পৌছিলো।
ইরানেতে গিয়ে দেখে বেসুমার লস্কর,
রণবাদ্য বাজে কত ময়দানের মাঝার।
বিপদ বুঝে রোস্তম বীর সে আল্লাকে স্মরিলো,
হাত তুলিয়া আল্লাহর কাছে মোনাজাত করিলো।
ওগো আল্লাহ বারিতায়ালা কুদরত কামাল,
বিপদের কাণ্ডারি তোর নাম জলিল-ও জালাল।
কত কত মহাপাপী তোমার নামে ত্বরে,
তুমি যারে বাঁচাও তারে কেবা মারতে পারে।
আবরাহা বাদশাহ একবার কাবাকে ঘিরিলো,
আবাবীল পাখির হাতে সকলি মরিলো।
জারজিস নামে ছিল একজন পয়গম্বার,
মরিয়া প্রাণ পেয়েছিল এক হাজারবার।
এইরূপ করে দোয়া আল্লাহরই হুজুরে,
হাকিলো হায়দারি হাঁক ময়দানের মাঝারে।
হাঁকের আওয়াজ শুনিয়া যত পাহলান,
সকলে ভাবিলো এলো রোস্তম পাহলান।
ঠারাঠারি করে সবাই পলাইয়া গেলো,
সম্মুখে পিছনে রোস্তম তাড়াতে লাগিলো।
হাতের কাছে রোস্তম বীর সে যারে ধরা পায়,
একটি আছাড় মেরে তারে কোলাব্যাঙ বানায়।
কিল ঘুসি মেরে কারো চক্ষু করে কানা,
কেউ বলে তার হুজুর আমি আর যুদ্ধ করবো না।

থাবা খেয়ে কতো সৈন্যের মুখ বেকাইয়া যায়,

www.pathagar.com

বলিতে পারে না কথা হা করিয়া রয়।
এইভাবে তামাম সৈন্য ভাগিয়া পালালো,
রোস্তমের জয়পতাকা আকাশে উড়িলো।
আসিয়া তুরানের বাদশাহ সালাম জানাইলো,
অধিকৃত ইরান রাজ্য ফিরাইয়া দিলো।
তুরান বাদশাহর মনের আগুন মনে গেলো রয়ে,
মনে হলে মনের আগুন জ্বলে রয়ে রয়ে।
মনে ভাবে কখন যদি সময় আমার হয়,
প্রতিশোধ প্রতিশোধ লইবো নিশ্চয়।
এদিক তহমিনা বাপের বাড়ি ভাবে পরওয়ারে,
দিনের শেষে রাত্রি আসে দিন গণনা করে।
গণনাতে নয়মাস দশদিন পূর্ণ হলো,
শুভদিনে পুত্ররতন একটা প্রসব করিলো।
সুন্দর বদন দীর্ঘ কমল আকার,
সোহরাব বলিয়া নাম রাখিলো তাহার।
রক্ষা কবজ বেঁন্ধে দিলো তার দক্ষিণ বাহুতে,
আর কি করিবে তারে দুরন্ত রাহুতে।
সোহরাবকে দেখে তহমিনা মনে মনে ভাবে,
সোহরাবের জন্মের কথা যদি রোস্তম বীর শুনিবে।
সোহরাবকে নিয়ে যাবে আমার কোল শূন্য করে,
সোহরাবকে হারাইয়ে আমি কেমনে থাকবো ঘরে।
মেয়ের কথা বলি যদি আসবে না সে আর,
সোহরাবকে কোলে নিয়ে সুখে করবো ঘর।
এসব কথা ভেবে বিবি চিঠি এক পাঠালো,
ইরানে রোস্তমের কাছে ঐ চিঠি পৌঁছিলো।
চিঠি পড়ে রোস্তম বীর বড় মৌন হয়ে রলো।
মনে মনে বীরবর সে বেজার হইলো।
আর ফিরবো না সামান রাজ্যে রোস্তম করে পণ,
বেজার হইলো শুনে পাক নিরঞ্জন।
কত খেলা খেলায় আল্লাহ এ খেলার বাজারে,
শশীকলার মতো সোহরাব দিনে দিনে বাড়ে।
পাঁচ বছর বয়সে তাহার খড়ি দিলো হাতে,
বিদ্যাশিক্ষা করতে তাকে পাঠায় মাদ্রাসাতে।
তিরিশ দিনে তিরিশ সেপারা করিলো আদায়,
যে কর্মে যায়রে সোহরাব সে কর্মে পায় জয়।
ভুবন মোহন বীর মহাশক্তি ধরে,
তারে দেখে তহমিনার আনন্দ না ধরে।

www.pathagar.com

একদিনে সোহরাব জঙ্গি মায়ের কাছে বসে,
পিতার কথা জিজ্ঞাসিলো মনেরই আপশোসে।
কহ মাগো পিতা আমার আছে কিনা আছে,
কি নাম কোথায় বাড়ি কোন্ বা দেশে আছে।
তহমিনা বলে বাবা তোমারে জানাই,
তোমার পিতার মতো পিতা দুনিয়ার আর নাই।
ভুবন মোহন বীর মহাশক্তি বান,
অদ্বিতীয় যোদ্ধা বীর নাম রোস্তম পাহলান।
তোমার পিতার মতো পিতা দুনিয়ায় কার আছে,
সাম নূরীমানের বংশে জন্ম সে লয়েছে।

কায়কাউস বাদশা আছে ইরানের শহরে,
তোমার পিতা চাকরি করে বাদশাহরই দরবারে।
এই কথা সোহরাব জঙ্গি যখনে শুনিলো,
বারুদের ঘরে যেন আগুন লেগে গেলো।
বলে দুনিয়ার সব বাদশাহ আমারই অধীন
আমার পিতা চাকরি করে হয়ে পরাধীন।
বীরের পুত্র বীর আমি কারে করি ভয়,
এখনই ঐ ইরান রাজ্য করবো আমি জয়।
পিতাকে বসাবো ইরান সিংহাসনের পরে,
গোলাম বানাবো পিতার কাছে কায়কাউস বাদশারে।
সোহরাব বলে জননীগো বিদায় কর তুমি,
পিতার তালাস করতে মাগো ইরান যাবো আমি।
তহমিনা বলে বাবা তোমাকে বলতেছি,
তোমার জন্মকথা তোমার পিতার কাছে নাহিকো বলেছি।
মনে ভাবলাম তোমার কথা যদি দেব কয়ে,
আমার কোল শূন্য করে তোমার পিতা তোমায় যাবে নিয়ে।
সেই জন্য মিথ্যে বলেছি পিতাকে তোমার,
এবার গর্ভে কন্যাসন্তান জন্মেছে আমার।
এই খবর পেয়ে বীর তার জবাব নাহি দিলো,
আজ দীর্ঘদিন হইলো গত ফিরে না আসিলো।
অজানা অচেনা ভাবে কেমনে সেথা যাবে,
ঘরে বসে থাক পিতার সমাচার পাইবে।
অজানা অচেনা ভাবে যদি সেথা যাবে,
পাহলানের হাতে শেষে পরান হারাবে।

তোমার মরণ খবর যদি আমি কানে শুনি,
সর্বহারা হয়ে বাবজান হবো পাগলিনি।

www.pathagar.com

যেওনা যেওনা বাবা ইরানে যেওনা,
ইরানেতে গেলে তোমায় আর ফিরে পাবো না।
সোহরাব বলে জননীগো তোমারে জানাই,
পিতার হাতে মরি যদি দুঃখ তাতে নাই।
পিতার হাতে পুত্র মরে পায় বেহেস্তী সুখ,
মরার আগে দেখবো আমার আব্বাজানের মুখ।
না শুনিবো প্রবোধ মাগো না শুনিবো মানা,
আমার ভাগ্যে যা লেখা আছে কেউ খণ্ডাতে পারবে না।
সোহরাব বলে জননীগো বিদায় নিলাম আমি,
আল্লাহ ভেবে সামান গাঁয়ে থাক মাগো তুমি।
ঢাল-তলোয়ার লয়ে সোহরাব ঘোড়ায় ছওয়ার হলো,
মার মার হুংকারে ঘোড়া ইরানে পৌছিলো।
শিবির করিয়া সোহরাব রহিলো সেথায়,
এই সংবাদ তুরান বাদশাহ জানিবারে পায়।
তার অনেকদিনের নেভা আগুন জ্বলিয়া উঠিলো,
মনে মনে তুরান বাদশাহ একটা ফন্দি ঘুছাইলো।
ভাবে এক গুলিতে পাখি এবার দুইটিকে মারিবো,
রোস্তম বীরের সংবাদ একে জানিতে না দেবো।
অজানা ভাবেতে যখন মহাযুদ্ধ হবে,
যে মরে আর যে বাঁচে আমার ব্যথা যাবে।
এতেক ভেবে তুরান বাদশাহ চলিলো শিবিরে,
একটা খবর জানায় গিয়ে সৈন্যদিগের তরে।

সোহরাব জঙ্গি আসিয়াছে সবাকে জানাই,
সোহরাবের মতো যোদ্ধা এ বিশ্বে কেউ নাই।
ভুবন মোহন বীর সে মহা শক্তিবান,
একা সোহরাব কবজ করবে ইরান আর তুরান।
আমাদের সেরা বীর রোস্তম পাহলান,
সোহরাবের হাতে যদি হারায় সে পরান।
তবে মোদের বলবীর্য সকল টুটে যাবে,
নাকমলা কানমলা কত কিযে খাবে।
সেইজন্য সবাইকে আজ করে যাচ্ছি মানা,
খবরদার রোস্তমের খবর কেউ বলে দিও না।
এই বলে তুরান বাদশাহ ফিরে গেলো ঘরে,
চিঠি লিখে জানায় সোহরাব কায়কাউস বাদশারে।
চিঠি লিখে বাদশাহর কাছে সমাচার জানায়,
ভালো যদি চাও রাজতক্ত ছাড়ো এ সময়।
ভালো যদি চাহ তবে রাজতক্ত ছাড়ো,

www.pathagar.com

নহে যদি পার তবে এসো যুদ্ধ কর।
ক্ষত লিখে সোহরাব জঙ্গি কাসেদ এক পাঠালো,
কায়কাউস বাদশাহর হুজুরে সমাচার পৌঁছিলো।
চিঠি পড়ে বাদশাহ নামদার জ্বলিয়া উঠিলো,
সাজসৈন্য বলে বাদশাহ নিশান উড়াইলো।
সাজ সৈন্য বলে যখন নিশান উড়াইলো,
নওজোয়ান এক লক্ষ সৈন্য সাজিয়া চলিলো।
ইরানের সৈন্য লাগে সব পাঁয়তারা করিতে,
সোহরাব সোহরাব বলে লাগিলো ডাকিতে।
সোহরাব সোহরাব বলে ডাকিতে লাগিলো,
ডাক শুনিয়া সোহরাব জঙ্গি সাজিয়া আসিলো।
ছেড়ে তাজ হাতে অসি ইজার পরিধান,
যুদ্ধে এলো সোহরাব যেন আজরাইল সমান।
সোহরাবের মূর্তি দেখে কত পাহলান,
পলাইয়া ঘরে গিয়ে খায় গুয়োপান।
হাতের কাছে সোহরাব জঙ্গি যারে ধরা পায়,
একটি আছাড় মেরে তারে কোলাব্যাঙ বানায়।
কিলঘুসি মেরে কারো চক্ষু করলো কানা,
কেহ বলে হুজুর আমি আর যুদ্ধ করবো না।
ছেড়ে দাও চিরকাল তোমার গোলাম হয়ে রবো,
প্রয়োজনে তোমার পায়ের জুতা মাথায় করে নেবো।
লাথি মেরে কত সৈন্য দূরে ফেলে দেয়,
ফুটবলেরই মতো কেউ কেউ গড়াগড়ি খায়।
কাউকে বা ধরে ভূমিতে মারে এক আছাড়,
জমিনাতে পড়ে কারো চূর্ণ হলো হাড়।
এই ভাবে তামাম সৈন্য ভাগিয়া পলালো,
সোহরাবের বিজয় নিশান আকাশে উড়িলো।
সোহরাবের যুদ্ধ দেখে যত পাহলান,
চিন্তাযুক্ত হইলো সবাই হইলো পেরেশান।
বাদশাহের দরবারে গিয়ে আর্জি পেশ করে,
সোহরাবের মতো যোদ্ধা নেই বিশ্ব সংসারে।
সৈন্যদিগের কথা শুনে বাদশাহ আলমপনা,
অচিরে দরবারে সভা করিলো ঘোষণা।

পাত্রমিত্র উজির-নাজির নিয়ে এক সভা করে,
কি করা কর্তব্য তাই গবেষণা করে।
যুদ্ধ কৌশল নিয়ে কথা অনেক সময় হয়,
এমন সময় রোস্তম বীর পৌঁছিলো সেথায়।

www.pathagar.com

আসুন আসুন করে সবাই তারে হাত ধরে বসালো,
পুষ্পমাল্যে পাহলানকে ভূষিত করিলো।
এমন সময় তুরান বাদশাহ রুস্তম বীরকে কয়,
সোহরাব জঙ্গি আসিয়াছে বলি আপনায়।
কত কত বীর যোদ্ধা দেখছি বিশ্বের ঠাঁই,
কিন্তু সোহরাবের মতো যোদ্ধা বিশ্বে দেখি নাই।
আমি একদিন ফকির বেশে গেলাম তাহার ঠাঁই,
তার রূপ দেখে হুজুর আমি আমাতে আর নাই।
রণ মদে মত্ত সদা মুখে অট্টহাসি,
এক হাতে বর্ম তাহার আরেক হাতে অসি।
আমার কাছে জিজ্ঞাসিলো সোহরাব পাহলান,
রোস্তম বীরের শিবির কোথা জান কি সন্ধান?
ছলনা করিয়া আমি বলেছি তার ঠাঁই,
শিকার করতে গেছেন তিনি শিবিরেতে নাই।
কাজ করতে হবে মোদের অগ্রপশ্চাত ভেবে,
ফাঁদ পেতে আকাশের চাঁন ধরে আনতে হবে।
না জানি নসিবে এবার কি যেন কি হয়,
সোহরাবের হাতে যদি জীবন মোদের যায়।
হাসিয়া উঠিলো রোস্তম বাদশারই কথায়,
বলে ভয় করলে কি মরণের হাত কভু বাঁচা যায়।

বাঁচামরা একই কথা সমানে সমান,
কাল সকালে দেখবো সোহরাব কেমন পাহলান।
এই বলে রোস্তম বীর সে শয়নেতে গেলো,
চিন্তায় চিন্তায় রাত পোহালো ঘুম না হইলো।
রজনী প্রভাত হলো, হইলো ফজর,
ওজুর পানি এনে দিলো তারে গোলাম নফর,
ওজু করে ঋজু হয়ে নামাজে বসিলো,
নামাজ পড়ে যুদ্ধের সাজ সাজিতে লাগিলো।
যুদ্ধের সাজে সেজে রোস্তম যুদ্ধক্ষেত্রে গেলো,
সোহরাব সোহরাব বলে ডাকিতে লাগিলো।
সোহরাব সোহরাব বলে ডাকিতে লাগিলো,
ডাক শুনিয়া সোহরাব এবার যুদ্ধক্ষেত্রে গেলো।
দূর হতে রোস্তম বীরে সোহরাবের দিক চায়,
যেন তহমিনার মুখের মতো মুখখানি দেখায়।
সোহরাবের মুখ দেখে রোস্তম মনে মনে ভাবে,
নিশ্চয় ঐ ছেলে আমার আপন কেহ হবে।
কেমনে বলবে আপন তারে রোস্তম ভাবে তাই,

www.pathagar.com

কারণ তহমিনা পুত্রের কথা আমায় বলে নাই।
মেয়ের কথা বলিয়াছে রয়েছে স্মরণ,
তবে কি আজ দেখছি আমি মায়ারই স্বপন।
কিসের মায়া রণক্ষেত্রে ঘামিয়া উঠিলো,
আয়-আয় বলে সোহরাবকে সে ডাকিতে লাগিলো।
রোস্তমের সামনে সোহরাব হলো দণ্ডায়মান,
পিতৃজ্ঞান করিয়া সোহরাব সালাম জানান।

সোহরাব বলে কহ বীর তোমার পরিচয়,
তোমার নামটি রোস্তম বীর হইবে নিশ্চয়।
রোস্তম বলে রণক্ষেত্রে কিসের পরিচয়,
পরিচয় হবে, হলে জয় কি পরাজয়।
কোন্ দেশের সিপাই তুমি আমার দেশে এলে,
অকারণে আমার সৈন্য কেন বা মারিলে?
এইবার জানা যাবে তুমি কেমন মহাবীর,
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার সামাল রাখ শির।
এই বলিয়া অতি জোরে তলোয়ার মারিলো,
বর্মধরে সোহরাব জঙ্গি রদ করিয়া দিলো।
সোহরাব ছুড়িলো ওয়ার ঢালেরই উপরে,
আগুনের ফুলকি যেন ওড়ে ঢালের পরে।
তলোয়ারে তলোয়ারে লেগে করে ঝনাঝন,
কেহ নাহি হারে জেতে সমানে সমান।
হেলেদুলে যুদ্ধ করে দেখতে চমৎকার,
সোহরাব জঙ্গি লড়ে যেমন প্রমত্ত কুঞ্জর।
ঘোড়া হতে দুই বীর এবার জমিনায় নামিলো,
বাহু কষাকষি দু'জন করিতে লাগিলো।
সোহরাবের কোমর ধরে রোস্তম মারে টান,
উঠাতে পরাস্ত হলো রোস্তম পাহলান।
রোস্তমেরই কোমর ধরে সোহরাব মারে টান,
শূন্যের পর উঠাইয়ে তারে দেখালো আসমান।
জমিনে ফেলিয়া তারে চাপিয়া ধরিলো,
কোমর হতে খঞ্জর ছুরি বাহির করিলো।
সোহরাব বলে কহ বীর তোমার পরিচয়,
রোস্তম বলে এত কভু বীরের নীতি নয়।
প্রথম যুদ্ধে বীর হয়ে বীর নাহি মারে,
ইরান দেশের নিয়ম এটা ছেড়ে দাও আমারে।
আগামীকাল শেষযুদ্ধ শেষ বোঝাপড়া হবে,
শেষ পরিচয় দিয়ে একজন বিদায় হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

বীরের পুত্র বীর সোহরাব ছেড়ে দিলো তারে,
বাঁশরি বাজাইয়ে তারা চলিলো শিবিরে।
নিশিযোগে রোস্তম বীর সে ভাবে মনে মনে,
যুদ্ধজয়ী সোহরাবকে সে বধিবে কেমনে?
ধর্ম-অধর্ম বিচার হবে আগে কিংবা পরে,
সোহরাবকে হত্যা না করে ফিরিবো না ঘরে।
এই বলিয়া রোস্তম বীরে শয়নেতে গেলো,
চিন্তায় চিন্তায় রাত পোহালো ঘুম না হইলো।
রজনী প্রভাত হলো হইলো ফজর,
ওজুর পানি এনে দিলো তারে গোলাম নফর।
ওজু করে ঋজু হয়ে রোস্তম নামাজ পড়িলো,
নামাজ শেষে যুদ্ধসাজে সাজিতে লাগিলো।
যুদ্ধের পোশাক পরে রোস্তম যুদ্ধের মাঠে গেলো,
সোহরাব সোহরাব বলিয়া ডাকিতে লাগিলো।
নাম ধরিয়া সোহরাব বীরকে ডাকিতে লাগিলো,
ডাক শুনিয়া সোহরাব জঙ্গি রওয়ানা হইলো।
ঘোড়ার ছওয়ার হয়ে সোহরাব যুদ্ধে রওয়ানা হলো,
বিসমিল্লাহ বলিতে তাহার ভুল পড়িয়া গেলো।

বিসমিল্লাহ বলতে মুখে ভুল পড়িয়া গেলো,
পিতাকে মারিতে সোহরাব যুদ্ধক্ষেত্রে গেলো।
যাত্রাকালে গিরগিটি কটকট শব্দ করে,
প্যাঁচা ডাকে কর্কশ সুরে বসে গাছের পরে।
যুদ্ধের মাঠে পৌঁছে সোহরাব-রোস্তমের সামনে,
নানাকথা ভাবে মনে ঐ যুদ্ধেরই ময়দানে।
ঘোড়ার উপর হতে দুই বীর জমিনায় নামিলো,
সামনা সামনি মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইলো।
পদাঘাতে আসমান-জমিন কাঁপে থরথর,
হেলেদুলে যুদ্ধ করে দেখতে চমৎকার।
অকস্মাৎ সোহরাব জঙ্গিকে রোস্তম একটু বে-সামাল দেখিলো,
ঐ ফাঁকে পটকান মারিয়া তারে জমিনে ফেলিলো।
সঙ্গে সঙ্গে খঞ্জর ছুরি তার বক্ষে বসাইলো,
মরলাম গেলাম বলে সোহরাব কাঁদিয়া উঠিলো।
বক্ষ হতে রক্তধারা চলিলো ছুটিয়া,
মরলাম মরলাম বলে সোহরাব উঠিলো কাঁন্দিয়া।
কেঁন্দে বলে করলি বা কি এ কেমন বিচার?
কোন্ বিধাতা গড়লো তোমার পাষাণ কলেরব।

www.pathagar.com

বিদেশেতে মরলাম আমার তাতে নাহি দুখ,
দুঃখ মরার আগে না দেখিলাম আব্বাজানের মুখ।
ঘরে কাঁদবে মা জননী আমার বনে কাঁদবে পাখি,
পুত্রশোকে কাঁদবে পিতা হয়ে বড় দুঃখী।
শোনরে নিষ্ঠুর ইরানি তোমায় যাচ্ছি কয়ে,
আজ হতে চলবে তুমি খুবই সাবধান হয়ে।
কারণ আমার পিতা আমার মরণ খবর যখনে শুনিবে,
তাঁর পুত্র হত্যার প্রতিশোধ সে অবশ্যই লইবে।
রোস্তম বলে কহ ছেলে কেবা তোমার পিতা?
আমায় মারতে পারে ইরানে কার আছে সে যোগ্যতা?
সোহরাব বলে আমার পিতা মহাশক্তিবান,
অদ্বিতীয় যোদ্ধা বীর নাম রোস্তম পাহলান।
রোস্তম বলে কহ ছেলে কহ আমার কাছে,
তোমার পিতার দেওয়া চিহ্ন কিছু কি তোমার কাছে আছে?
সোহরাব বলে পিতার রক্ষাকবজ বান্ধা আমার হাতে,
দেখে যারে নিষ্ঠুর ইরানি আপনার চোখেতে।
এতেক বলে হাতের কবজ খুলিয়া ফেলিলো,
চোখের সামনে কবজ রোস্তম মেলিয়া ধরিলো।
আগাগোড়া কবজখানি পড়িতে লাগিলো,
নিজের নাম অঙ্কিত দেখে রোস্তম কাঁন্দিয়া উঠিলো।
বলে হায়রে পাখি করলাম একি কেন মারলাম ছুরি,
আয়রে আমার প্রাণের সোহরাব তোরে বক্ষে ধরি।
যার তালাসে ঘুড়ে বেড়াও ওরে আব্বাজান,
আমি তোমার সেই পিতা নাম রোস্তম পাহলান।
পিতার নাম শুনিয়া সোহরাব আঁখি মেলে চায়,
পিতার মুখের দিকে চেয়ে এই কথা জানায়।
ধন্য আমি ধন্য আমার মরণে নাই দুখ,
মরার আগে দেখলাম আমার আব্বাজানের মুখ।
সোহরাব বলে পিতা আমি তোমায় যাচ্ছি কয়ে,
আমার মায়ের কসুর ক্ষমা করো তুমি আমার দিকে চেয়ে।

কেননা ঐ জনম দুখির আমি একই পুত্র ছিলাম,
আজ জন্মের মতো তারে ছেড়ে বিদায় যাত্রী হলাম।
সোহরাব বলে বাপজান আমার বুকে হাত বুলাও,
আমায় নবীর কলেমা শুনাইয়ে আজ বিদায় করে দাও।
এতেক শুনে রোস্তম তাহার বক্ষে হাত বুলালো,
লা-ইলাহা ইল্লাল্লা কলেমা জবানে পড়িলো।

www.pathagar.com

তার পরে পড়িলো বার বার মোহাম্মদ রাসুল (সা.)
স্মরণ রাখবেন মুসলমান ভাই যায় না যেন ভুল।
সোহরাবের আঁখির পাতা বন্ধ হলো করলো ইন্তেকাল,
কবি মোসলেম বলে তারে কে ঠেকাবে যারে ধরে কাল।
ভেবে দেখুন দুনিয়ার লোক আপন মানসপটে,
যার ভাগ্যে যা লেখা থাকে তার ভাগ্যে তাই ঘটে।
সোহরাব রোস্তমের জারি হইলো তামাম,
চাঁদবদনে বলুন সবাই আল্লা-নবির নাম॥[৬৭]

১৬. পালাকীর্তন

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের স্বরূপকে কোনো না কোনোভাবে পালায় রূপান্তরিত করে তা বর্ণনার নাম পালাকীর্তন বা গৌরকীর্তন। হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশের মধ্যে এ সংগীতের প্রভাব লক্ষ করা যায়। আনুমানিক ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গৌর কীর্তন নামে পালাকীর্তন আবির্ভূত হয়। এ সময় লোহাগড়া থানার কুন্দশী গ্রামে কৃষ্ণপদ সাহা নামে একজন পালা কীর্তনীয়ার (পদাবলি কীর্তনীয়া) খোঁজ পাওয়া যায়। বর্তমানে এ কীর্তনের প্রচলন যথেষ্ট লক্ষ করা যায় এবং লোহাগড়া পৌরসভার কৃষ্ণপুর গ্রামের রমেশ চন্দ্র সমাদ্দার (৫৫), কাশিপুর ইউনিয়নের অশ্বিনী কুমার গাইন (৭০) নওয়াগ্রাম ইউনিয়নের বাসুদেব বিশ্বাস (৪০) সহ অনেক পালাকীর্তনীয়াকে দেখা যায়। এদের অধিকাংশ জনই পেশা হিসেবে পালাকীর্তন করেন।[৭০]

গায়নরীতি

১. **মূল কীর্তনীয়া** : ইনি পালাকাহিনি বর্ণনা করেন। পদ আলাপ করেন ও কাহিনির বিন্যাসে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ২. **সহশিল্পী** : সর্বপ্রথম ঈশ্বর বন্দনা করেন। সমবেতভাবে, তবে খণ্ড আকারে অর্থাৎ দুইজন সহশিল্পী একজন আগে, একজন পেছনে বন্দনা করেন। এরপর পালা কাহিনি শুরু হয়। ৩. **ব্যবহৃত যন্ত্র ও যন্ত্রী** : খোল, করতাল, আড়বাঁশি, বেহালা, দোতারা ও হারমোনিয়াম-প্রতিটা যন্ত্রের একজন যন্ত্রী থাকে।

১৭. গাজির গান

এ অঞ্চলে মাঝে মধ্যে এখনও গাজির গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। গাজি একজন সাধক পুরুষ। তাকে ভক্তরা পির মানেন। অনেকের বিশ্বাস যশোরের বারোবাজারে আবার কেউ মনে করেন সুন্দরবনে এ পিরের দরগাহ রয়েছে। কথিত আছে গাজি পির অনেক অলৌকিক ক্ষমতাবান ছিলেন। পির গাজি, তার সাগরেদ কালু ও পিরের স্ত্রী চম্পাবতীকে নিয়ে বিভিন্ন কাহিনি সুরে সুরে কাব্যিক ঢংয়ে নেচে নেচে ভক্তবৃন্দ গাজির গীত পরিবেশন করে থাকেন। গ্রামের কোনো পরিবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, সমস্যা, ব্যধি, বিপদে, চাকরি, বিদেশ গমন ইত্যাদির জন্য গান মানত করলে বাড়িতে গাজির গীত

www.pathagar.com

দিয়ে থাকে। হিন্দু ও মুসলিম উভয় পরিবারেই গাজির গীত হয়ে থাকে। লোহাগড়া উপজেলার ইতনা ইউনিয়নের ইতনা গ্রামে গাজির গীতের দল রয়েছে। এ গ্রামের ঝন্টু শেখ (৩০) এ গানের প্রধান গায়ক। এর সাথে রয়েছেন একই গ্রামের মাছুদ শেখ (২৫), ইমরান সরদার (২৫), কালু বাদ্যকর (৩৫), বেলায়েত শেখ (৩০), গণেশ (৩৬), কুমারডাঙ্গা গ্রামের ঢোলবাদক মানিক (৩০), গ্যান্দা (৩০) হারমোনিয়াম বাদকসহ ১২ জনের দল। উপজেলার বিভিন্ন স্থান যেমন মল্লিকপুর, মঙ্গলহাটা, করফা, ঘাঘা, পাচুড়িয়া, পোদ্দারপাড়া, লোহাগড়া, ধানাইড়, শালনগর, দিঘলিয়া, বটিকাবাড়ি, কুমড়িসহ বিভিন্ন গ্রামে প্রতিবছর এ গান পরিবেশিত হয়।

গায়নরীতি

গাজির গীত পালা করে হয়ে থাকে। একজন থাকেন প্রধান গায়ক। একজন থাকে ফাটকিদার। কৌতুকের মধ্য দিয়ে মূল কাহিনি দর্শকশ্রোতাদের শুনিয়ে এ গান উপজীব্য করে তোলা হয়। গাজির গানে প্রশ্নের বিপরীতে কোনো প্রশ্ন করা হয় না।[১০]

তথ্যনির্দেশ

১. হেফজুর রহমান খোশবু, নড়াইল চৌরাস্তা, নড়াইল, তারিখ : ২৯.৯.১১
২. *মুহম্মদ আব্দুল হাই রচনাবলী* ৩ খণ্ড, ঢাকা বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃ. ৫৬৮
৩. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ৬ষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ, মার্চ ২০০৫ পৃ. ১১৪৮
৪. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসঙ্গীত সারিগান*, বাংলা একডেমী, ১৪০৪, পৃ. ২
৫. শফিউদ্দিন তালুকদার, 'টাঙ্গাইল জেলার নৌকাবাইচ ও সারি গান' *স্থানীয় ইতিহাস*, সংখ্যা-৪, জুন ২০০৯, হেরিটেজ আরকাইভস অব বাংলাদেশ হিসট্রি ট্রাস্ট, পৃ. ১৩৬
৬. *মুহম্মদ আব্দুল হাই রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮
৭. গোবিন্দ পাল (৩০) আকরাবাড়ি, দিঘলিয়া ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, সংগ্রহের তারিখ : ২৫.০১.১২
৮. তহমীনা, স্বামী : সামাউন মোল্যা, গৃহিণী, তারাপুর, সিংগাশোলপুর, নড়াইল, ০২.১০.১১
৯. শাহীনুর, স্বামী : মোশারফ হোসেন খান, গৃহিণী, তারাপুর, সিংগাশোলপুর, নড়াইল, নীপা ফারহানা ঊর্মী, স্বামী : হিরাদুল ইসলাম আওলিয়া, কালিয়া, তারিখ : ০২.১০.১১,
১০. দীপা ফারজানা শর্মী, স্বামী : মোয়াজ্জেম হোসেন, বাগডাঙ্গা, নড়াইল, ০২.১০.১১
১১. আমেনা বিবি (৫২), স্বামী : ওলিয়ার রহমান শেখ, চাঁদপুর, কালিয়া, ১০.০৯.২০১১
১২. নার্গিস বেগম (৩১), স্বামী : শেখ ইদ্রিচ আলী, ছোট কালিয়া, কালিয়া, ১৮.০৯.২০১১
১৩. সাংবাদিক সিদ্দিকুর রহমান (৪৫), সালেহা বেগম (৬০), সবেদা বেগম (৫৫), লোহাগড়া শহর, লোহাগড়া পৌরসভা, সংগ্রহের তারিখ : ০৫.০২.১২, আঞ্জুমান আরা খানম (৪৭), শিক্ষক, ইতনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ ১৩.০২.১২
১৪. হরিদাস সরকার (৫৫), জয়পুর গ্রাম, জয়পুর ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, সংগ্রহের তারিখ : ০৫.০২.১২

www.pathagar.com

১৫. সবিতা বিশ্বাস (৫০), চাকুলিয়া, নলদী ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ ০৭.০২.১২
১৬. লোকশিল্পী সরদার গোলাম মোস্তফা (৫৮), প্রধান শিক্ষক, ছাতরা সরকারি প্রাইমারি স্কুল, লোহাগড়া পৌরসভা, তারিখ : ২৫.০১.১২
১৭. আঞ্জুমান আরা খানম (৪৭), শিক্ষক, ইতনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ইতনা, লোহাগড়া, তারিখ : ১২.০২.১২
১৮. পোউনো বেগম (৫০), শিয়েরবর, শালনগর ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ২৩.০১.১২
১৯. জোহরা বেগম (৬০), শিয়েরবর, শালনগর ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ২৩.০১.১২
২০. হরিদাস সরকার (৫৫), জয়পুর গ্রাম, জয়পুর ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, সংগ্রহের তারিখ : ০৫.০২.১২
২১. লোকশিল্পী সরদার গোলাম মোস্তফা (৫৮), প্রধান শিক্ষক, ছাতরা সরকারি প্রাইমারি বিদ্যালয়, লোহাগড়া পৌরসভা, তারিখ : ৩০.০১.১২
২২. রওশন আলী, অধ্যক্ষ, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ মহাবিদ্যালয়, নড়াইল
২৩. চারণকবি গোলাম কিবরিয়া, বি.এ, মির্জাপুর, মির্জাপুর আড়পাড়া, নড়াইল
২৪. মো. সাইফুল ইসলাম বয়াতি, গ্রাম : চাকই, ডাকঘর : বাশুয়ারী, উপজেলা ও জেলা নড়াইল, তারিখ : ০৪.১০.১১
২৫. মো. সোহরাব হোসেন ফকির, মছিমদিয়া, পৌরসভা, নড়াইল। সংস্কৃতিকর্মী, লাল বাউল সম্প্রদায়, তারিখ : ০৭.১০.১১
২৬. মো. রওশন আলী, অধ্যক্ষ বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ মহাবিদ্যালয়, নড়াইল
২৭. মো. আবুবক্কার, ভওয়াখালি, নড়াইল, তারিখ : ২.১০.১১
২৮. কাজল অধিকারী, পিতা মৃত : বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী, কেউটিয়া, ২৪ পরগনা, পশ্চিমবাংলা, ভারত, তারিখ : ৪.১২.১১
২৯. চারণকবি গোলাম কিবরিয়া, বি.এ, মির্জাপুর, মির্জাপুর আড়পাড়া, নড়াইল, ইসলামি বাগ্মী, তারিখ : ১১.১০.১১
৩০. জয়নাল আবেদীন (৫৫), গ্রাম : ইতনা, ইউনিয়ন : ইতনা, তারিখ : ০২.০২.১২, খায়ের শেখ (৫৫) গ্রাম : ইতনা, ইউনিয়ন : ইতনা, তারিখ : ০২.০২.১২
৩১. আবুল খায়ের শেখ (৫৫), গ্রাম : ইতনা, ইতনা ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ১৩.০২.১২
৩২. মো. রওশন আলী, অধ্যক্ষ, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ মহাবিদ্যালয়, নড়াইল।
৩৩. সৈয়দ আশরাফ আলী, লোহাগড়া,নড়াইল। ১৪.১০.১১
৩৪. সঞ্জয় বিশ্বাস (৫০),পিতা : মধুসূদন বিশ্বাস, মাতা : পাখা বিশ্বাস, ছোট কালিয়া, ০১.০৯.২০১১
৩৫. আব্দুল খালেক (কুটি মিয়া), (১০০ বছর ৮ মাস), পিতা- আব্দুল ইসলাম শেখ, ছোট কালিয়া, নড়াইল, তারিখ : ২৪.০৮.২০১১
৩৬. জোহরা বেগম (৬০), শিয়েরবর, শালনগর ইউনিয়ন,। লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ২৩.০১.১২
৩৭. অশ্বিনী কুমার গাইন (৭৫), গ্রাম : চালিঘাট, কাশিপুর ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ০২.০২.১২

www.pathagar.com

৩৮. বয়াতি আবদুস সাত্তার শেখ (৬০), গ্রাম : সিঙ্গা, লোহাগড়া পৌরসভা, সংগ্রহের তারিখ : ০৩.০২.১২
৩৯. লোকশিল্পী সরদার গোলাম মোস্তফা (৫৮), প্রধান শিক্ষক, ছাতরা সরকারি প্রাইমারি বিদ্যালয়, লোহাগড়া, তারিখ ০১.০২.১২
৪০. আব্দুল গফুর (৬৫), দিঘলিয়া, দিঘলিয়া ইউনিয়ন, সংগ্রহের তারিখ : ০৩.০২.১২
৪১. বিধান গাছি (৪০) ও অনিল বিশ্বাস (৪৫) রায়গ্রাম, নওয়াগ্রাম ইউনিয়ন, শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (৫০) নারানদিয়া, নওয়াগ্রাম ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ০২.০২.১২
৪২. সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (৫০), নারানদিয়া, লোহাগড়া পৌরসভা, মিতা রানি বিশ্বাস (৩৫), পোদ্দার পাড়া, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ১৩.০২.১২
৪৩. সন্তোষ বিশ্বাস (৮৭), পিতা : পরশুরাম বিশ্বাস, মাতা : জ্যোৎস্না বিশ্বাস, গ্রাম : ছোটকালিয়া, কালিয়া, তারিখ : ২১.০৮.২০১১
৪৪. বিশ্বদেব বিশ্বাস (৪৬) পিতা : ললিত মোহান বিশ্বাস, মাতা : বৃন্দারানি বিশ্বাস গ্রাম : ছোট কালিয়া, কালিয়া ১১.০৯.২০১১
৪৫. অনিতোষ বিশ্বাস (২৮), অষ্টম শ্রেণি, পিতা : শ্রীহরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মাতা : শ্রীমতি মাধুরী রানী বিশ্বাস, তারিখ : ২৮.১০.২০১১
৪৬. স্বপন গুহ, ইতনা, লোহাগড়া, নড়াইল, তারিখ : ১৫.১০.১১
৪৭. সোহরাব ফকির, বকুলতলা, রূপগঞ্জ, নড়াইল, তারিখ : ১৭.১০.১১
৪৮. সন্তোষ কুমার বিশ্বাস (৫৩), আকরাবাড়ি, দিঘলিয়া ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ২৮.০১.১২
৪৯. আবুল খায়ের শেখ (৫৫), গ্রাম : ইতনা, ইতনা ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ১৩.০২.১২
৫০. নারায়ণ চন্দ্র মিত্র (৫৩), রায়গ্রাম, নওয়াগ্রাম ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, ওসমান খান (৫৫), গ্রাম : কামঠানা, লোহাগড়া ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তথ্য সংগ্রহের তারি : ৩১.০২.১২, আবুল খায়ের শেখ (৫৫), গ্রাম : ইতনা, ইতনা ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ১৩.০২.১২
৫১. মো. মোকাম উদ্দিন শেখ (৭৫), পিতা : মো. এনতাজ উদ্দিন শেখ, মাতা : ডালিম বিবি, ছোট কালিয়া, কালিয়া, তারিখ : ০৭.০৯.২০১১
৫২. সঞ্জয় কুমার দাস (২৪) পিতা : সুধীর কুমার দাস, মাতা : মৃত সমিতা দাস বলাডাঙ্গা, কালিয়া, তারিখ : ২২.০৯.২০১১
৫৩. স্বভাবকবি বিপিন সরকার, বাহিরডাঙ্গা , পৌরসভা, নড়াইল, তারিখ : ১৬.১০.১১
৫৪. অশ্বিনী কুমার গাইন(৭৫), গ্রাম : চালিঘাট, কাশিপুর ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ০২.০২.১২
৫৫. সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (৫০), গ্রাম : নারানদিয়া, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ১৩.০২.১২
৫৬. সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (৫০), গ্রাম : নারানদিয়া, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ ১৩.০২.১২
৫৭. রেজাউল ইসলাম (৩৮), লাইব্রেরিয়ান, লক্ষ্মীপাশা মহিলা কলেজ, লোহাগড়া, তারিখ : ০৪.০২.১২

www.pathagar.com

৫৮. কাঙ্গাল কবি সামসুর রহমান (৭৫), মঠবাড়ী, নলদী ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ১৪.০২.১২
৫৯. রিপা মালি (৩০), স্বামী : রতন মালি (৪০) লক্ষ্মীপাশা সর্দার পাড়া, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ১০.০২.১২
৬০. রিপা মালি (৩০), স্বামী : রতন মালি (৪০) লক্ষ্মীপাশা সর্দার পাড়া, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ১০.০২.১২
৬১. লক্ষ্মী মালি (৫০), স্বামী : গৌরাঙ্গ মালি (৫৫), লক্ষ্মীপাশা সর্দারপাড়া, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ১০.০২.১২
৬২. বয়াতি মশিয়ার শেখ (৩৫), গ্রাম : কুমড়ি, দিঘলিয়া ইউনিয়ন, বয়াতি মনা মিয়া (৪০), ভাটপাড়া, কোটাকোল ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৭.০২.১২
৬৩. সবদার সরদার (৪০) নোয় তথ্যসূত্র : আফজাল খাঁ (৫০), কুমড়ি, দিঘলিয়া ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৭.০২.১২
৬৪. বয়াতি মনা মিয়া (৪০), ভাটপাড়া, কোটাকোল ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৭.০২.১২
৬৫. আফজাল খা (৫০), কুমড়ি, দিঘলিয়া ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৭.০২.১২
৬৬. বয়াতি আবদুর সাত্তার শেখ (৬০), সিঙ্গা, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া, তারিখ : ০৩.০২.২০১২
৬৭. মো. রওশন আলী, অধ্যক্ষ, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ মহাবিদ্যালয়, নড়াইল
৬৮. রূপক মুখার্জি (৪০), উপজেলা প্রতিনিধি, দৈনিক যায় যায় দিন, লোহাগড়া ও প্রভাষক, আমাদা আদর্শ মহাবিদ্যালয়, লোহাগড়া, তারিখ : ০৪.০২.২০১২
৬৯. চারণকবি মোসলেম উদ্দিন বয়াতির জারিগানের পালা, সংগ্রহ, মো. রওশন আলী, অধ্যক্ষ, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ মহাবিদ্যালয়, নড়াইল
৭০. রবীন্দ্রনাথ, ইচড়বাহা, নড়াইল, লোহাগড়া পৌরসভার কৃষ্ণপুর গ্রামের রমেশ চন্দ্র সমাদ্দার (৫৫), বাসুদেব বিশ্বাস (৪০), রায়গ্রাম, নওয়াগ্রাম ইউনিয়ন, লোহাগড়া

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

আবহমান বাংলায় লোকগানের সঙ্গে এমন কিছু দেশীয় বাদ্যযন্ত্র আছে যেগুলোকে আমরা লোকবাদ্য বলে অভিহিত করে থাকি। যেমন, ঢোল, খোল, মন্দিরা প্রভৃতি। নড়াইল অঞ্চলে কিছু লোকবাদ্যযন্ত্র রয়েছে যা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ব্যবহৃত হয়।

লোহাগড়া উপজেলা লোকবাদ্যযন্ত্র

হারমোনিয়াম, তবলা, খোল, ঢোল, মন্দিরা, একতারা, চাকি, তোতা বাঁশি, অষ্টক ঢোল, ঢাক, ডংকা, প্রেমজুড়ি, দোতারা, আড়বাঁশি, করতাল, খমক, সারিন্দা, বেহালা, কাঁসি, কর্নেট, ক্লারনেট ইত্যাদি।

ঢোল নির্মাণ প্রক্রিয়ার বিবরণ

গ্রামবাংলায় ঢোল সাধারণত খুবই পরিচিত একটি বাদ্যযন্ত্র। এটি বিশেষ করে জারি, কবিগান, যাত্রা, নাটক এবং বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীত পরিবেশনের সময় এ ঢোল ব্যবহৃত হয়।

সম্প্রতি পাশ্চাত্য ধারার ব্যান্ড সংগীতেও ঢোলের ব্যবহার হচ্ছে। ঢোল নির্মাণ করতে প্রথমে প্রয়োজন কাঠের চাড়ি। ঢোলে থাকবে দু'টি মুখ। প্রথমে কাঠ কেটে, উপর ও ভেতর চেঁছে চাড়ি প্রস্তুত করতে হবে। ঢোলের প্রতিটির মুখ চওড়া হবে ১০ থেকে ১২ ইঞ্চি। পুরু রাখতে হবে এক ইঞ্চির মতো। ঢোলের বাম পার্শ্ব গরু এবং ডান পার্শ্ব খাসির চামড়া দিয়ে ছাইতে হয়।

প্রথমে দুই পার্শ্বের চামড়া ভিজিয়ে নরম করে চামড়ার দুই মুখের কোনায় ছিদ্র করে ১ থেকে দেড় দিন ঢোলের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে শুকাতে হবে। শুকানোর পর চামড়া বাঁশের চটা বা লোহার তার দিয়ে গোল চাক করে ঢোলের মুখ তৈরি করতে হয়। পরে গরু বা মহিষের চামড়া দিয়ে বেল্ট (স্থানীয় ভাষায় দল) ও স্টিলের রিং ঐ গোল চাকের সাথে সেট করে সুর টিউন করে ঢোলের কাজ সমাপ্ত করতে হয়। চাড়ি আম কাঠের হলে সুর ভালো হয়।

তবে বর্তমানে রেইনট্রি ও আমড়া কাঠ দিয়েও ঢোল তৈরি করা হচ্ছে। ঢোল বাজাতে একপাশে একটি হাত ও অন্য পাশে কাঠি ব্যবহার করতে হয়। ভালো মানের একটি ঢোল তৈরি করতে সাধারণত খরচ পড়ে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা। সেখানে বিক্রি হয় তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা। ঢোলসহ অন্যান্য লোকবাদ্যযন্ত্র তৈরিতে যেসব হাতিয়ার প্রয়োজন সেগুলো হলো : লোহার বাটাল, ছুরি, ছোট কুঠার

www.pathagar.com

(স্থানীয় ভাষায় বাইস), ভ্রমর (স্থানীয় ভাষায় গুঞ্জা), একতারা (স্থানীয় ভাষায় ছুরি), চামড়া চাঁছা গ্লাস, ও কোর বাটাল।[১]

অষ্টক ঢোল নির্মাণ কৌশল

এ অঞ্চলে খুবই পরিচিত একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম অষ্টক ঢোল। এটি বিশেষ করে অষ্টক গান, হালুই গান, বালা গান, সারিগানসহ বিভিন্ন লোকসংগীত পরিবেশনের সময় এ ঢোল ব্যবহৃত হয়। অন্য ঢোল থেকে এ ঢোলের সাউন্ড সম্পূর্ণ আলাদা। অষ্টক ঢোল নির্মাণ করতে প্রথমে প্রয়োজন কাঠের চাড়ি। ঢোলে থাকবে দু'টি মুখ। প্রথমে কাঠ কেটে, উপর ও ভেতর চেঁছে চাড়ি প্রস্তুত করতে হবে। ঢোলের প্রতিটির মুখ চওড়া হবে ৭ থেকে ৮ ইঞ্চি। ঢোলের মুখে পুরু রাখতে হবে হাফ থেকে এক ইঞ্চির মতো। ঢোলের দুই পাশেই খাসির চামড়ার ছাউনি হবে। প্রথমে দুই পাশের চামড়া ভিজিয়ে নরম করতে হবে এবং ঢোলের দুই মুখের চামড়ার পার্শ্বের অংশ ছিদ্র করে এক থেকে দেড় দিন দড়ি দিয়ে বেঁধে শুকাতে হবে। এরপর বাঁশের চটা দিয়ে গোল চাক করে এবং চামড়াসহ ঢোলের মুখ তৈরি করতে হয়। পরে দড়ি দিয়ে বেল্ট তৈরি করে (স্থানীয় ভাষায় দল) গোল চাকের সাথে সেট করে সুর টিউন করে ঢোলের কাজ সমাপ্ত করতে হয়। চাড়ি আম কাঠের হলে সুর ভালো হয়। তবে বর্তমানে রেইনট্রি ও আমড়া কাঠ দিয়েও ঢোল তৈরি করা হচ্ছে। ঢোল বাজাতে কাঠি প্রয়োজন। যাকে ঢোলের কাঠি বলে। ভালো মানের একটি ঢোল তৈরি করতে সাধারণত খরচ পড়ে ১২'শ টাকা। সেখানে বিক্রি হয় ১৫'শ টাকা। অষ্টক ঢোল তৈরিতে যেসব হাতিয়ার প্রয়োজন সেগুলো হলো : লোহার বাটাল, ছুরি, ছোট কুঠার (স্থানীয় ভাষায় বাইস) ভ্রমর (স্থানীয় ভাষায় গুঞ্জা), একতারা (স্থানীয় ভাষায় ছুরি), চামড়া চাঁছা গ্লাস ও কোর বাটাল।[২]

লোকবাদ্যযন্ত্রের তালিকা ও পরিচিতি

ঢোল, বাঁশি, খোল, কাঁশ, মন্দিরা, খোমক, একতারা, দোতারা, প্রেমজুড়ি, আড়বাঁশি ইত্যাদি।

ঢোল

তৈরির সামগ্রী : কাঠ, বেত, পিতলের বেড়ি, ছাগলের চামড়া ইত্যাদি।

ঢোলের নির্মাণ কৌশল : কাঠের ফাঁকা একটা গোল ড্রাম বা কাইড়ে তৈরি করে তার মুখে বেত কিংবা কাঠের গোল চাকতি দিতে হয়। ড্রামের এক মুখ বড় এক মুখ সামান্য ছোট। ফাঁকা দুই মুখ শুকনো চামড়া দিয়ে এমন কায়দায় ঢাকতে হয়- যাতে ড্রামের উপরে চামড়ার বেতির সঙ্গে সংযুক্ত পিতলের বেড়ি দ্বারা আলগা ও শক্তভাবে চামড়ার বন্ধন ঠিক করা যায়।

খোল

তৈরির সামগ্রী : কাঠ, বেত বা চামড়ার বেতি, কুমারের তৈরি মাটির বা পিতলের বেড়ি, ছাগলের চামড়া ইত্যাদি।

www.pathagar.com

নির্মাণ কৌশল : ঢোলের ন্যায় খোলেও প্রথমে একটা কাঠের গোল ড্রাম বা কাইড়ে যার এক মুখ বড় এবং অন্য মুখ ছোট তৈরি করতে হয়। তারপর দুই মুখে চাকতি দিয়ে চামড়ার আবরণে মুখ বন্ধ করতে হয়। চামড়া শিথিল করা বা শক্তভাবে বন্ধনে আটকে রাখার জন্য ড্রামের শরীরে চামড়ার বেতি জড়ানো থাকে ও পিতলের বেড়ি সেটিং করা হয়।

কাঁসা

তৈরি সামগ্রী : কাঁসা বা নরকাঁসা নির্মাণ কৌশল : নড়াইল অঞ্চলে তৈরি হয় না। লোকে ব্যবহারের জন্য কাঁসার তৈরি ছোট আকৃতির থালার মতো যন্ত্র কিনে আনে এবং সংগীতের অনুষঙ্গ হিসেবে বাজানোর জন্য একটা কাঠি দ্বারা পিটিয়ে বাজাতে থাকে।

মন্দিরা

তৈরি সামগ্রী : নরকাঁসা।

নির্মাণ কৌশল : নড়াইলে তৈরি হয় না। ছোট দুটো বাটির মতো। মাঝখানে ছিদ্র থাকে। দড়ি দিয়ে আটকে দুই হাতে পেচিয়ে সংগীতের তালে তালে বাজানো হয়।

খোমক

তৈরি সামগ্রী : কাঠ, চামড়া, সুতলি, কাঠের গুল, মুড়িপ্যাচ, খিল ইত্যাদি।

নির্মাণ কৌশল : কাঠের দুই মুখ খোলা ছোট ধরনের একটা হাঁড়ি তৈরি করতে হয়। তারপর নিচের মুখ চামড়ার আবরণে ঢেকে দিতে হয়। এক্ষেত্রে নিচের অংশে চামড়ার সঙ্গে একটা মুড়িপ্যাচে সুতলি আটকিয়ে সুতলি ১৫-১৬ ইঞ্চি লম্বা করে সুতলির মাথা একটা মোটা কাঠের কিংবা বাঁশের তৈরি খিলের মাঝে আটকাতে হয়। কাঠের তৈরি শিল নোড়ার আকৃতি ছোট গুল দিয়ে সুতলিতে টোকা মেরে সংগীতের তালে বাজাতে হয়।

একতারা

তৈরি সামগ্রী : পাকা লাউ, বাঁশের চটা, তার ইত্যাদি।

নির্মাণ কৌশল : লাউ পাকিয়ে কেটে ভিতরে গরুর গোবর দিয়ে কিছুদিন রাখা হয়। এরপর পরিষ্কার করে ছোট একটা হাঁড়ির আকৃতিতে লাউয়ের নিচের অংশ রেখে দুইপাশে ১৮-২০ ইঞ্চি লম্বা দুটো বাঁশের চটা বেঁধে দিয়ে চটার মাথা একটা খিল দ্বারা সংযুক্ত রাখতে হয়। এরপর লাউয়ের হাঁড়ির নিচে ছিদ্র করে একটা মুড়িপ্যাচে একটা তার লাগিয়ে উপরে চটার মাথায় খিলে আটকাতে হবে। তবে খিলে কমবেশি করার জন্য একটা আড়াআড়ি কাঠি সমান ছিদ্র করে শক্তভাবে আটকাতে হবে। সংগীতের তালে হাতের ছোয়ায় তার বাজে।

দোতারা

তৈরি সামগ্রী : কাঠ, তার, কাঠ বা বাঁশের খিল, চামড়া ইত্যাদি।

নির্মাণ কৌশল : কাঠের ২০-২২ ইঞ্চি লম্বা একটা ফাঁপা খোল যার নিচের অংশ এবং উপরের অংশ ঠিক লাউয়ের মতো করে তৈরি করতে হয়। নিচে গোল- উপরে চ্যাপ্টা

www.pathagar.com

করে। এরপর উপরের চ্যাপ্টা অংশ চামড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। মাথায় আড়াআড়ি ২-৩টা খিল দেয়া থাকে। নিচে হতে উপর পর্যন্ত চামড়ায় উপর টিক দিয়ে ২টা তার মাথার খিলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তারপর সংগীতের তালে ছোট একটা গুল দিয়ে তার স্পর্শ করে যন্ত্রের আওয়াজ তৈরি হয়।

প্রেমজুড়ি

তৈরি সামগ্রী : কাঠ, জিনেরী বা পেরেক, টিনের ছিদ্র চাকতি।

নির্মাণ কৌশল : ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা ৩´ ইঞ্চি বেড় দিয়ে দুইখানা কাঠ খণ্ড যার সামনে এবং পিছনে ও মাঝখানে ছিদ্র করা ভালোভাবে মসৃণ করে তৈরি করতে হয়। তারপর টিনের তৈরি পয়সার আকৃতির ৪-৫টা চাকতি পেরেকে ঢুকিয়ে ঐ পেরেক কাঠ খণ্ড দুটির ছিদ্রের মাঝে আটকে দিতে হবে পিছনে ও সামনের অংশে। তারপর সংগীতের তালে মাঝের ছিদ্রে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বাজাতে হয়।

আড়বাঁশি

তৈরি সামগ্রী : বাঁশ।

নির্মাণ কৌশল : এক ইঞ্চি বা দেড় ইঞ্চি বেড়ের লম্বা ফাঁপা বাঁশ ভালোভাবে শুকিয়ে আগুনে শেক দিয়ে এক মুখে আটকানো এবং একমুখ খোলা রেখে প্রস্তুত করতে হয়। এরপর প্রয়োজনমতো বাঁশের গায়ে ছিদ্র তৈরি করে নিতে হয়। উপরের আটকানো অংশের কাছে একটা ছিদ্র এবং নিচে আটটি ছিদ্র থাকে। এরপর মুখে ফুঁক দিয়ে এবং হাতের আঙ্গুলের কৌশলে বাঁশিতে সুর তোলা হয়।[৩]

তথ্যনির্দেশ

১. কৃষ্ণ বিশ্বাস (৪০), পিতা : বিনয় বিশ্বাস, লোহাগড়া বাজার, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ০৭.০২.১২
২. ধলা বিশ্বাস (৩৭), পিতা : বিনয় বিশ্বাস, লোহাগড়া বাজার, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ০৭.০২.১২
৩. ইছাক সর্দার, ভাটিয়া, নড়াইল, তারিখ : ২২.১২.১১

www.pathagar.com

লোকউৎসব

লোক উৎসবগুলি লোকজীবনের বিভিন্ন দিকের ঐতিহ্য নির্দেশ করে। পারতপক্ষে সভ্যতা ঐতিহ্য অনুগামী। সুতরাং লোকজীবনে উৎসব পালনের গুরুত্ব কেবল আনন্দ লাভের মধ্যেই নয় বরং জাতি হিসেবে নিজেদের সভ্যতাকে ঝালাই করে নেয়া। বাংলাদেশে লোকজীবনের পলির আস্তরণে মিশে আছে লোকউৎসব। মানুষ বিভিন্ন সময়ের নানাবিধ টানাপোড়েনের কষ্ট ভুলে নিছক আনন্দ আয়োজনে সময় কাটাতে পারে– সে কেবল উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে। নড়াইল সদর উপজেলায়ও কিছু কিছু লোকউৎসব লক্ষ করা যায়। যথা : আশুরা : এটা মুসলমানদের মনে একটা বেদনার স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কলোড়া ইউনিয়নের কলোড়া গ্রামের জাফর মাস্টারের বাড়ি প্রতি বছর আশুরা উপলক্ষ্যে মাতম হয় এবং ৩-৪শত লোকের জন্য খিচুড়ি রান্না করা হয়।[১]

১. নবান্ন

অগ্রহায়ণ মাসে উপজেলা, জেলায় সর্বত্র ২-৪ বাড়িতে, নতুন ধানের চাউলে পায়েস খাবার রেওয়াজ এখনও চালু আছে। কিন্তু আগে এ রেওয়াজ সকলে মেনে চলতো। কারণ কিছু কাল আগেও অঞ্চলে দেশি প্রজাতির আমন ধান উৎপন্ন হতো এবং আমন ধান অগ্রহায়ণ মাসে কাটা হতো। নতুন ধান কেটে কিশোর কিশোরীরা একত্রে মজা করে পায়েস খেত এবং বাড়িতে বাড়িতে পায়েস খাবার ধুম পড়ে যেতো। বর্তমান সময় মোটা চাউলে কেউ পায়েস খায় না। তবে অগ্রহায়ণ মাসে বর্তমানে ইরি ধানের চাউল গুঁড়ো করে- সে গুঁড়ো ও মধু দিয়ে তৈরি ভাজা পিঠে, কিংবা নারকেল গুড় তিল মিশ্রিত করে কুলি পিঠে প্রায় সব পরিবারে তৈরি হয় ও খাওয়া হয়। তবে আগের ন্যায় আনন্দ ও সামাজিক সৌহার্দ্য নবান্ন উৎসবে দেখা যায় না।[২]

নড়াইল সদর উপজেলার নবান্ন

নড়াইলে আমন ধানের মৌসুম অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব পালন হতো। যদিও বর্তমানে সময়ে অধিকাংশ ধানে চৈত্র বৈশাখ মাসে পাক ধরে ও ধানকাটা, ধানমাড়াই ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। তবুও আষাঢ় শ্রাবণে রোপণকৃত ধানগুলি অগ্রহায়ণে পেকে যায় এবং ঋতুজনিত কারণে অগ্রহায়ণে সামান্য শীত শীত ভাব অনুভূত হয়। ফলে শুকনো আবহাওয়ার কারণে গ্রামীণ মানুষের চলাফেরা আনন্দ উৎসবের ধুম পড়ে যায়। সাধারণত হিন্দু মুসলিম সব শ্রেণির মানুষের মাঝে নবান্নে নতুন চালের পায়েস খেতে ও বিলাতে দেখা যায়। এটা যেমন একদিকে উৎপাদিত ফসল মৌসুমকে বরণের ঐতিহ্য

www.pathagar.com

তেমনি অন্যদিকে খেটে খাওয়া হতদরিদ্র মানুষগুলি উৎসব আনন্দের মাঝে পরস্পর সুখ-দুঃখের লেনাদেনা করার সুযোগ পায়। হিন্দু সমাজে নবান্নের পায়েস লক্ষ্মী দেবীর ভোগের জন্য উৎসর্গ করা হয়।[৩]

লোহাগড়া উপজেলার নবান্ন

গ্রাম বাংলায় অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে আমন ধান কাটা থেকে শুরু নবান্ন উৎসব। বাঙালির জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে জড়িয়ে থাকা অন্যতম প্রধান উৎসব "নবান্ন"। এক সময় লোহাগড়া, ইতনা, নলদী, মল্লিকপুরসহ এ অঞ্চলে আমন ধান কাটার আগে কৃষক ও তার স্ত্রী নতুন পোশাক পরে উঠানে কাস্তে, ধামা, কুলো ইত্যাদি উঠানে রেখে পাশে একটু আগুন জ্বালিয়ে ফুল, ধান, দূর্বা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে এক ধরনের মাঙ্গলিক গান করতো। আবহমান এই উৎসবগুলো দিন দিন বিলুপ্ত হচ্ছে। বর্তমানে গ্রামের মানুষ নবান্নের ঐতিহ্যবাহী পার্বণের স্বাদ পেয়ে থাকে নতুন ধানের ভাত খেজুরের রস ও গুড়ের পায়েস ইত্যাদি খাওয়ার মধ্য দিয়ে।

সর্বজনীন এই উৎসব ঐতিহ্য পালনের মধ্য দিয়ে এখানকার মানুষ একে অপরের নৈকট্যে আসে। নতুন প্রজন্মকে বিলুপ্তপ্রায় উৎসব, ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিচিত করতে হবে।[৪]

কালিয়া উপজেলার নবান্ন

জমিকে নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু রকমের অনুষ্ঠানের প্রচলন থাকলেও, নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলায় যে অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে তা সব হিন্দু জনসমষ্টির মধ্যেই সীমিত। সেগুলোর মধ্যে নবান্ন, পৌষপার্বণ, লক্ষ্মীপূজা, ক্ষেত্রকুলই ব্রত ইত্যাদি অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেমন আছে : নতুন ধান্যে হবে নবান্ন মোদের ভবনে ভবনে। বাড়িতে নতুন ধান উঠলে নবান্ন শুরু হয়ে যায়। কালিয়া উপজেলা এর ব্যতিক্রম নয়। এ অনুষ্ঠানটি হিন্দুদের হলেও উৎসবের আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রে আছে উভয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ। নতুন ধানের পায়েসই এ অনুষ্ঠানের প্রধান উপকরণ।

২. চৈত্রসংক্রান্তি

ইতনা গ্রামের চৈত্রসংক্রান্তি

এ অঞ্চলের একটি আদি উৎসব হলো চৈত্রসংক্রান্তি। এক সময় এ চৈত্রসংক্রান্তিতে বিভিন্ন গ্রামে মেলা বসতো। আর এ মেলাকে কেন্দ্র করে গ্রামগুলো হয়ে উঠতো আনন্দমুখর। সমাবেশ ঘটতো বিভিন্ন গ্রামীণ শিল্পের। বছরের শেষ আয়োজন এই মেলার মাধ্যমেই পুরনো বছরকে বিদায় জানানো হয়। এখনও বিভিন্ন গ্রামে যেমন দিঘলিয়া, জয়পুর, নওয়াগ্রাম, লাহুড়িয়া, ইতনাসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গ্রামীণ মানুষেরা এ দিনটিতে আনন্দ উৎসব করে। চৈত্রসংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্ব থেকে বিভিন্ন গ্রামে দল বেঁধে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা অষ্টক ও বালা গান পরিবেশন এবং শেষের দিন আগুন সন্ন্যাসী করে। ইতনা গ্রামে লোকসংগীত গবেষক স্বপন গুহ-এর বাড়ির সামনে

www.pathagar.com

চৈত্র সংক্রান্তির পূজা হয়। মাসের শেষ দিনে হিন্দু নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিভিন্ন গ্রামে আগুন সন্ন্যাসী করে। যেখানে আগুন সন্ন্যাসী করে সে জায়গায় কিছু নিম অথবা বেলের কাঠে আগুন দেওয়া হয়। আগুন নেভার একপর্যায়ে কয়লা যখন লাল টকটকে হয়ে যায় তখন সন্ন্যাসীরা এতে মন্ত্র পড়ে ধূপ দেয় এবং আগুনের কয়লাগুলি উঠানের একটি জায়গায় ছড়িয়ে দিয়ে তারা তার ওপর হেঁটে বেড়ায়। এ অবস্থায় কারো পায়ে আগুন স্পর্শ করে না। এটাকেই আগুন সন্ন্যাসী বলে। লোহাগড়া পৌরসভার মোচড়া এলাকার সাংবাদিক অমল দত্ত (৫৫), একই পৌরসভার সর্দার পাড়ায় পরেশ কর্মকারের বাড়িতে এই আগুন সন্ন্যাসী হয়ে থাকে। এছাড়া লোহাগড়ার কালনা গ্রামের ঠাকুর বাড়ি ও লোহাগড়ার কাড়াল পাড়ায় এ আগুন সন্ন্যাসী হয়।[৫]

হোগলাডাঙ্গা এবং বেতেঙ্গা গ্রামের চৈত্রসংক্রান্তি

চৈত্র মাসে চড়ক পূজা উপলক্ষ্যে হোগলাডাঙ্গা গ্রামে এবং বেতেঙ্গা গ্রামে 'চৈত্রসংক্রান্তি' উৎসব হয়। এ উৎসব হতে হিন্দু নারীরা সিঁথির সিঁধুর কিনে আনে। শিশু কিশোররা চড়ক গাছে চড়ে আনন্দ করে। দোকান- পশার বিশেষ করে চুড়িফিতার দোকানে যথেষ্ট ভিড় দেখা যায়। সংক্রান্তি মেলা হতে গ্রামের মানুষ তালপাতার পাখা কিনে আনে।[৬]

কালিয়া উপজেলার চৈত্রসংক্রান্তি

চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন দেবতা, বিশেষ করে শিব-দুর্গা, রাম-লক্ষ্মণ, মা কালী, হনুমান প্রভৃতি সাজে সজ্জিত হয়ে তাদের কর্মকাণ্ড জনসমক্ষে প্রদর্শন করে। এর বিনিময়ে তারা পয়সা প্রার্থনা করে। এটি কালিয়া অঞ্চলের সব হিন্দু জনসমষ্টির ছেলেমেয়েরা করে থাকে।

৩. পৌষপার্বণ

নড়াইল সদর উপজেলার পৌষপার্বণ

বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে বিশেষ করে নড়াইল অঞ্চলে প্রাচীনকাল হতে প্রচুর খেজুর গাছ দেখা যেতো। বর্তমান সময় অনাবাদি জমাজমি চাষাবাদের আওতায় এনে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ব্যবহারের কারণে এলাকার জমির উপর বা পাশে দাঁড়িয়ে থাকা খেজুর গাছ মানুষ কেটে ফেলেছে। ভালোভাবে ব্যবহৃত হয় বলে গরিব শ্রেণির মানুষেরা আর্থিক সুবিধা পেতে অন্যান্য বৃক্ষের সঙ্গে খেজুর গাছ বিক্রি করে দিয়েছে। যাইহোক তারপরও শীতকালে এ অঞ্চলে প্রচুর খেজুর রস পাওয়া যায়। পৌষ মাস বিদায়ের সন্ধিক্ষণে রসের পায়েস, রসপিঠে ইত্যাদি খাবার উপকরণসহ লোকমেলা যথা- ঘোড়দৌড়, ঘুড়ি উড়ানো প্রতিযোগিতা, ষাঁড় লড়াই হাডুডু, কুস্তি, ইত্যাদি লোক খেলাধুলাকে উপলক্ষ্য করে নড়াইলে বিছালী ইউনিয়নের মধুরগাতি গ্রামে ঘোড়দৌড় হয়। হবখালী ইউনিয়নের বিল-ডুমুরতলা গ্রামে প্রায় ১০০-১৫০ বছর পূর্ব হতে তিনদিনব্যাপী ঘোড়দৌড়, লাঠিখেলা, কুস্তি, ষাঁড় লড়াই, জারিগান ইত্যাদিসহ পৌষপার্বণের মেলা উদ্‌যাপিত হয়। মেলা একদিকে গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করে অন্যদিকে মানুষের মিলনমেলায় প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্মরণ ও বরণের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করে। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষ শ্রেণির পুরুষ-নারী পৌষপার্বণ

www.pathagar.com

মেলায় উপস্থিত হয়ে মেলা উপভোগ করে। এছাড়া মাইজপাড়া ইউনিয়নের চারিখাদা গ্রামে পৌষ সংক্রান্তি মেলা হয়। আউড়িয়া ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামে পৌষসংক্রান্তির মেলা হয়, শেখহাটি ইউনিয়নের আফ্রা গ্রামে পৌষসংক্রান্তির মেলা হয় এবং হিন্দু পুরুষ-রমণীগণ বিশেষভাবে ঐ স্থানটিকে তীর্থস্থান মনে করে।

অনেক লোক মানত করে এবং কাজলা, চিত্রা ও ভৈরব নদীর মিলন ত্রিমোহনায় স্নান করে পুণ্য অর্জিত হয়েছে বিশ্বাস করে। পৌষপার্বণে গ্রামীণ জনপদে হিন্দু মুসলিম প্রায় সকল বাড়িতেই মুড়িভাজা হয়, খেজুরের গুড়ে মুড়িমটকা তৈরি করা হয়। এ সময় ধান ভিজিয়ে চিড়া তৈরি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষকের ধানমাড়াই কিংবা ধানকাটা জমাজমিতে বসে চিড়া গুড় এবং নারিকেল দিয়ে দুপুরবেলা হালকা খাবার খায়। এ সময় বিকেলবেলা মজার খাবারের তালিকায় পিঁয়াজ-রসুন-মরিচসহ চিড়াভাজা খুবই জনপ্রিয় খাবার।

বাংলার লোকমেলাগুলি গ্রামীণ মানুষের নিত্যজীবনের সুখদুঃখের সাথী হয়ে আছে। প্রাণের টানে সব শ্রেণির মানুষই ঐসব উৎসবমুখর মেলায় উপস্থিত হয় এবং ক্ষণিকের জন্য হলেও ঐতিহ্যের উৎসের কথা ভেবে নস্টালজিয়ায় ভেসে যায়।[৭]

কালিয়া উপজেলার পৌষপার্বণ

পৌষপার্বণ পৌষসংক্রান্তির দিনে অনুষ্ঠিত একটি উৎসব। পিঠা এবং পায়েসই এ উৎসবের মুখ্য উপকরণ। খেজুরের রসে ভিজানো পিঠা আর রসের পায়েস এ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। রসের পিঠা ছাড়াও আরও বহু পদের পিঠা এ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। গ্রামের মধ্যে নিতান্ত পারিবারিক বলয়ে অনুষ্ঠিত এ উৎসবে আপ্যায়িত হন বাড়ির আমন্ত্রিত জামাই-মেয়ে, অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ, আত্মীয় অনাত্মীয় ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রামের ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা।

লোহাগড়া উপজেলার পৌষপার্বণ

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসেই বাড়িতে নতুন ধান ওঠে। নতুন ধান বাড়িতে আসার পর সেই ধানের চাল দিয়ে ভাত, পিঠা-পায়েস, সুড়ি-মুড়কি, খৈসহ নানা খাবার খাওয়ার উৎসব শুরু হয়। পৌষ মাসের শেষের দিনে এ অঞ্চলের কোথাও কোথাও পৌষসংক্রান্তি মেলা বসে।

এ মাসের শেষের কয়েকদিন নলদি, রায়গ্রাম, কলাগাছি, গাছবাড়িয়া, লোহাগড়া, দিঘলিয়া, লুটিয়াসহ বিভিন্ন গামের যুবকরা হালুই গান গেয়ে ধান চাল ও নগদ অর্থ সংগ্রহ করে মাসের শেষের দিন বনভোজন এবং আনন্দ উৎসব করে। পৌষে ফসল কাটার পর কৃষকের হাতে কাজ কম থাকায় এবং শীত মৌসুম হওয়ায় অনেক গ্রামে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, লোকখেলাধুলাসহ বিভিন্ন লোকসংগীতের আসর বসে। এ দিনে রসের সিন্নি (ক্ষীর) ও কুলি পিঠা তৈরি করে। ইতনাসহ কয়েকটি গ্রামের মানুষ পৌষ মাসের শেষ দিন থেকে পোলো নিয়ে বিভিন্ন বিলে মাছ ধরা শুরু করে। তবে মাছ ধরতে যাওয়ার পূর্বে তারা কিছু লোকবিশ্বাস পালন করেন। তাদের বিশ্বাস এতে প্রচুর মাছ ধরা পড়বে।[৮]

www.pathagar.com

৪. বৈশাখি মেলা

সদর উপজেলার বৈশাখি মেলা

বৈশাখি মেলা বর্তমান সময় জাতীয় উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামের প্রায় অধিকাংশ এলাকায় এখন বৈশাখি মেলা হয়। নড়াইলের হিন্দু অধ্যুষিত জনপদে বৈশাখি মেলার উদ্বোধনে ১ বৈশাখ ভোরে ঢাক, জয়ঢাক, ঢোল, বাঁশি বাজিয়ে বৈশাখকে বরণ করা হয়। স্কুল, কলেজের মেয়েরা শাড়ি পরে একই সাজে দল বেঁধে ঘোরাফেরা করে, নানাভাবে সাংস্কৃতিক আনন্দ লাভের চেষ্টা করে। তবে শত বছর আগে থেকে নড়াইলের রূপগঞ্জ সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ ও জমিদারদের বান্ধাঘাটের উপরে নিশিনাথতলায় ১ বৈশাখ হতে ৩০ বৈশাখ পর্যন্ত একমাসব্যাপী বিরাট মেলা হয়। মেলায় যাত্রাগান হয়, সার্কাস হয়, পুতুলনাচ হয়, দেশের বিভিন্ন জেলা হতে আসবাবপত্রের দোকানসহ বিভিন্ন ধরনের দোকান যেমন আসে তেমনি নানা অঞ্চলের নানা বয়সি ক্রেতাদের ভিড়ও মেলায় উপচে পড়ে। প্রতিদিন হাজার হাজার হিন্দু পুরুষ–নারী নিশিনাথতলা মন্দিরে পূজা অর্ঘ্য দেয়। তবে মেলায় নির্বিশেষ শ্রেণির মানুষের ভিড় লক্ষ করা যায়। নিশিনাথতলার বৈশাখি মেলায় লক্ষ লক্ষ টাকার ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়।[৯] সন্তু ঘোষ, ভওয়াখালী, নড়াইল।

লোহাগড়া উপজেলার বৈশাখি উৎসব

এ উপজেলায় বৈশাখ মাসকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন ধরনের উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। যেমন : বৈশাখের প্রথম দিনে এ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বৈশাখি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় বিভিন্ন লোকজশিল্পের আগমন ঘটে। এখানে পরিবারের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য থেকে শুরু করে মুখরোচক নানা ধরনের খাবার, কবি সাহিত্যিক, সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের ছবি পাওয়া যায়। নানা বয়সি মানুষের সমাবেশ, কেনাকাটা, ঘোরাফেরা, আড্ডা-গল্পে মেতে থাকা, হৈচৈ, আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে বৈশাখি উৎসব চলে। ইতনা ইউনিয়নের ইতনা গ্রামে লোকসংগীত গবেষক স্বপন গুহ-এর বাড়ির সামনে ১ দিনব্যাপী বৈশাখি মেলা বসে। ব্রিটিশ আমল থেকে এই মেলা হয়ে আসছে। মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। একই গ্রামে ইউনাইটেড ক্লাবের সামনে ১ বৈশাখ উপলক্ষ্যে মেলা বসে। এ মেলাকে তসলুর মেলা বলে। মেলায় জারি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইতনা গ্রামে তসরু মিয়া নামে এক ব্যক্তির হাত ধরে মেলা শুরু হয়েছিল বলে মেলার নামকরণ হয় তসরুর মেলা।

এছাড়া একই ইউনিয়নের দৌলতপুর গ্রামে বৈদ্যের মাঠে চৈত্র মাসের শেষের দিন ও ১ বৈশাখে নামকরা বারুণী মেলা বসে। বারুণী পূজা উপলক্ষ্যে এ মেলা হয়। এ মেলার প্রধান আকর্ষণ হলো -বিভিন্ন সাঁচ, বাতাসা এবং মটর কলাই ফুটভাজা। এই কলাই ফুটভাজা এতটাই সুস্বাদু যে মেলা থেকে এ ফুট কিনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে পাঠানো হয়। মেলায় যারাই আসে সবাই এ কলাই ফুট না কিনে বাড়ি ফেরে না। ইতনার কুমারডাঙ্গা গ্রামের কিছু নিম্নবর্ণের হিন্দু মহিলারা এই কলাই ভেজে মেলায় বিক্রি করতে আসেন। মেলায় যাত্রাগান ও কবিগানের আয়োজন

www.pathagar.com

করা হয়। ইতনা গ্রামের হিজল তলার মাঠে গত ৪ বছর ধরে এক মহিলার তত্ত্বাবধানে চৈত্র মাসের মধু কৃষ্ণা তিথিতে বুড়োর মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

নওয়াগ্রাম ইউনিয়নের ব্রাহ্মণডাঙ্গায় প্রতিবছর চৈত্র মাসের শেষ দিন এবং পহেলা বৈশাখে দুইদিনব্যাপী মেলা বসে। শতাব্দী প্রাচীন এ মেলা উপলক্ষ্যে বিশাল ঘোড় দৌড়, লাঠিখেলা, জারি ও কবিগানের আসর বসে। লাহুড়িয়া ইউনিয়নের লাহুড়িয়া, হ্যাসলাগাতি, দিননাথপাড়া, পশ্চিমপাড়া, এগারনালি, কামারগ্রাম, সরশুনা রাজাপুরসহ বিভিন্ন গ্রামে চৈত্র-বৈশাখ মাসের বিভিন্ন দিনে ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা ও জারিগান এবং মেলা অনুষ্ঠিত হয়। চৈতালি ফসল উঠার পরই এসব মেলা হয়। দিঘলিয়া ইউনিয়নের আকরাবাড়ি গ্রামে বয়াতি কামরুল হাসানের (৪৭) বাড়িতে দীর্ঘ ২০ বছর ধরে চারণকবি বিজয় সরকারের স্মরণে প্রতি বছর মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দুই রাতব্যাপী জারি, বিজয়গীতি, ভাবগান, ভাটিয়ালিসহ বিভিন্ন লোকসংগীতের আসর বসে। এখানে নড়াইলের প্রখ্যাত জারিগানের শিল্পী অধ্যক্ষ রওশন আলীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রখ্যাত জারি শিল্পীরা এ আসরে গান গাইতে আসেন। এ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটে। এখানে চুড়ি, ফিতা, খেলনা, মাটির পুতুল, ব্যাংক, খেলনাসহ হরেক রকমের জিনিস বিক্রি হয়।[১০]

কালিয়া উপজেলার পয়লা বৈশাখ

কালিয়াতে পয়লা বৈশাখ পালন অর্থাৎ বর্ষবরণ-এর সূচনা করে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, কালিয়া শাখা। এ সংগঠনটি ব্যানার, ফেস্টুন সহযোগে "এসো হে বৈশাখ এসো এসো" গান গেয়ে পথ পরিক্রমা করে। এ অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন শহীদ আ. সালাম ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক সুরঞ্জন রায়, অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শিবপ্রসাদ মণ্ডল এবং উপাধ্যক্ষ প্রভাসচন্দ্র ঘোষ। সংগীত পরিবেশন করেন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। সংগীত পরিচালনা করেন শাহীনুর আল-আমীন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে ক'বছর বন্ধ থাকার পর রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় পান্তা-ইলিশের ব্যবস্থাসহ ব্যান্ড সংগীতের আয়োজন হয়। একবার লোকগান পরিবেশিত হলেও ব্যান্ডেরই জয়জয়কার। এ মেলায় জড়ো হয় লোকজ নানা রকমের দ্রব্য সামগ্রী। বড়দিয়া কলেজ চত্বরেও পয়লা বৈশাখে লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান হয়। কালিয়ার ডাকবাংলো চত্বরের পয়লা বৈশাখের তুলনায় বড়দিয়ার মেলাটি অধিক লোক ঘরানার।

৫. হালখাতা

লোহাগড়া উপজেলার হালখাতা উৎসব

হালখাতা বাঙালি সংস্কৃতির বাহন। ব্যবসায়ীদের সারা বছরের বেচাকেনার হিসেব মিলিয়ে নতুন খাতা খোলার যে অনুষ্ঠান তাকেই হালখাতা বলে। এখানে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পহেলা বৈশাখের দিনে শুভ হালখাতা মহরত উৎসব শুরু হয়। অনেকে প্রথম বৈশাখে না করলে এ মাসের পঞ্জিকার তিথি নক্ষত্র ও শুভ দিনক্ষণ দেখে এই হালখাতার দিন ধার্য করেন। বিগত সারা বছরের বকেয়া গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায়

www.pathagar.com

এবং নতুন খাতা নতুন হিসাবনিকাশ শুরু করার জন্য এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বকেয়া অর্থ আদায় করার জন্য বিভিন্ন রং-বেরঙের দাওয়াত কার্ড ছাপিয়ে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং হালখাতা উৎসবে আসার আহবান জানানো হয়। গ্রাহকরা মহরত অনুষ্ঠানে বিগত বছরের বকেয়া বিল পরিশোধ করেন এবং তাদের ফল, লুচি, নিমকি, মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। ব্যবসায়ীরা প্রত্যেকে পহেলা বৈশাখের আগের দিন তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধুয়েমুছে পরিষ্কার করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এদিন দোকানে পূজার্চনা করে হালখাতার কাজ শুরু করেন। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এ নিয়মের এখনও ব্যত্যয় ঘটেনি। তবে সময়ের পরিবর্তনে হালখাতার দিনক্ষণও পরিবর্তিত হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষের আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সময়ে হালখাতার সুযোগ নিচ্ছেন। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকায়নের সুবাদে গ্রামের কৃষকেরা এখন বছরের কয়েক দফা আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকেন। এ সুবিধাটা তারা পেয়ে থাকেন তাদের ঘরে দফায় দফায় ফসল আসার ফলে।

যেমন চৈত্র-বৈশাখ মাসে তারা পেয়ে থাকেন গম ও বোরো ফসল, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে পেয়ে থাকেন আউশ ও পাট এবং অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে পেয়ে থাকেন আমন ফসল। এসব ফসলি মৌসুমে গ্রামের ছোট-মাঝারি এবং উপজেলা শহরের ব্যবসায়ীরা তাদের বাকি তুলতে হালখাতার ব্যবস্থা করে থাকেন।[১১]

৬. অন্যান্য মেলা

মেলা হলো বিভিন্ন বিষয় যথা- ব্যক্তিগত বিষয়, ধর্মীয় বিষয় কিংবা এলাকার সমমনা মানুষেরা মিলেমিশে সকল দুঃখকষ্ট ভুলে নির্মল আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে যে হাসি উল্লাসের আয়োজন করে- তাই-ই মেলা। মেলা একদিকে মানুষের পারস্পরিক দেখাশুনার ভিত্তিতে প্রাণের বিনিময়ে ভালোবাসাবাসি আদান-প্রদান করে নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে। অন্যদিকে মেলায় ঐ অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। কারণ তারা দোকানপাঠ আয়োজন করে অল্পদামের মালপত্র কায়িক শ্রমে ভালোভাবে তৈরি করে বেশি দামে বিক্রি করতে পারে। মেলা সাধারণ মানুষের আনন্দ করবার মাধ্যম। নিচে কয়েকটি লোকমেলার বর্ণনা দেয়া হলো।

মুলিয়া কালী পূজার মেলা

সদর উপজেলার মুলিয়া ইউনিয়নের মুলিয়া গ্রামে কালীপূজা উপলক্ষ্যে কার্তিক মাসে ১দিন হয়। কালীপূজা উপলক্ষ্যে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয় বলে এটা কালীপূজার মেলা। অনেক দোকানপাট আসে এবং জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়।[১২]

চাকই মেলা

পৌষ মাস যাবার দিন বিছালি ইউনিয়নের চাকই গ্রামে মাঠের প্রান্তে বিরাট ঘোড়দৌড়ের মেলা হয়। বিভিন্ন এলাকার লোকজন উপস্থিত হয়। দোকানপাট আসে, কেনাবেচা হয়। শিশুকিশোরদের আনন্দের সীমা থাকে না। রং-বেরঙের খেলনা ক্রয় ও ঘোড়ার দৌড় দেখতে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনার শেষ নেই।

www.pathagar.com

বিলডুমুরতলার মেলা

সদর উপজেলার বিলডুমুরতলা গ্রামে পৌষ মাসের শেষদিন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মাঘ মোট তিনদিনব্যাপী বিরাট মেলা হয়। মেলায় ঘোড়দৌড় হয়। পুতুলনাচ হয়। জারিগান হয়, কুস্তি এবং লাঠিখেলা হয়। তিনদিনব্যাপী লোকজন ঐ গ্রামে উপস্থিত থাকেন এবং মেলা উপভোগ করেন। মেলা যথেষ্ট জমজমাট হয়।

টেংরাখালী মেলা

নড়াইল সদর উপজেলার ৯ নং সিংগাশোলপুর ইউনিয়নের অধীন বড়কুলা গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে টেংরাখালীর খাল প্রবাহিত। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে টেংরাখালীর খালের পাশে মাঘ মাসের পূর্ণিমায় বিরাট মেলা হয়। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষ শ্রেণির মানুষেরা এই মেলায় ভিড় জমায়। গ্রাম্যমেলা একদিকে যেমন পারস্পরিক সম্প্রীতি বাড়ায় অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই মেলায় বাঁশ ও বেতের তৈরি ধামা, কুলাসহ নানাবিধ তৈজসপত্র বিক্রি হয়। বহু লোক এবং দোকান আসে। জমজমাট হয় মেলা।[১৩]

ফেলা গোঁসাই এর মেলা

সদর উপজেলার উত্তর খলিশাখালী গ্রামে মতুয়া সম্প্রদায়ের একটা ধর্মীয় মেলা হয়। বহু মতুয়া দল, দোকান পসার ইত্যাদি এখানে আসে এবং সারাদিন-সারারাত জমজমাট মেলা হয়।

মোসলেম মেলা

সদর উপজেলার তারাপুর গ্রামে প্রয়াত চারণকবি মোসলেম উদ্দিন বয়াতির স্মৃতিরক্ষায় কবির জন্মতিথিতে তিনদিনব্যাপী কবির জন্মভূমিতে মেলা হয়। বিভিন্ন জেলা হতে বিভিন্ন ধরনের দোকানি মেলায় আসে এবং সময় ব্যয় করে। মেলায় পুতুলনাচ, লাঠিখেলা, জারিগান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলার নাম "মোসলেম মেলা"।

বিজয় মেলা

সদর উপজেলার ডুমদি গ্রামে প্রয়াত চারণকবি বিজয় সরকারের স্মৃতিরক্ষায় ৭ ফাল্গুন এক দিনের জন্য বিজয় সরকারের জন্মভূমিতে মেলা হয়। মেলায় দোকান পসার আসে এবং কবিগান কিংবা জারিগান অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলার নাম বিজয় মেলা।

বুড়িমার মেলা

সদর উপজেলার শেখহাটি গ্রামে অনেক আগে থেকে বুড়িমার মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে জনৈক বৃদ্ধা অনেক অলৌকিক কথা বলতে পারতেন এবং অলৌকিক কাজ দেখাতেন। তিনি মাঘ মাসের ১ম দিন একটা জাগযজ্ঞ দিয়ে মেলা করতেন। তার মৃত্যুর পর ঐদিনটিতে স্থানীয় লোকজন মেলা করে এবং বুড়ির স্মৃতিরক্ষায় নাম দিয়েছে 'বুড়িমার মেলা'।[১৪]

www.pathagar.com

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ মেলা

সদর উপজেলার চণ্ডিবরপুর ইউনিয়নের মহিষখোলা গ্রামে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বীরবেশে শহিদ ল্যান্স নায়েক বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ জন্মগ্রহণ করেন। বীরযোদ্ধার নামানুসারে বর্তমান ঐ গ্রামের নাম নূর মোহাম্মদনগর। সরকারিভাবে এখানে একটা জাদুঘর ও লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে, একটা কলেজ ও একটা মাধ্যমিক স্কুল বীরযোদ্ধার নামে স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের অভ্যুদয় যেমন আশ্চর্যজনক বিষয় ঠিক তেমনি হলো মাতৃভূমির স্বাধিকারের প্রয়োজনে বীর যোদ্ধাদের অকাতরে প্রাণবিসর্জন সময়ের সর্বোচ্চ বড় ত্যাগ। বাংলাদেশের ৭জন বীরশ্রেণির একজন নড়াইলের কৃতীপ্রাণ ল্যান্স নায়েক বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ–এর স্মরণে নূর মোহাম্মদ জাদুঘর ক্যাম্পাসে ০৩ হতে ১৫ দিনব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় সার্কাস, পুতুলনাচ, জারিগান, লাঠিখেলা, লোকখেলাধুলা ও প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ মেলা উপভোগ করে।[১৫]

লোহাগড়া উপজেলার লোকমেলা

বিভিন্ন পূজাপার্বণে, নববর্ষে, বিখ্যাত ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যুদিনে এ অঞ্চলে মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেমন-লোহাগড়ার জয়পুরে প্রখ্যাত কবিয়াল প্রয়াত তারক গোঁসাই এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস উপলক্ষ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ইতনা ইউনিয়নের ইতনা গ্রামে ১ দিনব্যাপী বৈশাখি মেলা বসে। ব্রিটিশ আমল থেকে এই মেলা হয়ে আসছে। একই গ্রামে ইউনাইটেড ক্লাবের সামনে ১ বৈশাখ উপলক্ষ্যে মেলা বসে। মেলায় জারি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এ মেলাকে তসরু মিয়ার মেলা বলে। একই ইউনিয়নের দৌলতপুর গ্রামে বৈদ্যের মাঠে চৈত্র মাসের শেষের দিন ও ১ বৈশাখে নামকরা বারুণী মেলা বসে। চৈত্র মাসে মধু কৃষ্ণা ত্রৈয়দশীতে বারুণী পূজা উপলক্ষ্যে এ মেলা হয়। এ মেলার প্রধান আকর্ষণ হলো বিভিন্ন সাঁচ, বাতাসা এবং মটর কলাই ফুট ভাজা। মেলায় যাত্রাগান ও কবিগানের আয়োজন করা হয়। লাহুড়িয়া ইউনিয়নের লাহুড়িয়া, হ্যাসলাগাতি, দিননাথপাড়া, পশ্চিমপাড়া, এগারনালি, কামারগ্রাম, সরশুনা, রাজাপুরসহ বিভিন্ন গ্রামে চৈত্র বৈশাখ মাসের বিভিন্ন দিনে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা ও জারিগান এবং মেলা অনুষ্ঠিত হয়। চৈতালি ফসল উঠার পরই এসব মেলা হয়। নির্দিষ্ট কোনো দিনে এই মেলা হয় না। মাকড়াইল গ্রামে প্রতিবছর চৈত্র মাসের শেষ দিনে মেলা বসে।

প্রতি বছর ব্রাহ্মণডাঙ্গায় চৈত্র মাসের শেষ এবং ১লা বৈশাখে দুদিনব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে ঘোড় দৌড়, গ্রামীণ লাঠিখেলা, জারি ও কবিগানের আসর বসে। এছাড়া শালনগর ইউনিয়নের বাতাসী গ্রামে বৈশাখ মাসের অক্ষয় তিথিতে দুই দিনব্যাপী হিন্দু মতুয়া মিশনের প্রধান প্রয়াত হরিচাঁদের মেলা হয়।

ইতনা ইউনিয়নের ইতনা গ্রামের একটি মাঠের মধ্যে হিজল গাছ তলায় গত চার বছর ধরে এক মহিলার তত্ত্বাবধানে চৈত্র মাসের মধু কৃষ্ণা তিথিতে বুড়োর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, গত কয়েক বছর পূর্বে ইতনা গ্রামের এক মহিলাকে মা কালী স্বপ্ন দেখিয়ে এই মাঠের মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার আদেশ দেন। এ অনুষ্ঠান করলে সমাজের জন্য মঙ্গল হবে। সেই থেকে এখানে প্রতি বছর মেলা শুরু হয়েছে।[১৬]

www.pathagar.com

তারক গোঁসাইয়ের মেলা

প্রতি বছর ফাল্গুন শিব চতুর্দশী (মৃত্যুবার্ষিকী) এবং অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম অমাবশ্যা তিথিতে (জন্মবার্ষিকী) জয়পুর ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামের তারক গোঁসাইয়ের পৈতৃক ভিটায় এ মেলা হয়। সারাদেশ থেকে হিন্দু মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষসহ তারক গোঁসাইয়ের লক্ষাধিক ভক্ত এ দুটি মেলায় সমবেত হয়। তবে জন্মবার্ষিকীর মেলায় বেশি মানুষের সমাগম ঘটে। এ মেলায় গ্রামীণ কুটিরশিল্প থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি হরেক রকমের খেলনা, চুড়ি, ফিতাসহ নিত্যব্যবহার্য সমস্ত ধরনের পণ্য পাওয়া যায়। এখানে শত শত দোকান বিভিন্ন পসরা সাজিয়ে বসে। এ মেলা দু'দিনব্যাপী হলেও আগে ও পরে দিয়ে প্রায় এক সপ্তাহ এসব দোকান-ঘর ও কেনাকাটা হয়ে থাকে। মেলাটি ধর্মীয় হলেও এখানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে এই মেলা দেখতে যান এবং সবাই কমবেশি কেনাকাটা করে বাড়ি ফেরেন।[১৭]

ব্রাহ্মণডাঙ্গার লোকমেলা

নওয়াগ্রাম ইউনিয়নের ব্রাহ্মণডাঙ্গায় প্রতিবছর চৈত্র্য মাসের শেষ দিন এবং বৈশাখ মাসের প্রথম দিন দুইদিনব্যাপী লোকমেলা বসে। কবে থেকে এ মেলা শুরু হয়েছে এলাকার মুরুব্বিরা কেউ বলতে পারেন না। তবে লোকমুখে জানা যায় কয়েক'শ বছর ধরে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ মেলা উপলক্ষ্যে বিশাল ঘোড় দৌড়, লাঠিখেলা, জারি ও কবিগানের আসর বসে। এছাড়া শিশুদের বিনোদনের জন্য নাগরদোলা আসে। মেলায় হরেক রকমের খেলনা, মিষ্টিসহ বিভিন্ন পণ্য পাওয়া যায়। মেলা উপভোগ করতে দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়।[১৮]

কালিয়া চড়ক পূজার মেলা

কালিয়া উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় অনেক লোকউৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসবগুলি ও অঞ্চলের বিখ্যাতির স্মারক স্বরূপ। কথিত আছে কালিয়া জনপদে বৈদ্য উপনিবেশ স্থাপনের আগে কালিয়া বেন্দা গ্রামে সর্ববিদ্যা ঠাকুরদের আগমন হয়। অতঃপর বড় কালিয়াতে আসেন হড়চৌধুরী উপাধিধারী ব্রাহ্মণ। এখন থেকে প্রায় দুইশো বছর আগে থেকে তারা কালিয়াতে চড়ক পূজা শুরু করেন। মজার বিষয় হলো হড়চৌধুরীদের প্রযত্নে অনুষ্ঠিত চড়ক পূজাটি চৈত্রসংক্রান্তির দিন না হয়ে পয়লা বৈশাখে অনুষ্ঠিত হয়। এর কারণ হলো : এই গ্রামে অর্থাৎ বড় কালিয়া গ্রামে আরও এক প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রযত্নে চড়ক পূজা হতো। আপসে তাঁদের জন্য ঐদিন ছেড়ে দিয়ে ডাক বাংলোর অর্থাৎ জেলা পরিষদের মাঠে সেই আদিকাল থেকে চড়কের মেলা বসে আসছে।

কালিয়া মৃত্যুঞ্জয় গোঁসাইয়ের মেলা

প্রতি বছর মাঘ মাসের ১লা তারিখ মন্দির প্রাঙ্গণে লোকউৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে কবিগান পরিবেশিত হয়। স্থানীয় শিল্পীরা নানারকম ধর্মীয় গানবাজনা করে এবং ঢাক-ঢোলসহ এলাকা পরিক্রমা হয়। দোকানে পাট দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন যথেষ্ট দেখা যায়।

www.pathagar.com

চাঁদপুর গ্রামে ঈদের মেলা

কালিয়া উপজেলার সন্নিকটে চাঁদপুর গ্রামে চার রাস্তার মোড়ে চাঁদপুর ঈদগাহের পাশে দুইটি ঈদ উপলক্ষ্যে উৎসব হয় এবং উৎসবকে কেন্দ্র করে নানা দ্রব্যের মেলা বসে।

কলাবাড়িয়ার শীতলা পূজার মেলা

কলাবাড়িয়া গ্রামের জেলে সম্প্রদায়ের লোকেরা অগ্রহায়ণ মাসের অমাবশ্যায় শীতলা দেবীর পূজা করেন। এ পূজাকে কেন্দ্র করে দুইদিনব্যাপী মেলা বসে। মেলার শেষদিন কবিগান হয়। শত বছর আগে থেকে শুরু করে আজো মেলাটি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

বড়দিয়ার কোজাগরি লক্ষ্মী পূজার মেলা

বড়দিয়া বাজারে কোজাগরি লক্ষ্মী পূজার পরের দিন একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক কাল আগে থেকে শুরু হওয়া এ মেলাটি আজও অব্যাহত আছে।

পেড়োলীর নৌকাবাইচ

বিশ্বকর্মা পূজার পরের দিন পেড়োলীতে চিত্রা ও নবগঙ্গা সঙ্গম স্থলে নৌকাবাইচ প্রায় ৯০ বছর ধরে চলে আসছে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত নৌকা প্রতিযোগিতা উপভোগ করার জন্যে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের সমাগম হয় এ স্থানে। দোকানপাট বসে ও হাজার হাজার লোক মেলাটি উপভোগ করে।

ভূঁইয়ের ভিটার মেলা

মাউলী গ্রামে ভূঁইয়ের ভিটেয় বৈশাখ মাসে প্রথম ৩ দিনের জন্য শিবপূজা উপলক্ষে মেলা বসে।

৭. রথযাত্রা ও রথমেলা

লোহাগড়া উপজেলার রথযাত্রা উৎসব

হিন্দু সম্প্রদায়ের আনন্দ ও ধর্মীয় উৎসবের একটি হলো 'রথযাত্রা' উৎসব। নড়াইলে রথের মেলা খুব পুরনো। শোনা যায়, দুশতাধিক বছর ধরে রথযাত্রা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এক সময় রথযাত্রা ও রথের মেলা বাংলাদেশের মধ্যে খুবই নামকরা ছিল।

জমিদার আমলে রথযাত্রার দিন আশপাশের বিভিন্ন জেলার জমিদার, তাদের পরিবারবর্গ ও মানুষ এ রথযাত্রা উৎসব দেখতে আসতেন। লোহাগড়ায় রয়েছে রথযাত্রা এবং রথের মেলার পুরনো ঐতিহ্য। প্রত্যেক বছর লোহাগড়ায় রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালিত হয়।

এই উৎসব হয়ে থাকে চন্দ্র আষাঢ়ের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে। এখানে রথযাত্রার প্রথম দিন সোজা রথযাত্রা লোহাগড়া শহর প্রদক্ষিণ করে এবং এর ৯ দিন পর উল্টো রথ টানার মাধ্যমে রথযাত্রা শেষ হয়। শোভাযাত্রার মধ্যে ভক্তবৃন্দ নৃত্যের তালে তালে ধর্মীয় গান গেয়ে থাকে। সোজা রথ ও উল্টো রথের দিনে লোহাগড়া

www.pathagar.com

কলেজ মাঠে বিশাল মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলায় আনুমানিক এক লাখ মানুষের সমাগম ঘটে। নড়াইল ছাড়াও কয়েক জেলার মানুষ এ মেলা দেখতে আসে। রথের মেলার দায়িত্বে রয়েছেন লোহাগড়া বাজারের অজয় কান্তি মজুমদার (৭০)। তার বাড়িতেই রথটি থাকে। এছাড়া মদন রায় (৬৫), রতন ঠাকুর (৫৫), শীতল চক্রবর্তীসহ অনেকেই মেলাটির দায়িত্বে থাকেন।

এছাড়া নলদী ইউনিয়নের মিঠাপুর বাজারে দেশ স্বাধীনের পর থেকে রথের মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ উপলক্ষ্যে ছোটখাট মেলাও বসে। রথের মেলায় বিভিন্ন ধরনের খেলনা, হস্ত, মৃৎশিল্পসহ নিত্যব্যবহার্য সব ধরনের জিনিসই পাওয়া যায়। এ মেলা যদিও ধর্মীয় বিষয়ভিত্তিক তবুও ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে বর্ণাঢ্য এ উৎসব পালিত হয় যুগযুগান্তর ধরে।[১৯]

সদর উপজেলার রথযাত্রা

বর্ষা মৌসুমে সিংগাশোলপুর গ্রামের ৪ আনা পাড়ায় রথের মেলা হয়। কৃষ্ণভক্তবৃন্দ রথে চড়ে কাঁদামাটি মেখে আনন্দ ফুর্তি করে। অবশেষে স্নান সমাপ্ত করে নাড়ু-মুড়ি-মড়কা-মিষ্টি-ফলফুল ইত্যাদি নিজেরা খায় এবং প্রতিবেশীদের মাঝে বিলায়।

কালিয়ার রথের মেলা

বর্তমান শহিদ আ. সালাম ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়ের পাশে দানবীর ভামিনীরঞ্জন সেনের প্রতিষ্ঠিত রথের মেলা খুবই বিখ্যাত।

৫২ মণ ওজনের রথটিতে বিভিন্ন মূর্তি অক্ষুণ্ন না থাকলেও দু'দিনব্যাপী মেলা হয়। আনুমানিক একশত বছর আগে থেকে মেলাটি শুরু হয়। দেশ বিভাগ, কালিয়ার স্থানীয় রাজনৈতিক সমস্যার কারণে হিন্দুরা দেশত্যাগী হওয়ায় রথের মেলা আগের মতো না জমলেও নিয়মমাফিক অনুষ্ঠিত হয়।

৮. গাসসি উৎসব

লোহাগড়া উপজেলায় "আশ্বিন মাসের শেষ দিনে গাসসি উৎসব" হয়। এদিন এ অঞ্চলের নওয়াগ্রাম, নলদী, কাশিপুর, জয়পুর, লোহাগড়াসহ বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্নভাবে এই গাসসি উৎসব হয়ে থাকে।

গ্রাম ভেদে এই উৎসবে একটু পার্থক্য দেখা যায়। এদিন এ উপলক্ষ্যে ভোর বেলায় ছেলেমেয়েরা পাড়ায় পাড়ায় কুলো, ঝাঁঝর, থালা-বাসন বাজিয়ে উচ্ছ্বাস-আনন্দ প্রকাশ করে। কোনো কোনো গ্রামে ছেলেমেয়েরা এসব বাজিয়ে মশার গান গেয়ে নিজ গ্রামের মশা অন্য গ্রামে বা এক বাড়ির মশা অন্য বাড়িতে তাড়ায়। লোকবিশ্বাস রয়েছে, এতে গ্রামে রোগ-ব্যাধি প্রবেশ করতে পারবে না।

এই উৎসবের পরদিন থেকে গ্রামের সবাই তালের আঁটি থেকে শাঁস বের করে খায়। আশ্বিন মাস যাওয়ার দিন গ্রামের শিশু-কিশোরেরা বেশ ঘটা করে এই শাঁস খাওয়ার উৎসব করে। আশ্বিনের শেষে কুলা বা থালা না বাজালে তালের আঁটি খাওয়া

www.pathagar.com

যায় না। খেলে চোখ অন্ধ হয়ে যায়। কোনো গ্রামে গরুর রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে এদিন সকাল বেলায় কলার পাতার মধ্যে চালের গুড়ো দিয়ে তৈরি চুষি পিঠা ও কাঁচা তিত পুঁটি মাছ মুড়িয়ে খাইয়ে দেওয়া হয়। এতে গরু রোগ বালাই থেকে মুক্ত থাকবে বলে বিশ্বাস রয়েছে।

আবার কোনো গ্রামে এদিন ধানকে সাধ খাওয়ানো হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ে যেমন বিবাহিতা মেয়েদের ৭ মাসের গর্ভবতী হলে বাপের বাড়িতে সাধ খাওয়ানো হয়। তেমনি আশ্বিন মাসে আমন ধান পাকার পূর্বে ধানকে সম্মান দেখিয়ে ধান গাছের দিকে তাকিয়ে এক ধরনের ছড়া বলে। যাকে ধানকে সাধ খাওয়ানো বলে। যেমন :

এককান ভূইর
চারকেন কোনা,
দান ফুলিছে কাইলে সোনা,
দানরে তুই সাদ খা,
দানরে তুই সাদ খা,

বুড়ি গ্যালো দোড়োইয়ে,
দান পড়িছে গোড়োইয়ে,
দানরে তুই সাদ খা,
দানরে তুই সাদ খা॥[২০]

এদিন সাধারণত শিশু কিশোর-কিশোরী এমনকি বড়রাও হাতে পায় কাঁচা হলুদ নিম পাতা মেখে গোসল করে। এতে চুনকানি, পাচড়া বা অন্য কোনো ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকবেন। অধিকাংশ বাড়িতে গুড়ের রসের সিন্নি ও কুলি পিঠা তৈরি হয়।

ছড়ার শব্দের অর্থ : এককান-একখানা, ভূইর-জমি, চারকেন-চারখানা, কাইলে সোনা-একটি ধানের জাত, সাদ-খাবার, দোড়োইয়ে-দৌড়াইয়ে।

গাসসির গান

মশা মশা কান কোরেশা
কানে বাঁধা দড়ি
সকল মশা তাড়ায় দিলাম
কানুর মার বাড়ি
কানুর মারে খুচে খুচে খা॥

কচু বুনে মশারে ভাই লম্বা লম্বা হুল
সকল মশা তাড়াইয়ে দিলাম বড়ো গাঙ্গের কূল
গাঙ্গের কূলেগে খুচে খুচে খা॥

কলা বুনে মশারে ভাই মুখে চাপদাড়ি
সকল মশা তাড়ায় দিলাম গেদুর মার বাড়ি
গেদুর মারে খুচে খুচে খা॥[২১]

www.pathagar.com

৯. ওরস

লোহাগড়া উপজেলার ওরস

এ উপজেলায় বিশেষ করে শীত মৌসুমে বিভিন্ন দরগাহ, মাজার এবং কোনো না কোনো পিরের মুরিদ ও ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে বার্ষিক ওরস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কয়েক বছর পূর্বেও বিভিন্ন গ্রামে জাঁকজমকভাবে ওরস হলেও বর্তমানে এর ব্যাপকতা কমছে। মাওলানা, মৌলবিদের একটি অংশ এই ওরসকে নিরুৎসাহিত করছে। লোহাগড়া পৌরসভার রামপুরা এলাকায় এক পির শাহ্ ফজু দেওয়ানের মাজার রয়েছে। আনুমানিক ১২৫ বছর পূর্ব হতে এখানে প্রতিবছর ফাল্গুন মাসে ভক্তদের উৎসাহে ওরস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হাজার হাজার নরনারী চিরকুমার এই পির ফজু দেওয়ান শাহ্-এর মাজারে তাদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে।

দিঘলিয়া ইউনিয়নের কোলা দিঘলিয়া খানকাহ্ শরীফে ২৮ ফাল্গুন ওরস অনুষ্ঠিত হয়। আলহাজ শাহ্ সুফি আদম আহম্মেদ (ধলা হুজুর)-এর স্মরণে যুগ যুগ ধরে এখানে ওরস অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কোলা দিঘলিয়া গ্রামে বাংলা ১২২০ সনে এই পির জন্মগ্রহণ এবং ১২৮৩ সনে কালিয়া উপজেলার পিরোলী গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। নওয়াগ্রাম ইউনিয়নের নওয়াগ্রাম সায়েব আলী পির সাহেবের বাড়িতে প্রতি বছর ১৩ ফাল্গুন ওরস মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকার দোহার এলাকার পির শাহ লাল নুরুলা-এর স্মরণে প্রতি বছর লোহাগড়ার কামঠানা গ্রামের ধুনাউল্লাহ ফকিরের বাড়িতে ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমাতে ওরস অনুষ্ঠান হয়। এ পিরের অনুসারীরা এদিন সারা রাত আধ্যাত্মিক, দেহতত্ত্ব, মারফতি, মুর্শিদি ও ভক্তিমূলক গান গায়। এ গানের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে থাকে হারমোনিয়াম, দোতারা, প্রেমজুড়ি ও করতাল। এখানে পিরের অনুসারী কয়েক'শ শিষ্য রয়েছে। লাহুড়িয়া ইউনিয়নের লাহুড়িয়া ফাজিল মাদ্রাসার লাগোয়া পশ্চিম পাশে প্রতিবছর ফাল্গুন ২২ মাঘ পাগল পিরের ওরস হয়।[২২]

১০. বিয়ে

কালিয়া উপজেলার ঘোষ সম্প্রদায়ের বিবাহে এক সময় বর চেয়ারে বসতেন, আর কনে তাঁকে ঘিরে সাতপাক ঘুরতেন। এখন এ প্রথা লুপ্ত হয়েছে। আগে বিবাহ করতে গিয়ে বর শ্বশুরালয়ে তিনদিন অবস্থান করতেন। সে নিয়ম এখন বিলুপ্ত হয়েছে। অন্য সম্প্রদায়ের বিবাহ যেখানে ফাল্গুন, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে হয় সেখানে ঘোষ সম্প্রদায়ের বিবাহ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বর্ষাকালে অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. ডা. রবিউল ইসলাম, কলোড়া, নড়াইল। তারিখ : ০৭.১২.১১
২. প্রণব কান্তি অধিকারী, গ্রাম–বাকলা, এগারখান, নড়াইল। তারিখ : ১৪.১২.১১
৩. সালমা বেগম, মাইজপাড়া, নড়াইল। তারিখ : ২৪.৯.১১

www.pathagar.com

৪. রাজীব আহম্মেদ (৬০), ইতনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ইতনা সেবা সমিতির সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ইতনা, ইতনা ইউনিয়ন। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ০৩.০২.১২
৫. শিবনাথ সাহা (৫০), দিঘলিয়া বাজার, ও প্রভাত মেম্বর (৬০) লুটিয়া গ্রাম, দিঘলিয়া ইউনিয়ন। সংগ্রহের তারিখ ২৮.০১.১২ । সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (৫০), নারানদিয়া, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা : তারিখ : ২০.০১.১২
৬. আসাদুজ্জামান, হাগলাডাংগা, নড়াইল, তারিখ : ১২.১২,১১
৭. আকরাম শাহীদ চুন্নু, আলাদাতপুর, নড়াইল। তারিখ : ২৭.৯.১১
৮. আবুল খায়ের শেখ (৫৫) /ইতনা, ইতনা ইউনিয়ন, লোহাগড়া। তারিখ : ২৬.০১.১২
৯. নারায়ণ চন্দ্র মিত্র (৫৩), রায়গ্রাম, গাউসুল আজম মাসুম (৩৩), ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রাম, নওয়াগ্রাম ইউনিয়ন। বয়াতি কামরুল হাসান (৪৭), আকরাবাড়ি, দিঘলিয়া ইউনিয়ন; শিক্ষক রাজীব আহম্মেদ (৬০), ইতনা সেবা সমিতির সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ইতনা ইউনিয়ন। তারিখ : ০৩.০২.১২
১০. রেজাউল ইসলাম (৩৫), উপজেলা প্রতিনিধি, দৈনিক সমকাল, লোহাগড়া। তারিখ ০৫.০২.১২
১১. প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য, কলাম লেখক, রূপগঞ্জ, কামনামিত্র, রূপগঞ্জ ১১.১২.১১ ও নুরজাহান বেগম, বাগডাংগা, নড়াইল। তারিখ : ১৪.১২.১১
১২. শান্তনু চট্টোপাধ্যায় (৪৬), ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রাম, নওয়াগ্রাম ইউনিয়ন। শিক্ষক অমীয় কুমার দাস (৫৫), ব্রহ্মণীনগর, নলদী ইউনিয়ন, দেলোয়ার হোসেন দিলু (৫৩), আহবায়ক, ব্রাহ্মণডাঙ্গা মেলা উদ্‌যাপন কমিটি, নওয়াগ্রাম ইউনিয়ন। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২০.০১.১২
১৩. দীনেশচন্দ্র ঘোষ, পিতা-হরশিতকুমার ঘোষ, বড়কালিয়া, কালিয়া। তারিখ ২০.০৮.২০১১
১৪. শেকড়ের সন্ধানে, সম্পাদনা, মো. রওশন আলী, নড়াইল।
১৫. গাউসুল আজম মাসুম (৩৩), ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রাম, নওয়াগ্রাম ইউনিয়ন। শিক্ষক রাজীব আহম্মেদ (৬০) ইতনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ইতনা ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা : সংগ্রহের তারিখ : ০৪.০২.১২
১৬. পরেশ সমাদ্দার (৪৭), তারক গোঁসাই জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক, জয়পুর, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা : তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ০৬.০২.১২
১৭. দেলোয়ার হোসেন দিলু (৫৫), আহবায়ক, ব্রাহ্মণডাঙ্গা মেলা কমিটি, গাউসুল আজম মাসুম (৩৩), ব্রাহ্মণডাঙ্গা, নওয়াগ্রাম ইউনিয়ন.লোহাগড়া উপজেলা : সংগ্রহের তারিখ : ০৬.০২.১২
১৮. শিক্ষক অমীয় দাস (৫৫), ব্রহ্মণীনগর, মিঠাপুর বাজার, নলদী ইউনিয়ন, তারিখ ২৬.০১.১২, অজয় কান্তি মজুমদার (৭০), লোহাগড়া বাজার, লোহাগড়া পৌরসভা। তারিখ ২৯.০১.১২
১৯. দীনেশচন্দ্র ঘোষ, প্রাগুক্ত।
২০. পরেশ সমাদ্দার (৫০), কৃষ্ণপুর, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা : তারিখ : ২৩.০১.১২
২১. আজম মাসুম (৩৩), ব্রাহ্মণডাঙ্গা, নওয়াগ্রাম ইউনিয়ন, কবি ইউনুস শেখ (৬৫), দিঘলিয়া, দিঘলিয়া ইউনিয়ন, লোকসংগীত শিল্পী ও গবেষক সরদার গোলাম মোস্তফা

www.pathagar.com

(৫৮), কামঠানা, লোহাগড়া ইউনিয়ন। শিক্ষক আব্দুল জলিল (৩০), লাহুড়িয়া, গ্রাম সৈয়দ পাড়া, লাহুড়িয়া ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা : তারিখ : ০৯.০২.১২, ইং শিক্ষক মেরাজ খান (৩০), লাহুড়িয়া গ্রাম, লাহুড়িয়া ইউনিয়ন, শিবনাথ সাহা (৫৫), দিঘলিয়া বাজার, দিঘলিয়া ইউনিয়ন। সংগ্রহের তারিখ : ০১.০২.১২

২২. জয়নাল আবেদীন (৫৭) গ্রাম ইতনা. ইতনা ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা : তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ০১.০২.১২

www.pathagar.com

আচার-অনুষ্ঠান

গ্রামীণ সমাজ জীবনে কিছু অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয় যা ঐতিহ্যবাহী। এসব অনুষ্ঠানকে উৎসব না বলে বরং আচার-অনুষ্ঠান বলাই সঙ্গত। ব্রত পালন কিংবা মায়ের গর্ভে শিশু জন্ম নেওয়ার পর কিংবা বধূ বরণের ক্ষেত্রে যে ধান দূর্বার ব্যবহার করার রীতি তা আচার অনুষ্ঠানেরই উদাহরণ।

সদর উপজেলার আচার-অনুষ্ঠান

বাংলাদেশের ন্যায় নড়াইলেও হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষ শ্রেণির মানুষের মাঝে আচারধর্মী উৎসব অনুষ্ঠান লক্ষ করা যায়। সামাজিকভাবে মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করার ক্ষেত্রে জীবন চলার পথে নানাবিধ বিষয় যেগুলি ধর্মবিধি কিংবা রাষ্ট্রীয় আচার নয় তবে সমাজে কাজগুলি প্রচলিত হয়ে তা মানুষের নিত্য জীবনের বাধ্যতামূলক কর্ম হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যেমন—মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে শব-ই-বরাতে রুটি, মাংস, পায়েস ইত্যাদির ব্যাপক আয়োজন ও পরস্পরের মাঝে বিলি করা। মিলাদ মাহফিল হলে মিষ্টান্ন কিংবা অন্যান্য খাবারের ব্যবস্থা করা।

মেয়ের বিয়ে হলে বরপক্ষ বাড়ি ঢোকার পথে কলার গাছ পুতে রঙিন কাগজের গেট তৈরি করে বরপক্ষের নিকট হতে অর্থ আদায় করা। বিবাহে কন্যা পক্ষে (সাধারণত কন্যার মামা) উকিল নিযুক্ত হয়ে বিয়ের সংলাপ মওলানার সঙ্গে উচ্চারণ করে বরের হাতে হাত রেখে বরকে কন্যা সম্প্রদানের মধ্যস্থতা করা এবং গ্রাম্য রেওয়াজ মোতাবেক ২ বার কিংবা ১ বার বলার পর চুপ থাকা এবং অর্থ পেলে পুনরায় কথা বলা। কারণ ধর্মীয় বিধিতে একবার বললেই বিয়ে সম্পন্ন হয় কিন্তু সাধারণত তিনবার বলা হয় প্রাসঙ্গিক যৌক্তিক কারণে।

সেজন্য একের অধিকবার কথা না বলে অর্থ আদায় একটা প্রচলিত আচারে পরিগণিত হয়েছে। শীতকালে নড়াইলে প্রচুর খেজুর রস পাওয়া যায় এবং এসময় ভোর বেলা রসের তৈরি পায়েস প্রায়ই বাড়িতে রান্না হতো। রসের পায়েস রান্না হলে কিংবা রসপিঠে তৈরি হলে প্রতিবেশীদের ২/১জনকে পায়েস কিংবা রসপিঠা বিলানো গ্রামবাংলার আচার।

বাড়ির কোনো সন্তানের সুন্নাতে খাৎনা দিলে ৪দিন বা ৭ দিন পর প্রতিবেশীদের ডেকে ঘটা করে ঐ সন্তানের গোসল করানো হয়। প্রতিবেশীদের আগেভাগে দাওয়াত দেয়া হয়। এটাকে সুন্নাতে খাৎনার "আইয়ে" অনুষ্ঠান বলে। প্রতিবেশীরা গুড়ের পায়েস নিয়ে যায় এবং আয়োজকরা পান সুপারি দিয়ে সকলকে আপ্যায়ন করে এক্ষেত্রে ভাবি সম্পর্ক স্থানীয় মহিলারা কাদামাটি করে খুশি হয়। কোনো মহিলার সন্তান হবার

www.pathagar.com

পর ৩ দিন পর ৪র্থ দিনে ব্যবহার্য পোশাক পরিচ্ছদ গরম পানিতে পরিষ্কার করা হয়। গ্রাম বাংলায় এটাকে "আতুড়" পরিষ্কার বলে। ধর্মীয় বিধি কিংবা চিকিৎসা শাস্ত্রে এমন কোনো বিধান নেই। আশ্বিন মাস যাবার দিন আগে গ্রামের সকলেই ভোরবেলা নদীতে কুলায় করে বুনোফুল ভাসাতো এবং গ্রামের চৌরাস্তার উপর সন্ধ্যায় সিন্নি রান্না করতো। সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে এই আচারে উপস্থিত থাকতে দেখা যেতো।

প্রতিটি বাড়িতে মাটির বাটিতে তেল এবং কাপড়ের সলিতা দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হতো। বর্তমানে কিছু কিছু গ্রামে এ আচার অনুষ্ঠিত হয়। রবিশস্য কিংবা ধানের বীজ সংরক্ষণের জন্য এক প্রকার মাটির পাত্র তৈল দিয়ে পালিশ করে উঁচুতে রাখা হতো। বর্তমানে অবশ্য এ ব্যবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এমনি করে মুসলিম সমাজে অনেক আচার অনুষ্ঠান দেখা যায়।

তবে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে আচার অনুষ্ঠান বেশি দেখা যায়। যেমন সূর্য কিংবা চন্দ্র গ্রহণ লাগলে যতক্ষণ সূর্য কিংবা চন্দ্র গ্রহণ মুক্ত না হয় ততক্ষণ কেউ কিছু খায় না। কোনো খাবার রান্না হলে যদি গ্রহণ লাগে তবে ঐ খাবার কেউ খায় না বরং গ্রহণ শেষে স্নান করে তারপর খায়। গ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলারা অস্ত্র দিয়ে কোনো কাটাকাটির কাজ করে না।

অবশ্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝেও কেউ কেউ এ আচার মান্য করে–এটা অন্ধ বিশ্বাস। হিন্দু বিধবা রমণীরা মাংস, মাছ খায় না- নিরামিষ খাবার খায়, সাদা পোশাক পরে। প্রত্যেক নারী ভোরবেলা গ্রামের বাড়িতে গরুর গোবর আনাচে কানাচে ছিটায় এবং স্নান করে তুলসী গাছের তলায় পূজা দেয়। সন্ধ্যায় ঘরে প্রদীপ জ্বালানো হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার গ্রামে মাটির ঘরের ভিতর বাহির লেপ দেয়া হয়- সন্ধ্যায় লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়া হয়। বৈশাখের ১ম দিন ঘটা করে ছোটরা বড়কে প্রণাম করে। ফলফলাদি পাড়াপ্রতিবেশীদের দেওয়া হয় এবং সকলে খায়।

গরুকে ভোরবেলা স্নান করিয়ে গরুর শরীরে তেল বিশেষ করে মাথায় তেল সিঁন্দুর দেয়া হয়। অমাবশ্যা পূর্ণিমায় উপবাস পালন করা হয়। মা বাবা মারা গেলে ৯ দিন, ১১ দিন, ২১দিন এক কাপড়ে থেকে নিজেই রান্না করে খেতে হয় এবং একটা ছড়ি সবসময় সঙ্গে রাখতে হয়। বৈশাখের প্রতি মঙ্গলবার চণ্ডিপাঠ করা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রত্যেক জামাই শ্বশুর বাড়িতে যায় এবং ঘটা করে সামর্থ্যমতো জামাইকে সকলে উপহার দেয়। শ্রাবণ মাসে সোমবার উপোস থেকে হিন্দু রমণীরা মন্দিরে যায় এবং শিব ঠাকুরের জন্ম উৎসব পালন করে। ভাদ্র মাসে কেহ বিয়ে করে না। নতুন বাড়িতে ওঠে না। সন্তান জন্মাবার পর পাঁচ মাস বয়সে সন্তানের মুখে ভাত দেওয়া বড় ধরনের আচার তবে ভাদ্র মাসে এটা হয় না।

এমনকি ভাদ্র মাসে কোনো গাভী বাচ্চা প্রসব করলে ঐ গাভীর দুধ কোনো পূজায় দেওয়া হয় না। ভাদ্র মাসে উৎসব জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করা। পৌষ মাসে সকলের পোশাক পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য তৈজসপত্র পরিষ্কার করা হয়। ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব ও রং খেলা সর্ববৃহৎ আচার অনুষ্ঠান। সন্তান জন্মের পর প্রথম সাতদিন নবজাতক এবং তার মায়ের ব্যবহৃত পোশাকগুলি ফেলে দেয়া হয় এবং ১ মাস পর্যন্ত

www.pathagar.com

কোনো পূজা দেওয়া হয় না। গর্ভবতী মহিলাদের শনিবার কিংবা মঙ্গলবার বাড়ি হতে বের হতে দেওয়া হয় না। কোন লোক মারা গেলে মৃতকে দেখতে গেলে সকলকে অবশ্যই স্নান করতে হয়। এটা আগে মুসলিম সমাজেও প্রচলিত ছিল।[১]

লোহাগড়া উপজেলার আচার-অনুষ্ঠান

অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও মুসলমান হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানাদিতে বিভিন্ন প্রকার আনন্দ উৎসব ও আচারাদি পরিলক্ষিত হয়। বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হবার পর প্রথমে বর ও পরে কনের আশীর্বাদ করা হয়।

গায়ে হলুদের দিন বর-কনেকে স্ব স্ব বাড়িতে গোসলের পর উভয়পক্ষ থেকে পাঠানো নতুন পোশাক পরানো হয়। অনেক পরিবারে এখনও ধান, দূর্বা, ফুল, মোমবাতি বরণকুলায় এসব দ্রব্য নিয়ে বর বা কনেকে বরণ করা হয়। আবার এসব দ্রব্য নিয়ে নৃত্য গীতের মাধ্যমে বর বা কনেকে বরণ করে।

তবে বর্তমানে নৃত্য গীতের প্রচলন অনেকটাই কমে গেছে। বিয়ের দিন বর আত্মীয়, বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে কনের বাড়িতে আসেন। কনের বাড়ির প্রবেশ মুখে সুদৃশ একটি গেট থাকে। এই গেটে ইংরেজি ও বাংলায় দু'পক্ষের লোকদের কথোপকথন বেশ জমে ওঠে এবং এসময় ভেতরে প্রবেশের জন্য বরপক্ষের কাছে কনেপক্ষের ছেলেমেয়েরা নির্দিষ্ট একটি অর্থ দাবি করে।

এক সময় দু'পক্ষের মুরুব্বিদের মধ্যস্থতায় কনে পক্ষকে অর্থ দিয়ে এবং সন্তুষ্ট করে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। এ নিয়ে অনেক সময় তিক্ততারও সৃষ্টি হয়। বর নববধূর জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী স্বর্ণালংকার, শাড়ি, চুড়িসহ আনুষঙ্গিক সব কিছু এবং নববধূর বোন, মা, বাবা ও আত্মীয়ের জন্যে শাড়ি ও কাপড় নিয়ে আসেন। কনে পক্ষ যথাসম্ভব বর পক্ষকে আপ্যায়ন করেন। বিয়ের এক অথবা দু'দিন পরে বরের বাড়িতে নববধূর উদ্দেশ্যে বউ-ভাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বউ-ভাতের দু-একদিন পর বর কনের বাড়িতে তিন দিন অথবা পাঁচ দিনের জন্য যান (একে স্থানীয়ভাবে মেলানি বলে)। এভাবে বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে, হবার সময় এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সামাজিক আচারাদি ও রেওয়াজ রয়েছে।

এক সময় সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা, জায়া-জননীরা লোকজ বাহন পালকিতে চড়তেন। এক জায়গা থেকে অন্য স্থান বা আত্মীয়ের বাড়িতে ছাড়াও বিবাহের কাজে পালকি ব্যবহৃত হতো। কাশিপুর ইউনিয়নের নোয়াকগ্রাম ও খালবরাত গ্রামে এখনও কয়েক ঘর বেহারার (যারা পালকি চালায়) সম্প্রদায় বসবাস করে। অনেক সময় অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে এটাওটা দিতে চেয়ে বার বার বিনয় প্রকাশ করে। আত্মীয়-স্বজন বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার সময় তাদেরকে বলা হয় আরও দু-এক দিন থেকে যান। অথবা বলা হয় আবার আসবেন।

এ ধরনের শিষ্টাচার লোকাচারের অন্তর্গত। হিন্দু সমাজে বর্ণ প্রথার কারণে বিভিন্ন কাস্টের মধ্যে বিবাহ, মেলামেশা, খানাপিনা, উঠাবসা, পেশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু বিধি-নিষেধ রয়েছে। হিন্দু সমাজে নিজস্ব কাস্টের মধ্যেই বিবাহ করতে হয়। তবে এসব বিধিনিষেধের কঠোরতা আস্তে আস্তে কমছে।

www.pathagar.com

মুসলিম সমাজে অবশ্য বর্ণ প্রথার কঠোরতা নেই। এখনে এক গোত্র বা বংশের সাথে অন্য গোত্র বা বংশের পাত্রপাত্রীর বিবাহ হয়ে থাকে। আবার মেলামেশা, খানাপিনা, উঠাবসা, পেশার ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ নেই। এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সবাই সবার সাথে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান করে থাকে। তবে মুসলিম সমাজে কলু, বাদ্যকর, কারিকর, বেহারা সম্প্রদায়কে অন্য বংশের মানুষ একটু ছোট করে দেখে। এদের সাথে সাধাণরত অন্য বংশের লোকেরা আত্মীয়তা করতে চায় না।

গ্রামীণ জীবনধারায় পান একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে রয়েছে। কোনো অতিথি আপ্যায়ন করার পর বা কোনো নিমন্ত্রণে ভূরিভোজের পর পান এখনও অত্যাবশ্যকীয়। অতীতকালে বিবাহের সময় জামাই যখন মজলীগে বসতেন তখন পান সাজিয়ে প্রশ্ন করা হতো :

পান খাও পণ্ডিত ভাই কথা কও ঠারে
পানের জন্ম কও কোন্ অবতারে
যদি না কও পানের জন্ম কথা
ছাগল হইয়া চাবাইয়া খাও চড়া কাঁঠাল পাতা।

পান পান সাবাস পান
অবিচারে খাইলে পান
কাটা যাইবে জামাইয়ের কান।

গ্রামের লোকজন আজও বলে :

দুলার বাপে খাইয়া পান
কয় যে আন্ আরও পান,
এমন সুন্দর পান কন্যার
না জানি কন্যা হবে কতই না সুন্দর,
জনমনে আজ সুরের ধনি শোনা যায় যে
চিত্রা নদীর বাঁধা ঘাটে ভিড়াইয়া নাও
বন্ধু পান খাইয়া যাও।[২]

কালিয়া উপজেলার ঘোষ সম্প্রদায়ের জীবনাচরণ

ঘোষদের জীবন আচরণের মধ্যে রয়েছে প্রতিদিন ঘর-উঠান ঝাড়ি দেয়া। সকালে উঠে তুলসী তলায় প্রণাম করা। ঘর নিকানো, শ্রীকৃষ্ণের ছবিকে কিংবা মূর্তিকে পূজা করা। এছাড়া এক সময় গোবর দিয়ে ছাড়া দেয়া হতো। ঘোষদের মধ্যে শ্যামা কালী পূজার প্রচলন থাকলেও ইদানীং শ্রীকৃষ্ণের জন্মষ্টমী প্রায় ৭৫% লোক করছেন।

জন্মমৃত্যু-বিবাহ নিয়ে যে জীবন সে জীবনে জন্মকে নিয়ে তেমন কোনো লোকাচার না থাকলেও মৃতের সৎকার অর্থাৎ শবদাহ করার বিষয়ে অনেকটা পরিবর্তন লক্ষণীয়। আগে চিতায় শবদেহকে নগ্ন করে তুলে দেয়া হতো। এখন শবদেহ স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে চিতায় তুলে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

বিবাহে এক সময় বর চেয়ারে বসতো আর কনে তাকে ঘিরে সাতপাক ঘুরতো। বর্তমানে সে প্রথা অবলুপ্ত। বিবাহে শ্বশুরালয়ে তিন দিন থাকার নিয়ম ছিল। সে নিয়মটি এখন নেই। তবে এরপর বিবাহটা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বর্তমানে অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রাদ্ধকর্ম আগে ছিল ৩০ দিন। এখন ১৩ দিনে তা প্রচলিত হলেও অনেকে ১১ দিনে করার পক্ষপাতি। ১লা বৈশাখে এরা সারা গ্রাম জুড়ে নাম কীর্তন করে।

হবিষ্যান্নে শুধু ভাতই রান্না করা হয়। রান্নাটা করেন স্বামী, স্ত্রী নয়। একাদশী পালন প্রায় ৫০ শতাংশ লোক করে থাকেন।[৩]

১. শনি তাড়ানো

ভাদ্র মাসের কোনো এক শনিবার তাল গুলে তার সঙ্গে চাউলের গুঁড়া ও চিনি মিশিয়ে কলার পাতার মধ্যে রেখে আগুনে সেঁকা দিয়ে খাওয়ার নিয়ম প্রচলিত আছে। এ অঞ্চলের এরকমই লোকবিশ্বাস যে, মানুষের জীবনে যা কিছু অশুভ বিষয় ঘটে তা সব শনির প্রকোপের জন্যে। যদি শনিকে শান্ত রাখা যায় তা হলে কোনো ক্ষতিকর কিছু ঘটবে না। এরকম মনোভাব থেকে শনিবারে বারের শিরনি দেয়াসহ ভাদ্র মাসের তাল দিয়ে শনি খেদানো প্রথার চল আছে।[৪]

২. ঘট পূজা

মনসাপূজা বা ঘট পূজা

মনসা পূজাকে ঘট পূজা বলে। শ্রাবণ মাস যাবার দিন অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের শেষ দিনে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পাড়ার ৪-৫ ঘর এক সঙ্গে ঘট স্থাপন করে মনসা পূজা করে, অথবা কালিয়ার বিখ্যাত মনসাবাড়িতে বিভিন্ন পদের ঘট, দুধ, কলা, অন্যান্য মিষ্টি নেওয়ার রেওয়াজ থাকলেও এ পূজায় দুধ-কলারই প্রাধান্য। দুপুরের আগে ১-২ ঘণ্টার মধ্যে এ পূজা শেষ হয়ে যায়। মন্ত্র বর্জিত এ পূজায় মা মনসার কাছে ভালো থাকার জন্যে, সাপের উপদ্রব না হওয়ার জন্যে প্রার্থনা করে।

কখনও মনসার পাঁচালি পড়ে পূজা করা হয়। মনসার পাঁচালিতে 'বন্দনা', 'মনসার প্রণাম', 'মঙ্গলাচরণ,' 'মা মনসার পূজা প্রচলন,' 'মনসার স্তুতি', 'মনসার জন্মকথা', 'মনসার সহিত চাঁদের বিবাদ', 'লখিন্দরের জন্ম', 'চাঁদের দুর্দশা ও গৃহে পুনরাগমন', 'লখিন্দরের বিবাহ', 'সর্পদংশনে মৃত্যু ও পুনর্জীবন প্রাপ্তি', 'চাঁদ কর্তৃক মনসার পূজা' ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়।

এ পূজায় সাপ চিহ্নিত ঘটসহ সরা থাকে। প্রসাদে থাকে সাধারণত চিনি, কলা, আলোচাল দিয়ে নৈবেদ্য, আখ, লেবু, খেজুর প্রভৃতি। আর একটি বিশেষ প্রসাদ থাকে সেটিকে বলে 'ন্যাড়াই'। একটি আঞ্চলিক শব্দ। এটি একটি বিশেষ দ্রব্য সামগ্রীর মিশ্রণ। আতপ চালের গুঁড়া, চিনি, কলা, নারকেল, ভাজা তিলের গুঁড়া ও তুলসী পাতার মিশ্রণে ন্যাড়াই প্রস্তুত হয়। এটি কাঁচা ন্যাড়াই। আর এক প্রকার ন্যাড়াই তৈরি হয় ভাজা চালের গুঁড়া এবং উপর্যুক্ত দ্রব্য সামগ্রীর মিশ্রণে। তাকে বলে পাকা ন্যাড়াই। এটি অঞ্চলের হিন্দু জনসমষ্টির কাছে ঐতিহ্যবাহী প্রসাদ।[৫]

www.pathagar.com

ক্ষেত্রকুলই পূজা

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিনে কার্তিক মাসের ফসল অর্থাৎ যাকে বলে কাতেন ফসল। ভালোভাবে ঘরে তোলার প্রশ্ন থেকে এ পূজার আয়োজন। পাড়ার কয়েক পরিবারের কয়েকজন সধবা একত্রিত হয়ে এ পূজা করেন।

এ পূজা কুলগাছ তলায় অনুষ্ঠানের রেওয়াজ থাকলেও সেটি সম্ভব হয় না বলে কুলগাছের ডাল ভেঙে বা কেটে একটি জায়গায় পুঁতে ঘট স্থাপন করা হয়। তারপর প্রসাদ স্বরূপ যবের ছাতু, ভুট্টার ছাতু, বুট, কলাই, সরিষা বিভিন্ন পাত্রে রেখে ধর্মীয় বা প্রচলিত উপাখ্যানের বয়ান দিয়ে পূজা শেষ হয়। বিকাল ৩-৪ টার সময় শুরু করে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এটি কৃষক পরিবারের পূজা।[৬]

গোফাগুনে

গরুর কাছে বিশেষ আবদার করার উদ্দেশ্য থেকে এ ব্রতের বা পূজার আয়োজন। ফাল্গুন মাস যাবার দিন অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের শেষ দিনে গোয়াল ঘরে অনুষ্ঠিত হয় এ পূজা। গরুকে গোসল করিয়ে কপালে তেল সিঁদুর দিয়ে বরণ করা হয়। বরণান্তে প্রসাদ সমবেত ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিশেষ কোনো মন্ত্র নেই এ পূজার। তাই পরম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রসাদ নিবেদন করা হয়।

এ পূজার একটি বিশেষ নিয়ম হলো : একটি রাখালকে ডেকে এনে তাকে দিয়ে গাভীর পিঠের ওপর লাঠি দিয়ে মৃদুভাবে পেটানো হয়, আর গৃহস্থের মনস্কামনা অনুযায়ী বলা হয় :

গাই গরুর কপালে চিত,
আঁড়ে থুয়ে বকনা দিস।

গৃহস্থের আঁড়ে গরুর প্রত্যাশা থাকলে এই কথাটি একটু ঘুরিয়ে বলা হয় :

গাই গরুর কপালে চিত
বকনা থুয়ে আঁড়ে দিস।

এছাড়া, গাভীর কাছে যে কামনাটি প্রাধান্য পায় সেটি হলো : তারা যেন প্রতি বছর বাছুর দিয়ে গৃহস্থের গোয়াল পূর্ণ করে তোলে। পরিশেষে গোপাগুনে কথাটির বিশেষ প্রচলন থাকলেও, ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত এ পূজাটির নাম গোফাগুনেই হবে।[৭]

লক্ষ্মীপূজা

শুধু ধান নয়, হিন্দু জনসমষ্টি মনে করেন প্রত্যেক ফসলই লক্ষ্মীদেবীর আশীর্বাদের ফলশ্রুতি। তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া ভালো ফসল হওয়া সম্ভব নয়।

তাই সারা বছর জুড়ে সপ্তাহের প্রত্যেক বৃহস্পতিবার নিরামিষ খেয়ে পাঁচালি পড়ে লক্ষ্মীদেবীর ব্রতানুষ্ঠান করা হলেও দুর্গাপূজার পরে কোজাগরি লক্ষ্মীপূজা করা হয়। এছাড়াও বছরে আরও একবার একটি বিশেষ দিনে লক্ষ্মীপূজা করা হয়।

ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজনকালে এ অঞ্চলের সকর সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ উপস্থিত থেকে আচার-অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

www.pathagar.com

ক্ষেত্রকুলই ব্রত

ক্ষেত্রকুলই ব্রত কৃষি পরিবারের পূজা। এ পূজায় প্রসাদ থাকে যবের ছাতু, ভুট্টার ছাতু। বুট, কলাই, সরিষা বিভিন্ন পাত্রে রেখে বিকালের দিকে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষক কাটেন ফসল যাতে ভালোভাবে ঘরে তুলতে পারে সে রকম প্রার্থনা জানিয়ে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

৩. কালিয়া হরিবাসরের নামযজ্ঞ

বেঙ্গল ইনকাম ট্যাক্সের বড় কর্তা বিনয়ভূষণ দাসগুপ্তের পরিত্যক্ত বাড়িতে কালিয়ার ধর্মপ্রাণ মানুষেরা মন্দির স্থাপন করেন এবং প্রায় ২০ বছর ধরে হরিবাসরের মহানামযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ে আসছে।

৪. শরফা বাজি পোড়ানো

এ অঞ্চলে শিশু-কিশোরদের একটি আনন্দ-উপভোগ হলো শরফা বাজি পোড়ানো। শীতকালে খেজুর গাছ কাটার সময় খেজুরের ডালের গোড়ায় নেট বা জালের মতো এক ধরনের আঁশ বের হয়। যাকে গ্রাম্য ভাষায় শরফা বলে। বাজি পোড়ানোর নিয়ম হলো এই শরফা শুকিয়ে রাতের বেলায় পুড়িয়ে ফেলে যখন প্রায় ছাই হয়ে যায় তখন মান কচুর বড় পাতা ছোট ছোট ছিদ্র করে ঐ ছাই মান কচুর মধ্যে পুটলি করে বেঁধে দড়ি দিয়ে ঘুরালে এক ধরনের শা শা শব্দ হয় এবং আগুনের ফুল্কি ছোটে। রাতের অন্ধকারে এটা দেখতে খুবই চমৎকার লাগে। এখনও শীতের সময় গ্রামের ছোট শিশু-কিশোররা এ শরফা বাজি পুড়িয়ে খুব আনন্দ উপভোগ করে।[৮]

৫. নাহাল ফুট বা রাখাল পোড়া

ফাল্গুন মাসে যখন খেসারি, মটরশুঁটি, ছোলা পেকে যায় তখন শিশু-কিশোরেরা মাঠে গিয়ে ফাঁকা জায়গায় খেসারি, মটরশুঁটি, ছোলা পুড়িয়ে খাওয়াকে নাহাল ফুট খাওয়া বলে। এখনও গ্রামের কিশোররা অনেকটা উৎসবের মতো করে কমবেশি এই রাখাল পোড়া খেয়ে থাকে।

তথ্যনির্দেশ

১. রেজাউল ইসলাম (৩৯), লাইব্রেরিয়ান, লক্ষ্মীপাশা মহিলা ডিগ্রি কলেজ, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ২৪.০১.২০১২

২. প্রশান্ত বিশ্বাস (৪৫), গ্রাম : কৃষ্ণপুর, লোহাগড়া পৌরসভা, গৌতম বিশ্বাস (৪২), মলিকপুর, গ্রাম : মলিকপুর ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, সংগ্রহের তারিখ : ২৭.০২.২০১২

৩. বিশ্বনাথ বাউতি (৪৫), লক্ষ্মীকান্ত বাউতি (৫০) ও অসিত বাউতি (৪৭), লক্ষ্মীপাশা বাউতি পাড়া, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ২৩.০১.২০১২

www.pathagar.com

৪. চিত্রশিল্পী নিখিলচন্দ্র দাস (৫১), শিক্ষক, চারুকলা বিভাগ, নড়াইল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, তারিখ : ০৫.০২.২০১২

৫. নিখিলচন্দ্র দাস (৫১), শিক্ষক, চারুকলা বিভাগ, নড়াইল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, স্থায়ী ঠিকানা : লোহাগড়া সীমান্তবর্তী এলাকার মাউলি গ্রাম, মাউলি ইউনিয়ন, কালিয়া উপজেলা, তারিখ : ০৩.০২.২০১২

৬. রূপক মুখার্জ্জি (৪০), উপজেলা প্রতিনিধি, দৈনিক যায় যায় দিন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ২৭.০১.২০১২

৭. লিপি, দুর্গাপুর, নড়াইল, তারিখ : ৩০.০৯.২০১১

৮. আশরাফ আলী (৫৬), জয়পুর, জয়পুর ইউনিয়ন, লোহাগড়া, তারিখ : ৩০.০১.২০১২

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

পুরনো কাল থেকেই শুরু করে মানুষের খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠে। যখন বলা হয় মাছে ভাতে বাঙালি তখন লোকখাদ্য হিসেবে ভাত এবং মাছ বাঙালির লোকখাদ্য তালিকার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। পান্তাভাত লংকা সহকারে যখন খাওয়া হয় তখন গ্রামবাংলার লোকখাদ্যের উপাদান হিসেবে তা বিবেচিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও বিভিন্ন ধরনের লোকখাদ্য রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পিঠা, মিষ্টি লোকখাদ্যের পর্যায়ভুক্ত।

কালিয়া উপজেলার খাদ্য

প্রাচীনকাল হতে নড়াইল অঞ্চলের মানুষের স্বাভাবিক খাবার হলো মাছ-ভাত। অধিকাংশ মানুষের জমাজমি ও কৃষি একমাত্র জীবন-জীবিকার মাধ্যম হওয়ায় কৃষিকর্মে সম্পৃক্ত মানুষগুলির খাবারের বৈচিত্র্য ছিল ভিন্নরূপ। মুসলিম সাধারণ পরিবারে প্রাচীনকাল হতে নৈমিত্তিক খাবার হিসেবে ভোরবেলা বা সকালে খাবার (অধিকাংশ জনের) পানি জাউ (পায়েসের ন্যায় নরম ভাত পানিতে রান্না) দুপুর বেলা মুড়ি চিড়ে কিংবা ঠান্ডা ভাত এবং রাতে ভাত, মাছ, তরকারি, দুধ কিংবা অন্যান্য ভাজিসহ ভূরিভোজ। সকালে পানির জাউ খাবারের সঙ্গে অধিকাংশ লোক আলু, পিঁয়াজ-মরিচ দিয়ে খেতো কিংবা কেউ কেউ গুড়, কলা ইত্যাদি দিয়ে খেতো। একটু স্বচ্ছল ও লেখাপড়া জানা পরিবারে একটু নরমভাত (এলাকার নাম ফ্যানাভাত) এবং কুমড়ো, আলু, বেগুন ইত্যাদি ভর্তা দিয়ে খেতো। স্বচ্ছল পরিবারগুলো দুপুরবেলা মাছ, তরকারি, ভাজি. দুধ কিংবা মাংস দিয়ে খাবার খায় এবং রাতের বেলা শুধু গরম ভাত রান্না করে দুপুরের অবশিষ্ট মাছ তরকারি দিয়ে খাবার শেষ করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে প্রাচীনকাল হতে সকালবেলা ভর্তাভাত ও ঘি কিংবা মাখন (স্বচ্ছল পরিবারে ঘি, মাখন) দিয়ে নাস্তা এবং দুপুরবেলা তরকারি রান্না করে সেই তরকারি দুপুরবেলা ও রাতের বেলা গরম ভাত দিয়ে খায়। হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের মাঝে টাকিমাছ ভাজার পর ভর্তা কিংবা টাকিমাছ পোড়ানোর পর ভর্তা, ছোট ছোট চিংড়ি মাছ ভাজি করে তারপর ভর্তা খুব জনপ্রিয় খাবার। এলাকার মানুষ হাঁস, মুরগি ইত্যাদি ডিম রান্নার ক্ষেত্রে নারিকেলের দুধ দিয়ে চিনি মিশিয়ে ঝোল করে রান্না করে এবং এ খাবার খুবই মজার ও জনপ্রিয়। নারিকেল দুধে ডিম রান্না এলাকায় দুইভাবে মানুষ খায়। যথা- পূর্ণ ডিম সিদ্ধ করে কিংবা ডিম ২-৩টা একত্রে পুরুভাবে ভাজি করে তারপর ছুরি দিয়ে কেটে নারিকেলের দুধ দিয়ে ডিম রান্না করা হয়। আনারস কেটে চিনি ও নারিকেলের দুধ দিয়ে এবং আমড়া সিদ্ধ করে নারিকেলের দুধ ও চিনি দিয়ে রান্না করা হয়। স্থানীয়ভাবে এর নাম আনারসের খাটা এবং আমড়ার খাটা। হিন্দু মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের মাঝে এটা অত্যন্ত জনপ্রিয় খাবার। আত্মীয়স্বজন এলে যেকোনো খাবার

www.pathagar.com

হোক না কেন মাংসের আয়োজন করা হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রে গরুর মাংস কিছু ক্ষেত্রে মুরগির মাংস এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুরগি কিংবা খাসির মাংস কিছু ক্ষেত্রে কচ্ছপ বা শূকরের মাংস খাবার হিসেবে আয়োজন করা হয়। বাড়ির প্রাচীন লোক মারা গেলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে উপযুক্তভাবে গরু কিংবা খাসির মাংস, ডাল, দধি ইত্যাদি খাবার আয়োজন করা হয়। এই আয়োজনকে এ অঞ্চলে জিয়াফত বলে এবং হিন্দু মরলে নির্দিষ্ট সময় পর অর্থাৎ (১১দিন, ১৩দিন, ২১দিন), দশার সময় শেষ হলে শ্রাদ্ধের খাবার পরিবেশন করা হয়। এখানে একটা তরকারি এবং বড় মাছ সকলের জন্য আয়োজন করা হয়। মুসলমান মারা গেলে সাধারণত ৪০ দিন পর খাবার আয়োজনের রেওয়াজ এলাকায় প্রচলিত। স্থানীয়ভাবে একে চল্লিশে বলে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে খাতনা-ই-সুন্নত এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে গ্রামীণ জনপদে প্রাচীনকাল হতে আত্মীয়স্বজনসহ গ্রামবাসী ও এলাকাবাসীকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে খাবার আয়োজন করা হয়। আঞ্চলিক ভাষায় ঐ খাবার অনুষ্ঠানকে "মেজবানি" নামে আখ্যায়িত করা হয়। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোক ঐ মেজবানিতে অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন খাসি বা মুরগির মাংস এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য গরুর মাংস ও ডাল, দধি ব্যবস্থা করা হয়। আঙ্গিনার ভিতরে প্রশস্ত কোনো খোলা জায়গায় খাবার প্যান্ডেল তৈরি করে মেহমানদের কলার পাতায় কিংবা ভাড়া করা প্লেটে খাবার ব্যবস্থা করা হয়। পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের অবনতি ঘটায় বর্তমান সময় "মেজবানি" প্রথা প্রায় উঠে গেছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে অতীতকাল হতে বিশেষ করে ঈদ-উল-আযহা বা কোরবানির ঈদে গরুর মাংস ৩-৪ দিন ধরে ভেজে ভেজে খাওয়া হয়। মাংস রান্না করা হয় ঝোলসহ কিন্তু পরবর্তীতে প্রতিবার ভেজে নেবার সময় ঝোল শুকিয়ে নিয়ে পিঁয়াজ রসুন বেশি করে দিয়ে ভাজি করা হয় যা খেতে খুবই স্বাদের হয়। তাছাড়া গরুর ভূড়ি ও খাসির ভূড়ি রান্না এ অঞ্চলের মানুষের প্রিয় খাবার। এলাকায় শীতকালে খেজুর গাছের রস, পাটালি বিশেষ করে নারিকেল মিশ্রিত খেজুর গুড় কিংবা খেজুর পাটালি খুবই জনপ্রিয় খাবার। আর চৈত্র, বৈশাখ মাসে তালরস, তালগুড় ও তাল পাটালি যথেষ্ট জনপ্রিয় খাবার। পিঠা নড়াইলের লৌকিক অনুষ্ঠানের এবং ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিটি পরিবারের হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের মাঝে একটা অতি জনপ্রিয় খাবার। সকল আচার অনুষ্ঠানে পিঠার আপ্যায়ন খুবই মর্যাদাপূর্ণ এলাকার মানুষের কাছে। বিশেষ করে বিয়ের অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় আপ্যায়ন উপাদান হলো পিঠা। বিভিন্ন আকার, আকৃতির নানা প্রকার নকশা অঙ্কিত পিঠা, বিয়ে অনুষ্ঠানে গ্রামের পাড়ার প্রতিবেশী মহিলারা নিজস্ব উদ্যোগে বিয়ে বাড়ির পিঠা তৈরিতে সহযোগিতা করে থাকে। কোনো কোনো বিয়ে অনুষ্ঠানে ৩০-৩১ প্রকার পিঠা আপ্যায়নের জন্য উপস্থাপন করা হয়। বিয়ে অনুষ্ঠানে "বর"-এর জন্য বড় একটা ট্রে জাতীয় প্লেটে সবকিছু ব্যতিক্রমী কায়দায় যেমন একটা বড় রুই মাছ ভাজি, খাসির মাথা রান্না, সবচেয়ে বড় আকৃতির মিষ্টি পিঠা ও ঝালপিঠা, মিষ্টি, ফলফলাদিসহ সব ধরনের প্রস্তুতকৃত খাবার বর আপ্যায়নের জন্য উপস্থিত করা হয়। বরযাত্রী হিসেবে আগত বরের দুলাভাই কিংবা ভাবীস্থানীয় ২-৪জন পুরুষ মহিলা বর-এর পাশে বসে। কারণ 'বর'-এর বসবার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা

www.pathagar.com

হয়। নগর সভ্যতার দ্রুতবিকাশের কারণে বর্তমান সময় লৌকিক পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যখাবার এবং ঘরবাড়ির আমূল পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ফলে বাংলা ও বাঙালির চিরকালীন শাশ্বত সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের ধারা লক্ষ করা যায়। ইদানীং নগরেও লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

লোহাগড়া উপজেলার খাদ্য

মাছে-ভাতে বাঙালি বলতে যা বুঝায় তা এ অঞ্চলের মানুষদের খানাপিনা দেখলে বোঝা যায়। কারণ লোহাগড়া উপজেলা জুড়েই রয়েছে অসংখ্য নদী-খাল, বিল ও বাওড়। এসব নদী-খাল-বিল-বাওড়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ফলে এ অঞ্চলে কয়েক হাজার জেলে সম্প্রদায়ের বসবাস। জেলেরা এসব মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া এ এলাকা সমতল এবং মাটির গুণাগুণের কারণে ধানও হয় প্রচুর। এসব কারণে উপজেলার মানুষের বরাবরই মাছ-ভাত নিত্যদিনের সাথী। অধিকাংশ মানুষ দিনের তিন ওয়াক্তই ভাত খেয়ে থাকেন। মাছের সাথে বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি দিয়ে তরকারি রান্না করে এবং গরু, খাসি ও মুরগির মাংস এখানকার মানুষের প্রিয় খাবার। এখানকার মানুষ ভূরিভোজ এবং রান্নায় যথেষ্ট মসলার ব্যবহার পছন্দ করে। ভাতের পাশাপাশি অনেকে সকালে ও রাতে গমের রুটি খেয়ে থাকে। তবে গ্রামের কৃষকরা ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাড়িতে থাকা ঠান্ডা বা পান্তাভাত কাঁচা মরিচ-পেঁয়াজ ও লবণ দিয়ে অথবা তরকারি বা ভাজি দিয়ে খেয়ে মাঠে কাজ করতে যায়।

এখানকার মানুষের কার্য মিষ্টি জাতীয় খাবার, যেমন-সন্দেশ, চমচম, দৈ, জিলাপি, লতিকা, বুরিন্দা, গজা, কালোজাম, রস মালাই, ছানার জিলাপি ইত্যাদি খুবই প্রিয়। এ অঞ্চল জুড়ে খেজুর রসের ভিজা পিঠা, রসের পায়েস, রসের সিমাই পিঠা, পুলিপিঠা, ভাপাপিঠা, চিতাই পিঠা, রস লাউ, রস পাকান, তালের বড়া, নারকেলের নাড়ু, নারকেলের চিড়া, নারকেলের বরফি, গুড়ের মোয়া, খই, মুড়কি ঢেঁকিছাটা চিড়া, হাতে তৈরি মুড়ি, খেজুরের পাটালি-গুড়, আখের পাটালি-গুড় গ্রামের মানুষের পছন্দের খাবার। বংশপরম্পরায় আমরা এসব খাবারের সাথে জড়িত।

১. পিঠাপুলি

নড়াইল অঞ্চলে পিঠাপুলিকে গ্রামীণ রমণীদের ঐতিহ্যমণ্ডিত মর্যাদা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কারণ একসময় গ্রামের যে সকল মেয়েরা ভালো রান্না করতে পারতো কিংবা বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরিতে সিদ্ধ ছিল তাদের বাহ্যিক চেহারা অপেক্ষাকৃত কুৎসিত হলেও বিয়ের ক্ষেত্রে খুবই চাহিদা ছিল। নতুন মেহমান বিশেষ করে শীতকালে ও বছরের যে কোনো সময়ে বিয়ে অনুষ্ঠানে বাহারি পিঠার সমারোহ ব্যতীত অনুষ্ঠান অপূর্ণ বা মর্যাদাহীন থেকে যায়। পিঠা তৈরিতে যথেষ্ট ভাস্কর্য বোধ ও মুন্সিয়ানা প্রয়োজন হয়। নানা স্বাদের, নানা আকৃতির, নানা প্রকার পিঠা নড়াইল অঞ্চলে তৈরি হয়। ২০০৫ সাল হতে তুলারামপুর ইউনিয়নের তুলারামপুর তরফদার পাড়ায় জাতিসংঘের সাবেক অর্থনৈতিক উপদেষ্টা প্রয়াত রবিউল ইসলাম-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পিঠা উৎসব শুরু হয়েছে। দিনে দিনে এ উৎসবের কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলাকার বিভিন্ন স্থান হতে লোকজন পিঠা

www.pathagar.com

বিক্রির জন্য রং-বেরঙের নকশা করা পিঠা নিয়ে তুলারামপুর পিঠা উৎসবে ১লা পৌষ হাজির হয়। পিঠা তৈরিতে চালের গুড়া, ময়দা, সুজি, আটা, চিনা বা কাউনের চালের গুড়া, বেকিং পাউডার, ডালগুড়া, চিনি, মধু, গুড়, লবণ, এলাচি, লবঙ্গ, দারুচিনি, গোল মরিচ, নারিকেলের দুধ, ডিম, দধি এবং নানা প্রকার ফল যেমন- শসা, আঙ্গুর, আপেল, পেঁপে, তাল, কলা ব্যবহৃত হয়। পিঠাসমূহের মাঝে রুটি পিঠা, ছিৎরুটি, চিতই পিঠা, ধুপি পিঠা, কুলিপিঠা, ভাপাকুলি পিঠা, রস পান বা পাকান পিঠা, তক্তি পিঠা, আন্দসা পিঠা, ঝাল পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, রসপিঠা, হাতে কাটা শেমাইপিঠা, ভাজাপিঠা, ধাপড়া, বড়া, বরফি, চুষিপিঠা, তাল পিঠা ইত্যাদি পিঠা হরহামেশা বিভিন্ন উৎসব আয়োজন বিশেষ করে বিয়ে উৎসবে সরবরাহ করা হয়।[১]

লোহাগড়া উপজেলার পিঠাপুলি

এখানকার প্রধান খাদ্যশস্য ধান ও গম। এছাড়া গবাদি পশু পালন ও দুধ বিক্রি করে, নারকেল গাছ লাগিয়ে এবং তা বাজারে বিক্রি করে এ অঞ্চলের মানুষ প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। আখ, তাল ও খেজুরের রস সংগ্রহ, গুড় ও পাটালি তৈরি ও বাজারে বিক্রি করে যুগের পর যুগ ধরে একটি শ্রেণি জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। এসবকে কেন্দ্র করে এক ধরনের লোকজ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। যেমন— এ অঞ্চল জুড়ে আখ, খেজুর, তালের রস এবং নারকেল ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে এক ধরনের পিঠা সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। খেজুর রসের ভিজা পিঠা, রসের পায়েস, রসের তৈরি হাতে কাটা সিমাই পিঠা, দুধলাউ, পুলিপিঠা, দুধকুলি, ভাপা পিঠা, চিতাই পিঠা, রসলাউ, রসপাকান, তালের বড়া, নারকেলের নাড়ু, নারকেলের চিড়া, নারকেলের বরফি, গুড়ের মোয়া, খই, মুড়কি, ঢেঁকি ছাটা চিড়া, হাতে তৈরি মুড়ি, খেজুরের পাটালি-গুড়, আখের পাটালি-গুড় গ্রামের মানুষের পছন্দের খাবার। প্রত্যেক মৌসুমে এসব পিঠাপুলি না খেলে তাদের যেন বাঙালিত্বই থাকে না। আত্মীয়দেরকেও এসব খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করার রীতি রয়েছে। লোহাগড়ার নলিনি গুড়ের সন্দেশ ও দই-এর-বেশ সুখ্যাতি রয়েছে। এখানকার গুড়ের সন্দেশ বিভিন্ন জেলাসহ বিদেশেও যায়।[২]

২. বৈশাখি খাবার

সদর উপজেলার বৈশাখি খাবার

মুঘল আমল হতে ফসল উৎপাদন ও ফসল ঘরে তোলার সময়কে বাঙালির নিত্যজীবনের অংশ হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়েছে। গ্রামে প্রাচীনকাল হতে বর্তমান ও অনেক গ্রামীণ জনপদে আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া যথা : বিদ্যুৎ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। সে কারণে গ্রীষ্মের তাপদাহ সহ্য করার জন্য তালপাতার পাখার ব্যবহার যেমন প্রত্যেকের জন্য অনিবার্য ছিল এবং আছে। তেমনি বৈশাখের সকালে প্রায় সকল কৃষক পান্তাভাত কাঁচামরিচ পিঁয়াজ খেয়ে রবিশস্য উৎপাদনের কাজে জমাজমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে বের হতেন এবং এখনও কাজে বের হন।

বর্তমান সময়ে বৈশাখি মেলা এবং বৈশাখি খাবার হিসেবে পান্তাভাত ও ইলিশ মাছ ভাজা প্রায় জাতীয় খাবার উৎসবে রূপান্তরিত হওয়ার মতো জনপ্রিয় হয়েছে।

www.pathagar.com

নড়াইল অঞ্চলেও বৈশাখি মেলা হয় এবং পান্তাভাত ইলিশ মাছ ভাজা খাবারের ধুম পড়ে যায়। নিশিনাথতলা, রূপগঞ্জ, নড়াইলে একমাসব্যাপী বৈশাখি মেলা উদ্‌যাপিত হয়। হাজার হাজার ভক্তপ্রাণ নারী পুরুষ, শিশু, যুবক, যুবতির পদচারণায় মুখরিত হয় মেলা প্রাঙ্গণ। আয়োজন থাকে সার্কাস, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, নকশা অঙ্কিত নানাবিধ ইট, কাঠ, মাটি, তালপাতার তৈরি ঘর সাজানো কিংবা শিশুদের জন্য তৈরিকৃত পণ্যসমূহের মেলা- বৈশাখির মেলায় বিশাল জায়গা জুড়ে থাকে। এছাড়া এই মেলায় চুড়িসহ রমণীদের নানাবিধ উপকরণ পাওয়া যায়। বাঁশগ্রাম ইউনিয়নের টাবরা গ্রামে বৈশাখি মেলা হয়।

হোগলাডাঙ্গা গ্রামের বৈশাখি মেলায় বৈশাখি খাবার পান্তাভাত ইদানীংকালে মেলায় উপস্থিত মানুষগুলি টাকা দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্রয় করে খেয়ে থাকেন। বৈশাখি মেলা এলেই সম্রাট আকবরের কথা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের স্মরণে পড়ে যায় এবং সেইসঙ্গে প্রাচীন ফসল উৎপাদনের প্রক্রিয়া, শ্রমবিনিয়োগ, ফসল প্রাপ্তিতে মানুষের আনন্দপ্রাপ্তি এবং বিশেষ করে কৃষকদের জীবনে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তৈরির মধুমাস বৈশাখ আম-জাম, কাঁঠাল, আনারস, আঙ্গুর, লেবু, আপেল ও বরই খাবার রসে রসনায় তৃপ্তিই দেয় না বরং প্রাচীন ঐতিহ্যকে মনে করিয়ে দেয়। স্মৃতি থেকে শেখা উৎসাহে নতুন উদ্যম পেয়ে মানুষ আগামীর পথে পা বাড়ায়। সুতরাং খাদ্যশস্য এবং চাষাবাদের সঙ্গে বাংলাদেশ তথা নড়াইলের মানুষগুলোর লৌকিক ঐতিহ্য দারুণভাবে সম্পর্কযুক্ত।

লোহাগড়া উপজেলার বৈশাখি খাবার

বৈশাখ মাসে গ্রামের মানুষ সাধারণত যেসব খাবার ফল খেয়ে থাকে সেগুলোই বৈশাখি খাবার। বাঙালির সব চেয়ে প্রিয় ফল বৈশাখ মাসেই পাকে। যেমন- আম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল, তরমুজ, বাঙ্গি ইত্যাদি। পরিকল্পিতভাবে এই ফল চাষ এবং বাজারে বিক্রি করে অনেকে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করছেন। অনেকে খাওয়া খরচ বাদে কিছু ফল বিক্রি করে টুকটাক সাংসারিক খরচ মিটিয়ে থাকেন। এ মৌসুমে সবাই আত্মীয় বাড়ি যাওয়ার সময় এসব ফল নিতে ভোলেন না। পাতি লেবুও এ মৌসুমে বাজারে ওঠে। এ নেবু বিক্রি করে এখন প্রচুর অর্থ উপার্জন করছেন। যার নাম নিলে জিহ্বায় জল আসে সেটা হলো তেঁতুল। এসময় তেঁতুলও পাকা শুরু হয়। বাজারেও চড়া মূল্যে বিক্রি হয় এ তেঁতুল। প্রায় বাড়িতেই বরই, আম ও তেঁতুলের বিভিন্ন ধরনের আচার, টক, চাটনি, জেলি ইত্যাদি তৈরি হয়। এসব আচার-চাটনি না হলে যেন আমাদের চলেই না। কাসুন্দি দিয়ে আম মাখা খাওয়ার রেওয়াজ দীর্ঘদিনের। সরিষা বেটে ও পানি দিয়ে আগুনে জ্বাল দিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই কাসুন্দি তৈরি করতে হয়। এগুলো খুবই সুস্বাদু। এ মৌসুমে লোহাগড়া অঞ্চলের অন্যতম আরও একটি খাবার হলো তালের রস। গরমের সময় তালের রস খেলে পেট ঠান্ডা রাখে এবং বেশ উপকারী। সন্ধ্যার সময় গাছিরা এই রস উপজেলার বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করতে আনেন। রস বাজারের আনার সঙ্গে সঙ্গেই তা বিক্রি হয়ে যায়। এছাড়া এই রস দিয়ে গ্রামের বধূরা বিভিন্ন পিঠা পায়েস, ক্ষীর তৈরি করে। গাছিরা গুড় ও পাটালি তৈরি করে হাটবাজারে বিক্রি করে থাকেন। অনেকে বৈশাখের প্রথম সকালে পান্তা ভাত কাঁচা মরিচ-পেঁয়াজ, লবণ দিয়ে খেয়ে নতুন বাংলা বছর উদ্‌যাপন করে থাকেন।[৩]

www.pathagar.com

পান্তাভাত বৈশাখি খাবারের মধ্যে না পড়লেও কৃষক খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে মাঠে চাষাবাদের জন্য মাঠে যাবার সময় সঙ্গত কারণেই বাসি বা পান্তাভাত খেয়ে চাষের কাজে যায়। সেজন্য বাসি বা পান্তাভাত আমাদের সংস্কৃতির সাথে মিশে রয়েছে।[৪]

৩. কার্তিক কুণ্ডুর ক্ষীরের চমচম

বাংলাদেশের মানুষের কাছে দুধের তৈরি মিষ্টি প্রকৃত অর্থেই দারুণ স্বাদের খাবার। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে দুধের তৈরি মিষ্টির চাহিদা অত্যন্ত বেশি। বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে মিষ্টির ব্যবহার বিচিত্র ধরনের।[৫] ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে বাঙালির সামাজিক জীবনে এমন কোনো উৎসব আয়োজন নেই যেখানে মিষ্টির ব্যবহার হয় না। যেমন : নিজেদের জন্য, বর-কনে দেখা অনুষ্ঠানে, বিবাহ অনুষ্ঠানে, খাৎনা অনুষ্ঠানে, গ্রামীণ যে কোনো ধরনের খাওয়া-দাওয়ায়, শ্বশুর বাড়ি যেতে, যে কোনো আত্মীয়বাড়ি যেতে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেমন : মিলাদ মাহফিলে কিংবা হিন্দুদের পূজার প্রসাদ হিসেবে মিষ্টির ব্যবহার অবশ্যই আছে। সুতরাং বাঙালির নৈমিত্তিক জীবনে মিষ্টি কেবল রসনার তৃপ্তি মেটানোর কাজেই ব্যবহৃত হয় না বরং সামাজিক মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রেও মিষ্টির ব্যবহার হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ বাঙালির জীবনে মিষ্টি সামাজিক মর্যাদার অন্যতম নিয়ামক। যাহোক মানসম্মত ও সুস্বাদু মিষ্টি তৈরির জন্য নড়াইলের একটু আলাদা নাম আছে। যেমন : নড়াইলে কালিয়ার সুবোল সরকারের কাঁচাগোল্লা বা নলেনি পাটালিগুড়ের প্যাড়া সন্দেশ, লোহাগড়ার দুলাল চন্দ্র সাহার রসোগোল্লা, মহাজন বাজারের ঝন্টু সাহা ময়রার রাজভোগ, দীঘলিয়া বাজারের গোবিন্দ কুণ্ডুর রসোগোল্লা ও দধি, সিংগাশোলপুর বাজারে শশ্মান ময়রার দধি, নবীর সরদারের কাঁচাগোল্লা, যতীন শিকদারের ছানার জিলেপি, নড়াইল কোটপাড়ার শ্যামলের প্যাড়া সন্দেশ, গোবরা বাজারে আব্দুল ওহাবের সন্দেশ খুবই নামকরা। দূরদূরান্তের মানুষ বর্ণিত মিষ্টির দোকানসমূহ হতে মিষ্টি কিনে নেয়। এরপরও এ সকল মিষ্টির সুনাম ও খ্যাতিকে ম্লান করে নড়াইল রূপগঞ্জ বাজারের কার্তিক কুণ্ডুর ক্ষীরের চমচম ভীষন সুনাম অর্জনে সক্ষম হয়েছে এবং মান ও স্বাদে এখনও পর্যন্ত অদ্বিতীয় অবস্থান অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছে। মিষ্টি তৈরির ক্ষেত্রে কার্তিক কুণ্ডু সম্পর্কে ২/১ টা কথা না বললেই নয়। কার্তিক কুণ্ডু ১৯৩২ সালে নড়াইলের হাটবাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম সর্গীয় কেদারনাথ কুণ্ডু ,মায়ের নাম সর্গীয় কমলা বালা কুণ্ডু। বাবার হাত হাত ধরেই ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মিষ্টির কাজ শেখেন সর্গীয় কার্তিক চন্দ্র কুণ্ডু ১৪-১৫ বছর বয়সে মিষ্টির কাজে হাতেখড়ি এবং ৫৮ বছর বয়সে ১৯৯১ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সুনাম ও সততার সঙ্গে মিষ্টি তৈরি ও বিক্রয়ের পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। কার্তিক বাবুর মিষ্টি তৈরিতে কিভাবে, কি করে সুনাম অর্জন করেছেন তা জানতে নড়াইল রূপগঞ্জ বাজারে কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টির দোকানে যাই এবং কথা বলি কার্তিক কুণ্ডুর বড় ছেলের সঙ্গে। সাক্ষাৎকারটি নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

www.pathagar.com

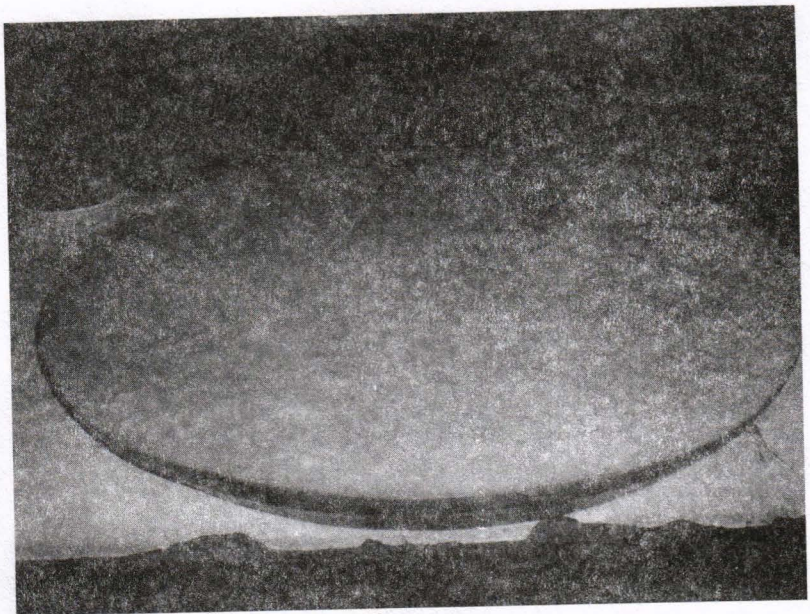

ক্ষীরের সন্দেশ

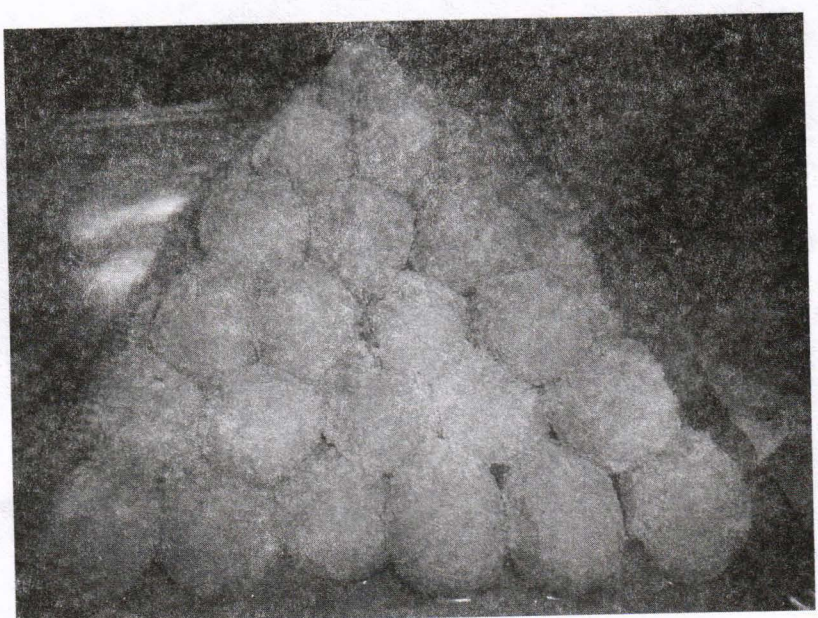

ক্ষীরের চমচম

www.pathagar.com

তথ্যসংগ্রহকারী : আপনার নাম কি ?

তথ্যদাতা : আমার নাম প্রফুল্ল কুমার কুণ্ডু।

তথ্যসংগ্রহকারী : আপনার বাবার নাম কি ?

তথ্যদাতা : আমার বাবার নাম সর্গীয় কার্তিক চন্দ্র কুণ্ডু।

তথ্যসংগ্রহকারী : আপনার মায়ের নাম কি ?

তথ্যদাতা : আমার মায়ের নাম দেবোলা বালা কুণ্ডু।

তথ্যসংগ্রহকারী : আপনারা কয় ভাই বোন এবং তাদের মাঝে আপনার অবস্থান কত ?

তথ্যদাতা : আমরা মোট ০৫ ভাই বোন এবং আমি সকলের বড়। আমার ছোট দুই বোন, এক ভাই এবং সকলের ছোট এক বোন।

তথ্যসংগ্রহকারী : আপনার বয়স কত ?

তথ্যদাতা : আমার জন্ম ১৯৬৬ ইংরেজি সালে। অর্থাৎ বর্তমান আমার বয়স ৪৭-৪৮ বছর।

তথ্যসংগ্রহকারী : আপনি কতদিন মিষ্টির ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত ?

তথ্যদাতা : ১৪-১৫ বছর বয়সে বাবার নিকট থেকে মিষ্টির কাজ কিছু কিছু শিখেছি এবং বিশেষ সময়ে (যেমন : ঈদ,পুঁজো) বাবার সাথে দোকানে থেকেছি কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর পরিপূর্ণ ভাবে দোকানে সময় কাটাই এবং মূলত পৈতৃক ব্যবসায়ই বর্তমান আমার ব্যবসা।

তথ্যসংগ্রহকারী : মিষ্টির ব্যবসা তো আপনাদের পারিবারিক-কিন্তু আপনার বাবার এত সুনাম কিভাবে হলো ?

তথ্যদাতা : আমার বাবা সব সময় ব্যতিক্রম ধরনের আলাদা স্বাদে ও ভালো মানের মিষ্টি তৈরি করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের চেষ্টা করতেন এবং এটা তার নেশায় পরিণত হয়েছিল। তবে আমার বাবার মিষ্টি তৈরির সেরা কারিগর হিসেবে উত্থানের পিছনে একটা কাহিনি আছে। আমার বাবা প্রথম যখন মিষ্টির দোকান আলাদা ভাবে শুরু করেন তখন সাধারণত দুই ধরনের মিষ্টি তৈরি করতেন যেমন : গরুর দুধে গুড়োদুধ ও ময়দা মিশিয়ে অপেক্ষাকৃত কম দামের মিষ্টি এবং কেবলমাত্র পিওর গরুর দুধের তৈরি বেশি দামের মিষ্টি। আপনারা জানেন পাকিস্তানের সময়ে গুড়ো সন্দেশ বা কাঁচাগোল্লা (স্থানীয় নাম) প্রতিসের দুই-তিন টাকায় বিক্রি হতো। অর্থাৎ পিওর দুধের কাঁচাগোল্লা তিন টাকা এবং ময়দা ও গুড়োদুধ মেশানো কাঁচাগোল্লা প্রতিসের দুই টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এমন সময় একদিন একজন দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কাজের শ্রমিক মিষ্টি খেতে এসে দুই ধরনের কাঁচাগোল্লার কথা এবং দাম শুনে ভালো মানের কিন্তু বেশি দামের এক ছটাক কাঁচাগোল্লা খেলো ও খেতে খেতে বললো কষ্টের পয়সায় খারাপ মাল কেন খাবো ? আমার বাবা একথা শুনে খুবই লজ্জা পেলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন জীবনে খারাপ অর্থাৎ ভেজাল মাল তৈরি করে কম দামে বেশি মাল বিক্রি না করে বরং বেশি দামে অল্প পরিমাণ বিক্রি করবো তবু মানুষ খেয়ে তৃপ্তি পাবে ও আশীর্বাদ করবে। সেদিন হতে আমার বাবা মিকচার জিনিস তৈরি বন্ধ করেন এবং

www.pathagar.com

নতুন ধরনের ভালো মিষ্টি তৈরির চেষ্টায় মশগুল হন। এ চেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১৯৬৮ ইংরেজি সালে কার্তিক চন্দ্র কুণ্ডু সর্বপ্রথম ক্ষীরের চমচম ও ক্ষীরের সন্দেশ বা কাঁচাগোল্লা তৈরি করতে সক্ষম হন এবং অচিরেই যথেষ্ট সুনামের অধিকারী হন। এরপর বাবার অনেক শিষ্যরা ক্ষীরের সন্দেশ ও চমচম তৈরি করতে শিখেছেন কিন্তু কেন জানি বাবার মতো কেউ পারেন না।

তথ্য সংগ্রহকারী : আপনি কি আপনার বাবার নিকট থেকে ক্ষীরের চমচম তৈরি করতে শিখেছেন প্রফুল্ল বাবু ? যদি শিখে থাকেন তা হলে ক্ষীরের চমচম তৈরির প্রক্রিয়া কি তা আমাকে বলেন।

তথ্যদাতা : হ্যাঁ, আমি আমার বাবার নিকট থেকে ক্ষীরের চমচম তৈরি করা শিখেছি এবং যেভাবে শিখেছি সে প্রক্রিয়াই আমি আপনাকে বলছি। ক্ষীরের চমচম তৈরির প্রক্রিয়া—সর্বপ্রথম কমপক্ষে ৬০-৭০ কেজি দুধ একটা বড় কড়াইয়ে করে মাটির উনুনে চড়িয়ে কাঠের জ্বালানি দিয়ে ভালো করে জ্বাল দিতে হবে। দুধ টগবগ করে ফুঁটলে অর্থাৎ দুধে উতোল উঠলে নামিয়ে রাখতে হবে ততক্ষণ–যতক্ষণ না দুধের উষ্ণতা মৃদু গরম অবস্থায় নেমে আসে। ততক্ষণে দেখা যাবে ঐ দুধের উপরিভাগে বেশ মোটা সর পড়েছে। যাহোক মোট দুধের উপর হতে সরসহ ১০-১২ কেজি দুধ আলাদা করে অন্য পাত্রে রাখতে হবে এবং ঐ ১০-১২ কেজি দুধ পুনরায় উনুনে চড়িয়ে এমনভাবে জ্বালাতে হবে যেন ১০-১২ কেজি দুধ আগুনের তাপে কমে মাত্র ১ কেজি বা ১ কেজি ৩০০ গ্রামে শুকিয়ে যায়। দেখা যাবে দুধ কাদা কাদা ভাবের হয়েছে এবং দুধ লালচে আকার ধারণ করেছে। দুধের এই লালচে অবস্থাকে দুধের গুড়ো ক্ষীর বলে। এরপর ঐ গুড়ো ক্ষীর ভালোভাবে দুই হাতের তালুতে ডলে বা কচলিয়ে গুড়ো গুড়ো দানায় রূপান্তরিত করতে হবে। অন্যদিক প্রাথমিক পর্যায়ে জ্বালানো মোট ৬০-৭০ কেজি দুধের প্রথম জ্বালানো দুধের ১০-১২ কেজি পুনরায় জ্বালানোর পর বাকি ৫০-৫২ কেজি দুধে ছানার পানি মিশিয়ে মোট দুধকে ছানায় রূপান্তরিত করতে হবে। আনুমানিক ৮-১০ কেজি ছানা হবে। এরপর প্রতি কেজি ছানায় ৫ কেজি চিনির সিরা বা রস করে তাতে ভিজিয়ে নিতে হবে। এরপর চিনি মিশ্রিত ঐ ছানায় হালকা পরিমাণ ময়দা মিশিয়ে এবং কিঞ্চিত পরিমাণ খাবার সোডা ভালোভাবে মিশিয়ে মিশ্রিত জিনিস দুই হাতের তালুতে ধীরে ধীরে ঠিক চমচম আকৃতি করে একটা পাত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কমপক্ষে ১টা রাত এ চমচমকে ঠান্ডা হওয়ার জন্য রাখতে হবে এবং পরদিন প্রতিটা চমচমের গায়ে আলতো করে গুড়ো ক্ষীর হাত দিয়ে বা চমচমের উপর ছড়িয়ে লাগিয়ে দিলে ক্ষীরের চমচম তৈরি হয়ে গেলো।

তথ্য সংগ্রহকারী : বর্তমান সময়ে প্রতি কেজি ক্ষীরের চমচম কত দামে বিক্রি হয়?

তথ্যদাতা : প্রতি কেজি চমচম কমপক্ষে ২৮০ টাকা হতে ৩০০ টাকায় বিক্রি হয়।

তথ্য সংগ্রহকারী : আপনার বাবা কি কি মিষ্টি তৈরি করতেন?

তথ্যদাতা : সাধারণত কাঁচাগোল্লা, রসোগোল্লা, দধি, কালোজাম, লেডিকিনি (কালো জামের আকৃতির চেয়ে একটু ছোট তবে রসে ভেজা), রসমঞ্জুরী, রাজভোগ, চমচম, ক্ষীরের চমচম, দানাদার, লেংচা, জিলেপি, ছানার জিলেপি, প্যাড়া সন্দেশ,

www.pathagar.com

নলেনী পাটালিগুড়ের প্যাড়া সন্দেশ, মটকা, খাস্তা, গজা, বন্দে বা বুরিন্দা, ছাচ, ছানার পোলাও, ঝুরিভাজা, পানিতোয়া ইত্যাদি।

তথ্য সংগ্রহকারী : মিষ্টি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগে ?

তথ্যদাতা : মাটির চুলা, বড় আকৃতির লোহার কড়াই, জ্বালানি কাঠ, খুন্তি, ডাবু, ডাইস, বারকোষ (গোলাকৃতি কাঠের তৈরি) ইত্যাদি।

তথ্য সংগ্রহকারী : প্রতিদিন কি পরিমাণ মিষ্টি বিক্রি হয় ?

তথ্যদাতা : সাধারণ ভাবে গড়ে প্রতিদিন ৩-৪ মণ মিষ্টি বিক্রি হয়। তবে বিশেষ আনুষ্ঠানের সময় পরিমাণ আরও বেশি হয়।

তথ্য সংগ্রহকারী : মিষ্টি কি শুধু নড়াইলে বিক্রি হয় নাকি অন্য কোথায়ও বিক্রি হয়?

তথ্যদাতা : নড়াইলের মানুষতো মিষ্টি কিনে খায়ই, তবে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন জেলা হতে ক্ষীরের চমচম কিনতে লোক আসে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আমাদের ক্ষীরের চমচম ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত, আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। তবে এ সকল মিষ্টি ব্যক্তি উদ্যোগে লোকজন তাদের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব কিংবা অফিসের বসের জন্য পাঠায়।

তথ্য সংগ্রহকারী : আপনারা কেন নিজেরা রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করেন না ?

তথ্যদাতা : আমাদের লোকবল কম, আর্থিক সঙ্গতি দুর্বল এবং প্রশাসনিক যোগাযোগ নেই বলে আমরা এ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারছিনা। তবে সরকারি সহযোগিতা পেলে আমরা বাংলাদেশের মিষ্টি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করতে পারি ও বাংলাদেশের জন্য মর্যাদা বয়ে আনতে পারি।

তথ্য সংগ্রহকারী :আমাকে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং দোয়া করি আপনি বাবার মতো আরও নতুন ধরনের মিষ্টি ও মিষ্টিজাত খাবার তৈরি করে খ্যাতিমান হন এবং ঐ সকল সামগ্রী আমাদেরকে উপহার দেন।

তথ্যনির্দেশ

১. তরফদার সাজ্জাদ হোসেন, তুলরামপুর, সদর, নড়াইল, প্রভাষক, কম্পিউটার শিক্ষা, লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়, তারিখ : ২৩.০৯.২০১১

২. প্রভাষক মারুফ সামদানী (৩৮), দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার লোহাগড়া উপজেলা প্রতিনিধি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ০২.০২.২০১২

৩. প্রাক্তন শিক্ষক ও লোককবি ইউনুস শেখ (৬৫), দিঘলিয়া, তারিখ : ০১.০২.২০১২

৪. অনিমেষ ঘোষ (৪৮), পিতা : প্রফুল্লরঞ্জন ঘোষ, বড় কালিয়া, কালিয়া, তারিখ : ২০.০৮.২০১১

৫. সাংবাদিক ফরহাদ খান (৩০), আমাদা, লক্ষ্মীপাশা ইউনিয়ন, লোহাগড়া, তারিখ : ০২.০২.২০১২

www.pathagar.com

লোকনাট্য ও লোকনৃত্য

লোকনাট্য

বাড়ির আঙিনায় বা মাঠে খোলা আকাশের নিচেই সাধারণ লোকদের দ্বারা পরিবেশিত যে নাট্যধারা তা লোকনাট্য হিসেবে পরিচিত। লোকনাট্যে গীত বা গানই প্রধান। সংলাপ নির্ভর নয়। সংলাপ ও গানের পাশাপাশি নৃত্যও লোকনাট্যের বিশিষ্ট অঙ্গ। লোকনাট্যে সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবন আলেখ্যের পাশাপাশি রূপ কথার কাহিনি স্থান পায়। খোলা আকাশের নিচেই লোকনাট্য পরিবেশিত হওয়ার ফলে দর্শক দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন অভিনেতা অভিনেত্রী।

১. পালাগান

এ উপজেলায় পালাগানের চর্চা প্রায় থেমে গেলেও লোহাগড়া পৌরসভার মাইটকুমড়া গ্রামের আবুল খায়ের (৫৮) এখনও পালাগান করেন। বিভিন্ন কাহিনিকে কেন্দ্র করে সুরে সুরে এই গান পরিবেশন করতে হয়। এ গানে দু'পক্ষ থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গানে গানেই বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়।[১]

পঞ্চদশ, ষোড়শ শতাব্দীর দেব-মঙ্গল, পাঁচালি গানের রীতি, পদাবলি, কীর্তন, পুরাণ পাঠও কথকতার অভিঘাতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়। আর তখন থেকেই বিশেষ ব্যক্তি বা চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনি নির্ভর কিংবা উপকাহিনিকে নিয়ে পালাগান তৈরি হয়েছে। এসব পালা গানের অধিকাংশই হিন্দুয়ানি পালা। তবে মুসলমানদের মাঝেও পালাগান দেখা যায়। নড়াইলে পারতপক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে অষ্টক গানের পালা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে গাজির গানের পালা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে নড়াইল অঞ্চলে মজার ব্যাপার হলো গাজির গানের পালা মানত থাকলে তা হিন্দু মুসলিম সকল শ্রেণির মাঝে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে শিবকথা, চণ্ডিকথা, দেবীকথা, গঙ্গাকথা, সরস্বতীকথা, লক্ষ্মীকথা, শীতলাকথা ইত্যাদি পালা প্রধান। তবে নড়াইল সদর থানায় বেশকিছু হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা আছে এবং এসব এলাকায় শিব ঠাকুরের পুঁজো উপলক্ষ্যে যে গান পরিবেশিত হয় তাকে অষ্টক গান বলে। কৃষ্ণভক্ত অনার্য দেবতা শিবঠাকুরের পুঁজো উপলক্ষ্যে কৃষ্ণ সেজে এবং সখী সেজে কৃষ্ণলীলা দেখানো হয়। অষ্ট সখীর সহযোগে এ গান পরিবেশিত হয় বলে একে অষ্টক গান বলে। কেউ কেউ আবার আট লাইনের সংগীত হিসেবে একে অষ্টক গান বলেন। কিন্তু পারতপক্ষে তা ঠিক নয় কারণ অষ্টক গান আট লাইনেই শেষ হবে এমন কথা নেই। বসন্তকালে বিশেষ করে চৈত্রসংক্রান্তির ১ দিন, ৩ দিন, ৫ দিন, ৭ দিন, ৯ দিন কিংবা ১১ দিন আগে অষ্টক গান পরিবেশিত হয়। এ গানে রাধাকৃষ্ণ

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা ছাড়াও সম্প্রতি সমাজ সমস্যা ও সমাধানের বিষয় বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পায়। নড়াইল পৌরসভাধীন বাহিরডাঙ্গা গ্রামের স্বভাব কবি বিপিন সরকার অষ্টক গানকে বিভাজন করে ছুট অষ্টকপালা, অষ্টক ও অষ্টক যাত্রায় রূপান্তরিত করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় জমাজমিতে মালিক ও বর্গা চাষির মাঝে সৃষ্ট রবিশস্য ভাগাভাগি আন্দোলন যা তেভাগা আন্দোলনে রূপ লাভ করে এবং তেভাগা আন্দোলনের সূতিকাগার হলো নড়াইল। স্বভাব কবি বিপিন সরকার অষ্টক গানে মাটি মানুষের সুরে তেভাগা আন্দোলনের বিষয়টি উপস্থাপন করেন। যথা :

আয়রে হিন্দু মুসলমান, যত মজুর কিষাণ, এসে দলে দলে, সবাই মিলে সমিতিতে দাও যোগদান। মিলে কৃষক সম্প্রদায়, বল লাল ঝাণ্ডা কি জয়, আমার শোষণ সাগর বন্ধন করে উদ্ধার করবো স্বদেশ মায়॥

সুবিধাভোগী শোষণকারী শাসকের বিরুদ্ধে নির্বিশেষ শ্রেণির অধিকার বঞ্চিত মানুষের সমন্বিত মুক্ত হবার মানসে সংগ্রামী প্রয়াস এর আহবান এ গানটির মাঝে ফুটে উঠেছে। এ গান কিশোর বয়সি ছেলেমেয়েরা মুখে রং মেখে ভোল পাল্টিয়ে সাধারণত রঙিন শাড়ি পেচিয়ে সখী কিংবা কৃষ্ণ ঠাকুর কিংবা শিব-দুর্গা সেজে অথবা পরিবেশিত পালার প্রাসঙ্গিক চরিত্রের রূপ ধরে এ গান পরিবেশন করে। সাধারণত হারমোনিয়াম, কাঁস, বাঁশি, মন্দিরা, কাটাঢোল কিংবা খোল বা মৃদঙ্গ এ গানে ব্যবহৃত যন্ত্র। গানের পাত্রপাত্রীরা পায়ে ঘুঙুর পেচিয়ে নেচে নেচে এ গান পরিবেশন করে। গাজির গান এ অঞ্চলের নির্বিশেষ শ্রেণির মানুষের কছে যথেষ্ট জনপ্রিয় পালা। জনশ্রুতি আছে শাহ গাজি বাঘ-ভাল্লুক সিংহ ইত্যাদি হিংস্র জানোয়ার নিয়ে ইসলাম প্রচারে প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে পিছপা না হয়ে বরং অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন এবং সর্বশেষ তিনি সুন্দরবনের মধ্যে দরগাহ স্থাপন করে মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন ও আল্লার জিকির-ফিকিরে মত্ত থেকেছেন।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে গাজির চরিত্র আলেখ্য তুলে আনা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং এদেশের মাটি ও মানুষের কাছে জনপ্রিয় গাজি পির কালু দেওয়ানের কাহিনি কিভাবে দলীয় সংগীতে গীত হয় সে বিষয়টি তুলে আনাই আমাদের লক্ষ্য। গাজি কালুর ইতিবৃত্ত হলো গাজি শাহ সেকেন্দার বাদশার ছেলে। কিন্তু ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবিত গাজির মনে দুনিয়ার শান-শওকত চাকচিক্য ভালো লাগে না। তিনি সর্বদা আল্লার জিকিরে ফিকিরে মত্ত থাকেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় কৃচ্ছতা সাধনে তিনি সমাজ সংসার মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। এ সময় আল্লার রহমতে গাজির সঙ্গে এক অলৌকিক চরিত্র মাধুর্যে মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব কালু দেওয়ানের পরিচয়, সখ্য সৃষ্টি হয়। গাজি কালু অভেদ্য নামের হয়। আশা হাতে পৃথিবীর প্রান্তরে মানুষের কল্যাণে গাজি কালুর ভ্রমণ লক্ষ করা যায়। গাজি পির নামে খ্যাতি লাভ করেছে। সাধারণ মানুষের কাছে গাজি এত বেশি জনপ্রিয় যে, মানুষ অনেক সমস্যা বা বিপদাপদে গাজির গান ২-৪ পালা পরিবেশনের মানত পর্যন্ত করে। আজ হতে ২০-৩০ বছর আগে এ অঞ্চলে যখন যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল নদীপথ ও নৌকা সে সময় সাধারণভাবে তৈরিকৃত নৌকা হতে শুরু করে বালুকাটা বড় ধরনের সকল

www.pathagar.com

শ্রেণির নৌকা ভাসাবার সময় গাজি গাজি বদর বদর বলে ভাসানো হতো। সুতরাং নদীমাতৃক বাংলাদেশের নাবিকদের কাছে গাজি আরাধ্য দেবতা হয়ে উঠেছিল। গাজির পালাগানে গাজি, কালু, অজুপা (গাজির মা), দাসী ইত্যাদি চরিত্র দেখা যায়। পাগড়ি, পাঞ্জাবি, শাড়ি ইত্যাদি পোশাক ব্যবহৃত হয়। উপকরণ হিসেবে গাজির আশা বা দণ্ডবিশেষ– যা পেতলের দ্বারা তৈরি এবং নিচের অংশে বাঁশ লাগানো একটি চামর লাগে ও প্রদীপ মঙ্গলঘটে আমপাতা মিষ্টিপূর্ণ হয়। গাজিপালায় কালাচাঁদ বা কালুর চরিত্র বড়ই অদ্ভুত। প্রচলিত ধারার উল্টো কথা বলে মানুষকে হাসানো ঐ চরিত্রের উদ্দেশ্য। একে ফাটকিদার বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং একজন থাকেন প্রধান গায়ক। তিনি পালা বর্ণনা করেন। যন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম, বাঁশি, ঢোল, বেহালা, দোতারা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।[২]

রামায়ণ হিন্দু শ্রেণির মাঝে সবচেয়ে বেশি অনুষ্ঠিত হয় পালাগান। রামায়ণ গানের মূল বিষয়বস্তু হলো একজন ধর্মযাজক, রাষ্ট্রনায়ক, বয়স্ক মানুষের চরিত্র, মহত্ত্ব–সততা, উদারতা, মহানুভবতা, ন্যায়বিচার কেমন হলে তাঁকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর মানুষের শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করা যায় তারই ধারাবাহিক বর্ণনা। এ পালায় রামের মহিমা, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য, স্ত্রী হিসেবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মহাময়ী সীতার আত্মত্যাগ ক্রমাগত সঠিক পরিণতির মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়েছে। বনবাসে সীতাকে রক্ষার ক্ষেত্রে লব ও কুশের শৌর্য প্রকাশ মাতৃভক্তির অনুপম উপমা। রাম চরিত্র যুগে যুগে কালে কালে সত্যসন্ধানী মানুষের কাছে অনুকরণীয় ভাবে রামায়ণ পালায় উপস্থাপিত হয়েছে। একজন মহাপুরুষের আত্মত্যাগ এমন মহিমাময়ই হওয়া উচিত। রামায়ণ গানে মূল গায়েন ধুতি পাঞ্জাবি পরিধান করেন। আসরে একটা ঘট রক্ষা হয় এবং ঐ ঘটে সিঁদুর লাগানো থাকে। কিছু আম্রপল্লব দেওয়া হয়। একটা জলচৌকি কিংবা অন্য কায়দায় হরেকৃষ্ণ হরেরাম অঙ্কিত নামাবলী টাঙ্গানো আবশ্যক। গায়েন একটা চামর হাতে নেচে নেচে কিংবা প্রয়োজনে কেঁদে কেঁদে পালা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেন। ধান, দুবলো এবং সন্ধ্যা পূজার অন্যান্য উপকরণ আসরে থাকে। হিন্দু নারীগণ ধর্মীয় ভাবাবেশে রামায়ণ গান শ্রবণ করে এবং ভক্তি গদগদ চিত্তে ঐ শিক্ষা জীবনের পরতে পরতে সঞ্চয় করে রাখে।[৩]

সাংস্কৃতিক বিভাজনের ক্ষেত্রে নগরে বসবাসকারী শিক্ষিত একদল জনগোষ্ঠী গ্রামের অশিক্ষিত কিংবা অল্প শিক্ষিত মানুষগুলিকে লোক বলে আখ্যায়িত করেছেন। সে অর্থে অধিকাংশ গ্রামীণ নিম্ন জনমানুষের প্রাণের পরশ আর ছন্দের ছোয়ায় মূর্ত সংস্কৃতির সকল অংশকেই লোকসংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা যায়। সাংস্কৃতিক প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে দলীয় রীতিনীতি অনেক ক্ষেত্রে জরুরি বিষয় এবং দলীয় পরিবেশনার ক্ষেত্রে অঙ্গ দুলিয়ে বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে উপস্থাপন করা অতি আবশ্যক ব্যাপার। ঐসব অঙ্গভঙ্গিসমূহ লোকনৃত্যের অঙ্গীভূত। উপজেলার পৌরসভাধীন কুড়িগ্রাম আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকদের বসবাস আছে। এদের মাঝে লোকঐতিহ্যের অন্যতম বিষয় লোকনৃত্য দেখা যায়। আঞ্চলিক প্রভাবপুষ্ট লোকনৃত্যে সূক্ষ্ম অঙ্গভঙ্গি বা কলাকৌশলের চেয়ে স্থূল দৈহিক গতিবিধি লক্ষ করা যায়। লোকনৃত্যে দলগত ধারায়

www.pathagar.com

সর্বপ্রথম লক্ষ করা যায় ঐক্য চেতনা। মূলত ধর্মীয় নাচ, আনুষ্ঠানিক নাচ ও আচারধর্মী নাচসমূহই লোকনৃত্য। নড়াইলে রামায়ণ পালা বর্ণনায়, পদাবলি কীর্তন পালায় ছোট ছোট পদচারণায় মূল গায়েন চামর দুলিয়ে যে অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটান তাই-ই লোকনৃত্য। চৈত্র মাসে অষ্টক পালায় কিশোর কিশোরীদের সাজিয়ে ঘুঙ্গুর বেঁধে নাচানো হয় এটা লোকনৃত্য। পৌষসংক্রান্তিতে গ্রামের কিশোর কিশোরীরা দল বেঁধে হালুই গান পরিবেশন করে এবং এ গানে ছোট ছোট নাচ আছে যা লোকনৃত্যের অঙ্গীভূত। মুসলিম সমাজে গানবাজনা বিষয়ে বিরোধপূর্ণ কথা আছে। কেউ বলে গান খারাপ কেউ বলে বাজনা খারাপ ইত্যাদি। এরপরও বিজ্ঞান দর্শনের চর্চার পাশাপাশি আদিকাল হতে মুসলমানদের শাস্ত্রীয় সংগীত তালিম করতে দেখা যায় এবং উপমহাদেশে শাস্ত্রীয় সংগীতে মুসলমানদের অবস্থা যেমন শীর্ষে তেমনি এক্ষেত্রে প্রায় সকল আবিষ্কারের অবদান মুসলমানদের তা বললে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সংগীত হলেই তা অঙ্গভঙ্গি সম্পৃক্ত একথা বলার অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় রীতিনীতির বাইরে মুসলিম লোক সংগীতের সঙ্গে এক শ্রেণির নৃত্য ও অঙ্গীভূত হয়ে আছে। যেমন : জারিনৃত্য, সারি নৃত্য, লাঠি নৃত্য, ফকিরদের মুর্শিদি নাচ, বাউল নাচ ইত্যাদি ইসলামি প্রেরণায় উদ্ভাসিত জারিগান হলো দলীয় গান যা একজন মূল গায়েন যন্ত্রের তালে তালে অঙ্গভঙ্গিসহ প্রকাশ করেন। গায়েনের অঙ্গভঙ্গিসমূহ জারিনাচ। সারি গান দলবদ্ধ গান। নৌকাবাইচের প্রতিযোগিতায় সারিগান পরিবেশিত হয়। দল বেঁধে কোমর দুলিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে নেচে নেচে এ গান পরিবেশিত হয়। যুদ্ধনৃত্যের আদলে বাংলার গ্রামেগঞ্জে ঢাল সড়কি লাঠিসহ একদল বা দুই দল মিলে যন্ত্রের তালে তালে এক ধরনের লাঠিখেলা প্রদর্শিত হয় যা লোকনৃত্যের অঙ্গীভূত। তাছাড়া মহররম পর্বে এক শ্রেণির মুসলমান নড়াইল উপজেলার গোবরা অঞ্চলে ২/১ জায়গায় দেখা যায় লাঠি হাতে কিংবা লোহার ছোট শিকল দুই হাতে নিয়ে মহররমের নাচ করেন যা লোকনৃত্যের অঙ্গীভূত। নড়াইলে ১১ খান ও সিংগাশোলপুর অঞ্চলে মতুয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা জয় ডংকা পিটিয়ে হরিচাদ গুরুচাদ বলে আকাশে হাত তুলে নেচে নেচে চলে এটা লোকনৃত্য। বিশেষ করে হিন্দু প্রধান সকল গ্রামে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। যজ্ঞে হরেকৃষ্ণ বলে যজ্ঞকারীরা ঊর্ধ্বে বাহু তুলে নাচে যা লোকনৃত্যের অঙ্গীভূত। পূজার আরতিতে নৃত্য করা হয় যা লোকনৃত্য। লোকনৃত্যে কোনো পেশাদারিত্ব নেই। কেবল গ্রামীণ মানুষেরা তাদের ভালো লাগা বিষয়গুলি যথা ব্রত, পার্বণ, ধর্ম পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরল প্রাণে আনন্দরস সৃষ্টিতে নাচ পরিবেশন করে যা গ্রামীণ মানুষের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করে। লোকনৃত্য লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রাণ হিসেবে বিবেচিত।[৪]

২. রামায়ণ গান

এলাকার রামায়ণ গানের সার্থক শিল্পী ছিলেন কবিয়াল বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী। তাঁর রামায়ণ গান হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষ শ্রেণির মানুষ শ্রবণ করতো, উপভোগ করতো এবং অনেককে বিমুগ্ধ আবেগে আপ্লুত হতে দেখা গেছে। ধর্মীয় প্রভাবে রামায়ণ গান এখনও গীত হয় তবে ভালো শিল্পীর অভাব দেখা যায়। এলাকার সিংগাশোলপুর ইউনিয়নের শোলপুর গ্রামের অমিয়কান্তি বিশ্বাস শখের বশে মাঝে মধ্যে রামায়ণ গান করেন ।

www.pathagar.com

রামায়ণ গানের ফর্ম

পরিবেশনাকারী শিল্পী একজন, যন্ত্রী ৪-৫ জন, দিশাধারী দোহার ৩-৪ জন, ঢোল-খোল বা মৃদঙ্গ, হারমোনিয়াম, কাঁস, আড়বাঁশি, মন্দিরা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। রামায়ণ দলীয় সংগীত এবং ধর্মীয় সংগীত হওয়ার কারণে কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক এ গান পরিবেশন করেন। ভগবান রামচন্দ্রের জীবনকথা, ধর্মমত প্রচার ও বিপত্তিসমূহ, সামাজিক সংস্কারমূলক আচরণের বিষয়বস্তুকে রামভক্ত শ্রেণির মানুষের উপজীব্য করে বর্ণনাসহ গীত হতে দেখা যায়।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো রামায়ণ গীত হওয়ার সময় বয়ানকারী অবশ্যই তার বর্ণনা কৌশলে কখনও রামের ভূমিকা, কখনও হনুমানের ভূমিকা, কখনও সীতা, কখনও লক্ষ্মণ, কখনও লব-কুশ এবং প্রয়োজনমতো যে চরিত্রগুলি পালাকে সুবিন্যস্ত করতে কাহিনির মাঝে আনয়ন করা হয়েছে, বয়ানকারীকে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা ও সুর প্রক্ষেপণে মৃদু অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ঐ সকল চরিত্রগুলিকে রূপদান করতে হয়। অর্থাৎ জারি, কবি গানের ন্যায় রামায়ণ গানও এককভাবে বর্ণিত দোহার বা দিশাধারীদের সহযোগিতায় পরিস্ফুটিত একটি দলীয় ধর্মীয় প্রভাবে ব্যাখ্যাত সংগীত।

গায়নরীতি

সর্বপ্রথম যন্ত্রী ও দোহারগণ একটা মঞ্চে বসেন। মঞ্চ মাটির উপরে আলাদা মাদুর ও বেডসিট বা নকশিকাঁথা বিছানো হতে পারে। কিংবা সামান্য উঁচু করে তক্তা কিংবা বাংলা খাট (তক্তা দিয়ে ৪পা বিশিষ্ট) স্থাপন করে সেটি কাপড় দিয়ে ঢেকে তার উপর মঞ্চ তৈরি হতে পারে।

মঞ্চ যেভাবেই হোক মঞ্চের একপাশে গেট বা ফটক তৈরি করে (সাধারণত কলাগাছ দিয়ে গেট তৈরি হয়) গেটের সামনে শ্রীরামচন্দ্রের ছবিটা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ভক্তিরসে আপ্লুত পুরুষ-নারী ভক্তবৃন্দ নির্বিশেষ বৃদ্ধ-যুবক কিশোর-কিশোরী সকলে প্রণাম করে তারপর মঞ্চের চারিদিকে বসে যায়।

অর্থাৎ চারিদিকে শ্রোতা মাঝখানে মঞ্চ। মঞ্চের দুইধারে অর্থাৎ মঞ্চের সীমান্ত বরাবর গোল হয়ে দোহারগণ বসে পড়েন। অতঃপর ২-৪ খানা গানের সঙ্গে যন্ত্রসংগীতের সমন্বয় ঘটিয়ে শ্রোতাদের এ মঞ্চের প্রতি আকর্ষিত করা হয়। এরপর সৃষ্টিকর্তার গুণগান প্রকাশ করত একটা বন্দনাগীতি গাওয়া হয় এবং তারপর মূল শিল্পী দাঁড়িয়ে পালাবর্ণনা শুরু করেন। পাশা বিবরণী অনুযায়ী বর্ণনাকারী মাঝে মধ্যে দোহারদের জন্য বিভিন্ন প্রকার সুর সংযোজন করেন এবং দোহারগণ তালে তালে ঐ সুরগুলি সমন্বিতভাবে সম্পন্ন করেন।

এভাবেই ভক্তিরস, প্রেমরস বা কান্তারস বা আদিরস, জুগুপসা বা জিঘাংসা, বীররস ও করুণরসের সমন্বয়ে রামায়ণ গানের পালা বর্ণিত হয়, গীত হয়। কখনও কখনও বাৎসল্য রসের বর্ণনা কাহিনিতে লক্ষ করা যায়। সাধারণত শীতকালের শুরু হতে বসন্তকাল পর্যন্ত রামায়ণ গান গীত হয়। অর্থাৎ অধিকাংশ লোকশ্রেণির গান প্রাকৃতিক শুষ্ক মৌসুমে আয়োজন হতে দেখা যায় এবং গীত হয়। এলাকার হিন্দু

www.pathagar.com

মুসলিম শ্রেণির মানুষের বসবাস অধিক লক্ষ করা যায়। ধর্মীয় প্রভাবে এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে জারিগানের প্রভাব সর্বোচ্চ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে কবিগান কিংবা পদাবলি কীর্তনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে বর্তমান সময়ে জারিগানের প্রভাবই সর্বাধিক লক্ষ করা যায়।

সাধারণত শীতের শুরুতে বিভিন্ন উৎসবকে ঘিরে এ সকল গান অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা আশ্বিন মাসের শুরু হতে বৈশাখি মেলা অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত জেলার প্রায়ই অঞ্চলে জারিগান, কবিগান কিংবা পদাবলি কীর্তনগান অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। তবে জারিগান কিংবা পদাবলি কীর্তনগান অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো মাঠ বা ভিটে সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু কবিগানের ক্ষেত্রে মাঠ, ভিটে, গাছতলা, পূজামণ্ডপ ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গা লক্ষ করা যায়। এ গুলিকে কবি খোলা বলে ।[৫]

৩. পদাবলি-কীর্তন গান

ফর্ম

একজন মূল শিল্পী, একজন সহকারী মূল শিল্পী, ২-৩ জন সহযোগী শিল্পী, ৪-৫ জন যন্ত্রী, খোল বা মৃদঙ্গ, হারমোনিয়াম, আড়বাঁশি, কাঁস, মন্দিরা ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

গায়নরীতি

পদাবলি কীর্তনের কাহিনি বিন্যাসের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সকলে মিলে যন্ত্র সংগীতের মাধ্যমে সকল দর্শকশ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করে। এরপর যে কোনো একটা ভজনাশ্রিত ধুয়োগান পরিবেশনার মাধ্যমে শুরু হয় পদাবলি কীর্তন।

পদাবলি কীর্তন মানেই দুইজন মূল শিল্পীর বর্ণনাভিত্তিক পালাগান। মূল কাহিনি গীতি আলেক্ষ্য বর্ণনার ন্যায় মূল শিল্পী কাহিনির জন্য নির্মিত পদগুলি আগে সুরে সুরে বয়ান করে এবং সহকারী মূল শিল্পী দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যদিকে বয়ান করে এবং তৃতীয় পর্যায়ে সহকারী শিল্পীরা ঘুরে ঘুরে ঐ একই পদ বয়ান করে। ছন্দে ছন্দে তালের সহযোগিতা করেন যন্ত্রীগণ।

আসরের বর্ণনা

পদাবলি কীর্তন ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও ধর্মীয় কাহিনি আশ্রয়ে নির্মিত, আবর্তিত। গীত এ গান সাধারণত মন্দির প্রাঙ্গণে কিংবা ধর্মীয় আবহ তৈরি করে সেখানে অনুষ্ঠিত হয়। যদি কোথায়ও মন্দিরের প্রাঙ্গণ যথেষ্ট বিস্তৃত না হয় তা হলে কোনো বড় প্রাঙ্গণে এ আসর বসে। চারিদিকে নারী পুরুষ জমিনের উপর চাটাই কিংবা অন্য কোনো বসার আসনে উপবিষ্ট থাকেন।

একদিকে মহিলাদের আসন এবং তিনদিকে পুরুষের আসন। এক্ষেত্রে এলাকার বিশিষ্ট ধর্মীয় জ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষগুলির জন্য মঞ্চের চারিধারে একটু আলাদা করে সম্মুখে বসার বন্দোবস্ত করা হয়। ঐ বিশিষ্ট জনদের সামনে বাঁশ দ্বারা কিংবা সুতলির (টোন) দ্বারা সীমানা নির্দিষ্ট করে একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়। মঞ্চের একপাশে একটা ছোট

www.pathagar.com

টেবিল কিংবা জলচৌকি স্থাপন করে তার উপর আরাধ্য দেবদেবীর ছবিগুলি ধুপধুনো আগরবাতি জ্বালিয়ে পবিত্রতম অনুভূতির সঞ্চারণ কাছে গায়ক গায়িকার সমন্বয়ে গঠিত দলটি মূল উপাখ্যান বা পালাকাহিনি বর্ণনা করেন। পদাবলি কীর্তনের সুর মাদকতাপূর্ণ এবং সেজন্যই উপস্থিত শ্রোতাদর্শক সুরের ঐন্দ্রজালিক আবেগে আচ্ছন্ন থাকে ।[৬]

দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া

সৃষ্টিকর্তার গুণ বর্ণনার নাম কীর্তন। কখনও রাধাকৃষ্ণের প্রেম উপাখ্যান ভিত্তিক কিংবা কখনও সংসার বিরাগী হয়ে ক্ষণিকে একটুখানি মানসিক পরিবর্তনে কিভাবে জগৎসংসারে স্রষ্টার সান্নিধ্য পাওয়া যায় সে কাহিনি বর্ণনার নাম হলো কীর্তন। অথবা ভগবানের প্রতি ভক্তের আকুল নিবেদনের মাধ্যমে কিভাবে স্রষ্টার প্রেম সরোবরে নিমজ্জিত হওয়া যায় সে কৌশলভিত্তিক ভক্তি কাহিনি।

হিন্দু মুসলিম শ্রেণির মানুষ সর্বপ্রথম সুর তাল লয়ে আবদ্ধ নারী পুরুষের সমন্বয়ে পরিবেশিত কাহিনির বর্ণনায় বিমুগ্ধ হয় এবং কেউ ক্ষণিকের তরে কেউবা জীবনবোধে ভালোলাগা পেয়ে ফিরে যায় আপন ভুবনে। সাধারণত সংগীতের এমন আসরে অসাম্প্রদায়িক সহানুভূতি শ্রোতার মনে প্রভাব বিস্তার করে। মানুষে মানুষে ক্ষণিকের জন্য হলেও ভুলে যায় ধর্মীয় সীমাবদ্ধতার কথা। প্রাণের উন্মুক্ত বাতায়ন খুলে প্রেমের পরশরাঙা বাতাসে আন্দোলিত হয় হৃদয়। নবীন পরশে সরসিত হয় মন। মনে বাজে ঐক্যের সুর, মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য।[৭]

৪. লোকযাত্রা

এক সময় লোহাগড়া থানার লক্ষ্মীপাশা, কাশিপুর, কুন্দশী, কালনা, মলিকপুর, ইতনা বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন মৌসুমি পার্বণ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হতো লোকযাত্রা। শীত মৌসুমে বিভিন্ন গ্রামে সংস্কৃতিমনা উদ্যমী যুবকেরা মৌসুমী যাত্রার দল গড়ে তুলতো। স্বাধীনতার পর সত্তর দশক ধরে ইতনা, কোটাকোল, মলিকপুর, লক্ষ্মীপাশা, শালনগর, জয়পুর, লোহাগড়া, নওয়াগ্রাম, নলদী, প্রভৃতি ইউনিয়নে যাত্রাগানের জমজমাট আসর হয়েছে সপ্তাহব্যাপী। যাত্রাপালার এ সময়ের অন্যতম সংগঠক ও অভিনেতার মধ্যে দোয়ামলি-কপুরের বাবু সরকার, কালনার সিরাজ, মন্টু ঠাকুর, জয়পুরের পিকে ঠাকুর, মহিশাপাড়ার মহিউদ্দিন, লোহাগড়ার নিরু ঠাকুর, বারিক দর্জি, লক্ষ্মীপাশার অলোক পাঠক লোকযাত্রাকে ধরে রাখেন।

পরবর্তীকালে সেই ধারাবাহিকতা যাত্রাভিনয় ও সংগঠকের ভূমিকায় এগিয়ে আসেন অসংখ্য উদ্যমী যুবক। তবে এখনও বিভিন্ন পার্বণে অনেক গ্রামে অস্থায়ী যাত্রা দল গড়ে ওঠে এবং দুই এক রাত্রি গান শেষে বন্ধ হয়ে যায়। এ উপজেলায় বিভিন্ন পারিবারিক ও ছোটখাট অনুষ্ঠানে অষ্টকযাত্রা ও রামযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। লোহাগড়া উপজেলার দিঘলিয়া ইউনিয়নের দিঘলিয়া গ্রামের যাত্রা অভিনয়ের শিল্পী শিবনাথ সাহা (৫০) দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে লোকযাত্রা গানের সাথে জড়িত। তার সহকর্মীরা হলেন দিঘলিয়া গ্রামের নিখিল চন্দ্র সাহা (৬০), ডা. দুলাল কৃষ্ণ সাহা

www.pathagar.com

(৫৫), একই ইউনিয়নের আকরাবাড়ির মাস্টার নন্দ দুলাল লস্কর (৫৬), দিঘলিয়া গ্রামের শেখ মহব্বত হোসেন (৪৫)। তার ১৭ জনের দল রয়েছে। এছাড়া দিঘলিয়া ইউনিয়নের লুটিয়া গ্রামের গুসাই চন্দ্র জমাদ্দার, (৫৬) একই গ্রামের প্রভাত মেম্বর (৬০) ও শিবনাথ ঘোষের (৫৫) নেতৃত্বে, কাটাকোল ইউনিয়নের ঘাঘা গ্রামের মিঠু খাঁর নেতৃত্বে (৫০), লুটিয়া গ্রামের মাস্টার রবীন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বে (৬০), জয়পুর ইউনিয়নের ব্যবসায়ী আনিসুর রহমান কামাল (৫০), চাকরিজীবী কালিদাস সরকার (৫৫), ব্যবসায়ী হরিদাস সরকার (৫৫), লোহাগড়ার শিক্ষক মনিরুজ্জামান (৬০), ব্যবসায়ী আশিষ চক্রবর্তী (৪৫), ব্যবসায়ী বাবর আলী (৫৫), মলিকপুরের ব্যবসায়ী নেপাল দত্ত (৬০), শিক্ষক নজরুল ইসলাম (৬০), লোহাগড়ার তুলসি সূত্রধর (৫০), সাংবাদিক সিদ্দিকুর রহমান (৪৭) ও লক্ষ্মীপাশা ইউনিয়নের আমাদা গ্রামের বিরু মল্লিক (৪৮) মৌসুমী যাত্রার সাথে যুক্ত রয়েছেন। সাধারণত বিজয় দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি, বৈশাখ মাস, নামযজ্ঞ ও দুর্গাপূজার সময় এসব মৌসুমী যাত্রার দল বিভিন্ন সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন লোককাহিনি অবলম্বনে যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হয়।

তবে গত দু'বছর সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণে দিঘলিয়ায় যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। নোয়াগ্রাম ইউনিয়নের কলাগাছি গ্রামের বাবুলাল সাহা (৪৮), একই ইউনিয়নের রায়গ্রামের রহিত বাইন (৪৫) গ্রামের সৌখিন যাত্রাভিনয়ের সাথে জড়িত। সর্বশেষ ৩ বছর পূর্বে যাত্রাভিনয় করেছেন। তারপর এ অঞ্চলে আর যাত্রাগান হয়নি। কাশিপুর ইউনিয়নের চালিঘাট গ্রামের নিখিল চন্দ্র বাইন (৫৫) যাত্রাভিনেতা ছিলেন। এ অঞ্চলে এ সময় তার নেতৃত্বে মৌসুমী যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হলেও দীর্ঘ কয়েক বছর আর যাত্রাগান হচ্ছে না।[৮]

খ. লোকনৃত্য

লোকনৃত্য যা দলবদ্ধভাবে পরিবেশিত হয়। এ নৃত্যে জাতীয় জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততা ধরা পড়ে। এ নৃত্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ছবি স্পষ্ট। লোকনৃত্যের মধ্যে মূলত ধর্মীয় নাচ, আনুষ্ঠানিক নাচ ও আচারধর্মী নাচ দেখা যায়। নিজস্ব শৈলীতে এ নৃত্যের মধ্যে মুখ্যত আদিবাসী ঐতিহ্যই বর্তমান। তাঁরা মহিলা পুরুষ সমবেত হয়ে নৃত্যসহ গান পরিবেশন করেন। নড়াইলের কোনো শ্রদ্ধাবাসরে রামায়ণ পালা পরিবেশনের মূল গায়েন চামর দুলিয়ে ছোট্ট পা ফেলে অঙ্গ দুলিয়ে যে অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটান তা শ্রোতার দৃষ্টি কাড়ে। এটা লোকনৃত্যের চলন হিসেবেই গণ্য।

পৌষসংক্রান্তির সময় গ্রামাঞ্চলে যে হালুই গান গাওয়া হয়, তার সঙ্গে পরিবেশিত নৃত্য লোকনৃত্যের অঙ্গীভূত। চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাজিয়ে এক শ্রেণির নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এই নৃত্যের পেছনে শিবের গান বা অষ্টকের গান গাওয়া হয়। বালক-বালিকারা এ নৃত্য পরিবেশন করে বলে হয়তো বালানৃত্য বা বালা নাচ নামকরণ করা হয়েছে। তবে দেউল পুজোয় যে বালাগান পরিবেশিত হয় সেগুলো বিষয়গুণে পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় কাহিনিভিত্তিক পালায় বিভক্ত। বালা ঢোলের বাজনার তালে শুধু গান পরিবেশন করেন না, নৃত্যও পরিবেশন করেন। মতুয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা ঢাক ঢোল ও কাঁসি পিটায় আর হরিচাদ গুরুচাঁদ বলে নৃত্য পরিবেশন করেন

www.pathagar.com

আবার গ্রামে কালী পুজোর উদ্দেশ্যে কুলো নামানো হয়। তাতে থাকে একজন ঢাকী। সঙ্গে কিছু মহিলা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কুলো সঙ্গে করে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। এ সময় তারা যে নৃত্য পরিবেশন করেন তা স্বভাবতই লোকনৃত্যের অঙ্গীভূত। এমনিভাবে গাজির গানে, অষ্টকে, বালাগানে, নামযজ্ঞে, কীর্তনে, বিবাহে, আরতিতে, বরবরণে, বধূবরণ, প্রতিমা বরণ লোকজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে নৃত্য মৃদুভাবে হলেও যুক্ত হয়ে আছে এবং তা এ অঞ্চলের মধ্যে কমবেশি বর্তমান রয়েছে। লোহাগড়া উপজেলার ইতনা গ্রামের স্বপন গুহ রূপান্তর নামে একটি বেসরকারি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অষ্টকগান, হালুইগান, লোকনৃত্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। লোহাগড়া, ইতনা, কচুবাড়িয়া, নলদী, এড়েন্দাসহ বিভিন্ন এলাকায় লোকনৃত্যের প্রচলন রয়েছে।[৩]

কালিয়া উপজেলার লোকনৃত্য

প্রাচীনত্বের দিক থেকে সংগীতের আগেই নৃত্যের অবস্থান। যাদু থেকে উদ্ভূত তাই মুখোশ কিংবা ছদ্মবেশ নৃত্যের প্রাথমিক উপকরণ। আমাদের সংস্কৃতিতে সংগীত, সাহিত্য ও শিল্পকলার মতো নৃত্যের আছে দৃঢ় অবস্থান। তবে শাস্ত্রীয় সংগীতের মতো শাস্ত্রীয় নৃত্য ও নৃত্যশিল্পের ভাষা এবং মুদ্রা আমজনতার কাছে অধরা হয়ে উঠলেও লোকনৃত্যের কাছে তাকে আসতেই হয়। কেননা সেখানেই পোঁতা আছে তার শেকড়।

শাস্ত্রীয় নৃত্য ও লোকনৃত্যের মধ্যে অভিনয়ধর্মিতা থাকতে হবে। এমনকি বাংলাদেশের নিজস্ব নৃত্যকলা বলতে যে গৌড়ীয় নৃত্যকে বোঝায়, তাতেও অভিনয় আছে। বাংলাদেশের লোকনৃত্য বলতে আমরা বুঝি ব্রত-আচার-অনুষ্ঠান ভিত্তিক নৃত্যকলাকে। এসব লোকনৃত্যে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় ঢাক, ঢোল, কাঁস, খোল, করতাল, একতারা, খমক, সারিন্দা, শিঙ্গা ইত্যাদি।

নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলায় লোকনৃত্যের বিশেষ কোনো ধারা প্রচলিত নেই। লোকজীবনলগ্ন আচার প্রথা ব্রত পূজাকে কেন্দ্র করে তা বিবর্তিত হয়। কালিয়ার লোকনৃত্য বলতে যা বোঝায় তা বাস্তুপূজার হালুই গান, চৈত্রসংক্রান্তির অষ্টক গান ও বালাগানের মধ্যে সীমিত। অষ্টকগানের মেয়েরা দলবদ্ধ ভাবে গানের সুরে ও ঢোলের তালে তালে গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন। শিবের হলকর্ষণ, বিবাহ, রুদ্র ও নটরাজ মূর্তি, দশাবতারের কাহিনি বর্ণনার সঙ্গে বালা নৃত্যসহ যে মুদ্রা এবং রুদ্র ভীষণ করুণ, সৌম্যরসের অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটান তা বালাকির নিজস্ব। কালীপূজায় মেয়েরা মাথায় কুলা নিয়ে গ্রামে গ্রামে যে নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে মাঙন করে, নামযজ্ঞে, কীর্তনে, জারিগানে, ভাবগানে, বিবাহে, দেবারতিতে, বরবরণ, বধূবরণ, প্রতিমাবরণ প্রভৃতি লোকজ জীবন সম্ভূত বিষয়ের সঙ্গে লোকনৃত্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে আছে।

তথ্যনির্দেশ

১. আবুল খায়ের (৫৮), মাইটকুমড়া, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া, তারিখ : ২৬.০১.১২
২. সাইফুল ইসলাম, তারিখ : ২১.১২.১১
৩. অমিয় কান্তি বিশ্বাস, সিংগাশোলপুর, নড়াইল, তারিখ : ৩১.০১.১২

www.pathagar.com

৪. বাদল প্রামাণিক, পরিচালক, নৃত্যধারা, নড়াইল, তারিখ : ৩১.০১.১১
৫. অমিয় কান্তি বিশ্বাস, সিংগাশোলপুর,নড়াইল, তারিখ : ৬.১০.১১
৬. শেফালী রানি কির্তনীয়া, গোবরা, নড়াইল, তারিখ : ১৪.১০.১১
৭. তোতা মিয়া মোল্লা, শুভারঘোপ, নড়াইল, তারিখ : ১৪.১০.১১
৮. যাত্রাভিনেতা শিবনাথ সাহা (৫০), কাপড় ব্যবসায়ী, দিঘলিয়া বাজার, দিঘলিয়া ইউনিয়ন, সাংবাদিক সিদ্দিকুর রহমান (৪৫), লোহাগড়া শহর, লোহাগড়া পৌরসভা, ব্যবসায়ী গুসাই চন্দ্র জমাদ্দার (৫৬), লুটিয়া গ্রাম, দিঘলিয়া ইউনিয়ন, তারিখ : ০১.০২.১২
৯. স্বপন গুহ (৬০), ইতনা গ্রাম, ইতনা ইউনিয়ন, নির্বাহী পরিচালক, রূপান্তর, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, বর্তমান ঠিকানা : খুলনা শহর, প্রভাষক, রূপক মুখার্জি (৩৮), লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া পৌরসভা, তারিখ : ২৯.০১.১২

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

প্রাচীনকাল হতে গ্রামীণ মানুষের মধ্যে চিত্তবিনোদনের জন্য গল্পের আসর, তাস খেলা, আড্ডাবাজি করার প্রচলন আছে। বিকেল বেলায় শিশু, বুড়ো, যুবক, কিশোর-কিশোরী সকলে খেলাধুলা করে সময় কাটায়। মেয়ে শিশুরা প্রাইমারি স্কুল মাঠে টিফিনের সময় কিংবা বিকেল বেলায় নানা ধরনের মেয়েলি খেলায় অংশ নেয়।

ছেলেদের খেলা : ১. হাডুডু, ২. ফুটবল, ৩. দাড়িয়াবান্ধা, ৪. জাম্প, লং জাম্প, হাই জাম্প, হপ-স্টেপ জাম্প, ৫. গুল-তাড়া, ৬. মার্বেল, ৭. লাঠিখেলা, সড়কিখেলা, ৮. ঘোড়দৌড়, ৯. নৌকাবাইচ, ১০. ষাঁড় বা এঁড়ে লড়াই, ১১. কুস্তি, ১২. ঘুড়ি উড়ানো, ১৩. কানামাছি।

মেয়েদের খেলা : এতক্ষণ যে সকল লোকখেলার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এর মাঝে কানামাছি এবং গোল্লাছুট ছেলেমেয়ে উভয় শ্রেণিরাই খেলে। এছাড়া গ্রামের মেয়েরা যে খেলাগুলি সবসময় করে সেগুলি হলো ১. কুত কুত, ২. সাত ধাপ্পা, ৩. পলাপলি, ৪. সিন্দুর টোক্কাটুক্কি।

ক্রীড়া মানবজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি, বিশেষ করে লোকক্রীড়া। এই খেলার মধ্যে প্রতিফলিত হয় জীবনসূত্র ও জীবনচর্চার বিষয়-আশয়। এটি যেমন বিনোদনের মাধ্যম, তেমনি অভিব্যক্তির দিগন্ত উন্মোচকও। এই খেলার মধ্য দিয়ে শিশু যুগপৎ আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করে। এসব খেলা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে নড়াইল জেলার কোনো গুরুত্ব না থাকলেও বাংলাদেশের মানচিত্রে যেমন, তেমনি বিশ্ব ক্রীড়াক্ষেত্রেও নড়াইল জেলা যে একটি বিশেষ জায়গায় পৌঁছেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং এর পেছনে নড়াইল এক্সপ্রেস মাশরাফি বিন মুর্তজার অবদান সর্বজন স্বীকৃত। তবে ক্রিকেট ছাড়াও এ জেলা অন্যান্য খেলাধুলার দিক থেকে খুব পিছিয়ে নেই। এ জেলার তিনটি উপজেলার মধ্যে কালিয়া উপজেলায়ও প্রচলিত আছে অনেক খেলা। এ খেলা গ্রামীণ জীবনকেন্দ্রিক হলেও জীবনের মূল এ খেলার মধ্যে বিধৃত হয়েছে। স্রেফ ছেলে-মেয়েদের চিত্তবিনোদনের জন্যে এ খেলা, কিন্তু একদিন এ খেলাই ছিল তাদের একমাত্র খেলা। সে খেলায় শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের দিকও অনুপস্থিত ছিল না। তবে সব খেলা যে শিশুদের তা নয়। লোকক্রীড়া হিসেবে এ খেলায় দক্ষতা অনুযায়ী সব শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ আছে। এ খেলার আছে বিভিন্ন শ্রেণি বিভাগ। যেমন, ছড়া নির্ভর, ছড়া বিমুক্ত। আবার কখনো ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে কখনো আলাদাভাবে। কখনো ঘরের মধ্যে কখনো ঘরের বাইরে। কোনো খেলা উপকরণ মুক্ত, কোনো খেলা উপকরণ যুক্ত। কালিয়া উপজেলায় প্রচলিত ছড়া নির্ভর খেলা কানামাছি, আর ছড়া বিমুক্ত খেলা দাড়িয়াবান্ধা (বান্দা), গোল্লাছুট, হাডুডু, ডাংগুলি, রুমাল সারা ইত্যাদি। এই খেলা শুধু খেলা নয় এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে নৃতত্ত্ব, ঐতিহাসিক উপাদান, যাদুবিদ্যা, গণিত,

www.pathagar.com

অভিনয় ইত্যাদি বিষয়। হাডুডু খেলাটি নৃতাত্ত্বিক বিষয়ের একটি বিশেষ উদাহরণ। এই খেলাটির মধ্য দিয়ে আদিম সমাজের গোষ্ঠী সংগ্রামের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আবার ডাংগুলি খেলাটিকে অনেকে ক্রিকেট খেলার গ্রাম্য সংস্করণ বললেও এ খেলাটির মধ্য দিয়ে আদিম কৃষি কাজের বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে। এ খেলায় ব্যবহৃত 'ডাং' অর্থাৎ ছোট যষ্টি আর কিছু নয়, সেটি আদিম পদ্ধতিতে চাষ কার্যে ব্যবহৃত লাঙ্গলেরই প্রতীক। অন্য অর্থে এই 'ডাং' হলো পুরুষাঙ্গের প্রতীক স্বরূপ। আর মাটিতে খোঁড় গর্তটি নারী যোনীর প্রতীক, যেখানে বীজ স্থাপন করার চেষ্টা। এরকম নানা উপাদানে, তত্ত্বে, তথ্যে পরিপূর্ণ লোকক্রীড়া মানব জীবনের অভিজ্ঞান স্বরূপ। আমরা কালিয়া উপজেলায় প্রচলিত আছে এমন লোকক্রীড়ার বর্ণনা দেবার চেষ্টা করবো।

এখানকার বিভিন্ন লোকখেলাধুলা হলো ফুটবল, ভলিবল, এঁড়ে লড়াই, ঘোড় দৌড়, কুস্তি, সাঁতার, ঘুড়ি ওড়ানো, মোরগ লড়াই ইত্যাদি। ফুটবল সর্বধিক প্রচলিত খেলা। ভলিবল খেলাও একেবারে কম জনপ্রিয় নয়। শীতকালে এ খেলাটি বেশি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম সমাজে কুস্তি খেলাটি পূর্বের মতো অনুষ্ঠিত হয় না। তবে মাঝে মধ্যে কোনো উৎসবে কুস্তি খেলার আয়োজন করা হয়। নওয়াগ্রাম ইউনিয়নের ব্রাহ্মণডাঙ্গা বাজারে প্রতিবছর গ্রামীণ ঐতিহ্য হাডুডু খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এক সময় ৩২ দলের খেলা অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু এখন দলের সংখ্যা কমে যাওয়ায় তিনদিনব্যাপী ১৬ দলের খেলা হয়ে থাকে। এ খেলায় যারা বিজয় অর্জন করে তাদের সাধারণত রঙিন টেলিভিশন দেওয়া হয়। সাঁতার প্রতিযোগিতা আগের মতো অনুষ্ঠিত হয় না। তবে দেশের জাতীয় উৎসবে কমবেশি এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রীষ্মকালে ঘুড়ি ওড়ানোর নেশা ও শখ ছোট ছেলেমেয়ে এবং কিশোরদের মধ্যে অনেকটা অগের মতোই রয়েছে। ঘুড়ি স্থানীয়ভাবে চিলে, কোয়াইড়ে, পতেঙ্গা, জের ঘুন্নিসহ বিভিন্ন নামে পরিচিত।

মেয়েলি খেলার মধ্যে ইচিং বিচিং, কানামাছি, এক্কাদোক্কা, (স্থানীয়ভাবে কুতকুত খেলা) বালিহাঁস, বৌচি, (স্থানীয়ভাবে বুড়িচ্চি, চিবুড়ি) গোল্লাছুট, লুডু, গুলি খেলা, লাটিম, ডাংগুলি, দাড়িয়াবান্ধা (স্থানীয়ভাবে দাইড়ে), এপেন্টি বাক্স, সাতধাপ্পা, সাতচাড়া, বোমবাস্টিং, বুদ্ধিমন্তর, নুনতারে, চম্পক, রাম-সাম-যদু-মধু, চোর-ডাকাত, টিপটপ ওয়েল কাম, ষোলো ঘুটি, খেজুরের সরফা বাজি পোড়ানো, খেজুরের ঢালের গোড়ার মাথা দু'দিকে ছুঁচালো করে চালিয়ে বেড়ানো, কাঁচা তালের দু'টি আঁটি দিয়ে গাড়ি চালানো ইত্যাদি প্রচলিত খেলাগুলি বর্তমান। এসব খেলায় সাধারণত ছোট ছেলেমেয়ে ও কিশোরীরাই বেশি অংশগ্রহণ করে থাকে। সময়ের সাথে সাথে বিনোদনের এসব মাধ্যম হারিয়ে যেতে বসেছে।

এলাকায় শীতের শেষ সময় হতে শুরু করে বৈশাখ মাস জুড়ে ঘোড়দৌড়, কুস্তি, হাডুডু খেলার প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। বিশেষ ক্ষেত্রে লাঠিখেলাও অনুষ্ঠিত হয়। আজও প্রতি বছর নওয়াগ্রাম, নলদী, লাহুড়িয়া, জয়পুর বিভিন্ন অঞ্চলে এসব খেলাধুলা হয়ে থাকে। পূর্বের চেয়ে এখন ঘোড়দৌড় অনেক কমে গেলেও লাহুড়িয়া, নওয়াগ্রাম, নলদী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে এখনও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। তবে এ খেলায় অংশগ্রহণের জন্য অনেকে ভালো জাতের ঘোড়া পালন করে থাকে এবং সুন্দর সুন্দর

www.pathagar.com

নাম দিয়ে থাকে। যেমন র‍্যাব, চিতা, কোবরা, টাইগার ইত্যাদি। প্রতি বছর এসব এলাকায় কোথাও কোথাও এঁড়ে লড়াই প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। মজার ব্যাপার হলো প্রত্যেক ঘোড়া ও এঁড়ে মালিক লড়াইয়ের সময় একজন করে ফকির রাখেন। ফকিরের কাজ হলো নিজ ঘোড়া ও এঁড়েকে তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে আরও বেশি শক্তি বৃদ্ধি করা এবং অন্য কোনো ফকির তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে যাতে এ ঘোড়া ও এঁড়েকে বান বা যাদু-টোনা করতে না পারে বা ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য ঝাঁড়ফুঁক দেওয়া। এসব লড়াইয়ে হার-জিতের পেছনে ফকিরদের তন্ত্রমন্ত্রের হাত রয়েছে ঘোড়া ও এঁড়ে মালিকদের বিশ্বাস রয়েছে।[১]

১. হাডুডু

গ্রাম্য মানুষের কাছে খুব জনপ্রিয় খেলা। সাধারণত পাড়ায় পাড়ায় কিংবা কোনো গ্রামে মাঠ থাকলে সবাই মিলে হাডুডু দল তৈরি হয়। দুই পক্ষে ১৪ জন খেলোয়াড় অংশ নেয় এবং শত শত মানুষ চারিদিকে দাঁড়িয়ে বসে খেলা উপভোগ করে। হাডুডু খেলার নির্দিষ্ট কোট আছে। কোটের দুই পাশে দুই দল দাঁড়ায় এবং একদলের খেলোয়াড় অন্যপক্ষের কোটে ডুগ দেয়। যদি অন্যপক্ষের কাউকে ছুয়ে আসতে পারে তবে অন্যপক্ষের একজন মারা পড়বে বা কমে যাবে। আর যদি ডুগের প্লেয়ার ধরা পড়ে মাঝখানের দাগ পার হতে না পারে তবে সে মারা পড়বে। এভাবে যে দলের সাতজন মারা পড়বে তারা একটা গোল খাবে। এমনি করে হাডুডু খেলায় গোলের খেলা হয়। একজন রেফারি খেলা পরিচালনা করেন। রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

২. দাড়িয়াবান্ধা ও লাফ

ফুটবলের চেয়ে সামান্য ছোট আকৃতির কোট কেটে দুদিকে দু'দল দাঁড়িয়ে এ খেলা সম্পন্ন করা হয়।

লাফ : প্রাচীন খেলা, শহর গ্রাম সর্বত্র চলে। কিছু মাটি কোদালে ওলটপালট করে রাখা হয়। যাতে খেলোয়াড়রা লাফিয়ে পড়লে ব্যথা না পায়। লাফ শুরু করার জন্য একটা নির্দিষ্ট দাগ থাকে। যে যত বেশি দূরত্ব পার হয় সে বিজয়ী হয়। এটাকে লম্বা লাফ বলে। খুঁটিতে দড়ি বেঁধে উঁচু করে লাফিয়ে পার হতে যে বেশি উঁচুতে যায় সে বিজয়ী হয়। এটাকে হাই জাম্প বলে।

একবার ডানপায়ে ভর দিয়ে এবং একবার বামপায়ে ভর দিয়ে এবং শেষবার দুইপায়ে ভর দিয়ে সোজা লাফিয়ে যে বেশি দূরত্ব পার হয় সে বিজয়ী হয়। একে ধাপ, ঝাপ, লাফ বলে। উঁচু স্থানে দড়ি বেঁধে একটা লাঠিতে ভর দিয়ে যে খেলোয়াড় সর্বোচ্চ উঁচু দড়ি পার হয় সে বিজয়ী হয়। এটাকে পোল জাম্প বলে। সাধারণত স্কুল কলেজে কিংবা গ্রামের ক্লাবে খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়।

৩. গুলতাড়া

একটা লম্বা লাঠি এবং চার আঙ্গুল সাইজের একটা গুল, একটা মূল খুঁটি এ খেলার সরঞ্জাম। গ্রামে লম্বা লাঠিকে তাড়া বলে গুলকে গুল বলে এবং খুঁটিকে কাকড়ি বলে।

www.pathagar.com

একজন করে খেলোয়াড় খেলা করে। একজন গুল ছুড়ে দেয় আরেকজন তাড়া দিয়ে পিটিয়ে দূরে দেবে। যদি গুল উপরে উঠে যায় এবং যে ছুড়ে দিল সে যদি শূন্য হতে গুল ধরে ফেলে তা হলে যে পিটায় সে বাতিল হয়। যদি গুল ধরা না পড়ে তা হলে ঐ দুইজন ছুড়ে যে দেবে, পিটাবে যে দুজনেই দৌড়াবে ঐ গুল ধরার জন্য। যদি পেটানো খেলোয়াড় আগে গুল ধরে তা হলে গুল হতে কাকড়ি পর্যন্ত তাড়া মাপ দেয়া হবে। একতাড়াকে গড়ে, ধুতি, তিনি, চারি, পাঞ্চি, ছয় অর্থাৎ এভাবে ছয় কাঠিতে ছয় হয় কিন্তু সাতকাঠি দূরত্ব না হলে ঐ ছয় সঞ্চয় হবে না। ছয় যতগুলি সঞ্চয় হবে– ততগুলি পেটানো প্লেয়ার নিজে বা দলীয় অন্যজনকে দিয়ে পেটাতে পারবে বা ব্যাটিং-এ থাকবে। যে চালবে বা বোলিং করবে মোট ৬ বার গুল চালতে পারবে। মূলত বর্তমান ক্রিকেট খেলার অবিকল গুলতাড়া খেলা।

৪. গুলি বা মার্বেল

২-৪ জন মিলে কাচের গুলি বা মার্বেল খেলা হয়। একটা কোটে ২টা দাগ থাকে। একটা দাগে বসে মার্বেল চালতে হয় এবং সামনে একটা দাগ পার হয়ে একটা গর্ত গ্রাম্য ভাষায় গর্তকে ফিলি বলে। যে ফিলির কাছে মার্বেল রাখবে সে দান দেবে। মার্বেল প্রত্যেকে ২টা করে বা ৪টা করে দিয়ে একসাথে করে দান দিতে হয়। প্রতিপক্ষ একটাকে লক্ষ করবে ঐটা বাদে যে কোনো একটায় লাগলে দান ওয়ালা জিতবে। তবে ২টায় লাগলে ১টা ফাইন দিতে হবে।[২]

৫. লাঠিখেলা

নড়াইল এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। রঙিন পোশাকে সজ্জিত দুই দল একজনের সামনে একজন দাঁড়িয়ে বাদ্যযন্ত্র ঢোলের তালে তালে নেচে নেচে একজন আরেকজনকে আক্রমণ করবে এভাবে যে অসতর্ক থাকবে সে আক্রান্ত হবে। ছোট বেলায় দেখেছি এ খেলা দুইপক্ষে ঢাল সড়কি দিয়েও হয়েছে। খুব মজার দেখতে। লাঠিয়ালদের দৈহিক কসরত ও কৌশল দেখে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না।[৩]

লাঠিখেলায় পারদর্শী ছিলেন ছোট কালিয়া গ্রামের জয়, বিজয়, কণ্ঠীরাম। এঁরা ছিলেন খুব উঁচু পর্যায়ের খেলোয়াড়। এঁরা ছাড়া কালীনগর গ্রামের মনোহর দারোগা ছিলেন একজন কুশলী শিল্পী। তিনি রাম দা ভাঁজা, লাঠি চালনা ও উঁচুতে লাফিয়ে ওঠায় ছিলেন বিশেষভাবে পারদর্শী।[৪] লাঠিখেলার জনপ্রিয়তার কারণের হোক কিংবা বংশ বা গোত্রের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখানোর জন্যেই হোক দু'টি বংশের আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার অনুষ্ঠানেও প্রচলিত ছিল।

মাউলী গ্রামের লাঠিয়ালরা খুলনা এলাকায় ধান কাটার মৌসুমে গণ্ডগোলের জমিতে লাঠিয়ালি বা লেঠেলগিরি করে ধান কেটে দিয়ে আসতেন। এ গ্রামের লাঠিয়ালদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন শ্রীদাম বিশ্বাস (সাধু), বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, দশরাথ বিশ্বাস, পঞ্চানন বিশ্বাস (জেলে), বৈষ্টম মাঝি, কমল বিশ্বাস, যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রমুখ। এঁরা বর্ষা মৌসুমে গ্রামে জড়ো হয়ে লাঠিখেলা অনুশীলন করতেন।[৫]

www.pathagar.com

লাঠিখেলা জনপ্রিয় এবং ভয়ংকর খেলা হলেও এ খেলার সৌম্য, শান্ত ও নান্দনিক দিকও বর্তমান। ইদানীং এ খেলার কোপাকুপির দিকটি পরিহার করে শিল্পিত রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বাজনার তালে তালে একদল লাঠিসহ বিচিত্র নৃত্য পরিবেশন করেন এবং দেখান লাঠি ঘুরানোর কৌশল। এটা এক রকমের লাঠিখেলা। অন্যটি হলো হার জিতের খেলা। প্রথমটাতে নৃত্যশৈলীর প্রকাশ ঘটে, দ্বিতীয়টিতে লাঠি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করার কৌশল প্রদর্শিত হয়। তবে হার জিতের এ খেলায় একজন লাঠিয়াল আর একজন লাঠিয়ালের বগলের নিচে লাঠি দিয়ে মৃদুভাবে ছুঁয়ে দিলে সে জিতে যাবে। এ প্রকার লাঠিখেলায় লাঠিয়ালের লাঠির প্যাঁচও দর্শনীয় বিষয়। উভয় খেলায় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার আছে।

৬. ঘোড়দৌড়

অনেকগুলি ঘোড়া একত্রে ২-৪ কিলোমিটার দূরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট রাস্তা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রত্যেক ঘোড়ায় একজন চালক যাকে সইস বলে । একবার, দু'বার, তিনবার ঘোড়ার দৌড় হয়। মূল ছাড়ার জায়গা হতে কমিটির সিদ্ধান্তে ঘোড়াগুলি একত্রে ছাড়া হয় এবং নির্ধারিত দূরত্ব শেষে একটা জায়গা ঠিক থাকে তাকে ছদ বলে- যে ঘোড়া আগে পৌছাবে সে ঘোড়া বিজয়ী হয়। পরপর দুইবার প্রস্তুতিমূলক দৌড় হয় এবং শেষবার চূড়ান্ত দৌড় হয়। শেষবার যে ঘোড়া আগে পৌছায় সে বিজয়ী হবে। এক্ষেত্রে ১ম, ২য়, ৩য় পুরস্কার থাকে। সদর থানার চাকই, বিলডুমুর তলা, কালিয়া পেড়লী, খড়রিয়া', বড়দিয়া, বাগডাঙ্গা গ্রামে ঘোড়দৌড় হয়।

লোহাগড়া উপজেলার লাহুড়িয়া ও নওয়াগ্রামসহ কয়েকটি ইউনিয়নের প্রধান লোকউৎসব হলো ঘোড়দৌড়। রবি শস্য উঠার আগ থেকে শুরু করে দু'তিন পর্যন্ত ফাঁকা বিলের মধ্যে এসব গ্রামে অসংখ্যবার গ্রাম বাংলার এ জনপ্রিয় ঘোড়দৌড় উৎসব হয়ে থাকে। এ উৎসবের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিন নেই। লাহুড়িয়া ইউনিয়নের হ্যাসলাগাতি, দিননাথপাড়া, লাহুড়িয়া পশ্চিমপাড়া, এগারনালি, সরশুনা, কামারগ্রাম, রাজাপুর, নওয়াগ্রাম ইউনিয়নের ব্রাহ্মণডাঙ্গা, নলদী ও শালনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে আকর্ষণীয় ঘোড় দৌড় ও মেলা হয়। পরে রাতে জারিগান অনুষ্ঠিত হয়। লাহুড়িয়া ইউনিয়নের ডহরপাড়ার শুকুর (৪৫) ও জুয়েল মিয়া (৪০), গোবিন্দপুরের শিমুল (৩৫), লাহুড়িয়া পশ্চিমপাড়ার মাসুম বিশ্বাস (৪০) ও গোলাম রসুলের ১টি করে এবং সরশুনায় ২টি দাবুড়ে ঘোড়া রয়েছে।[৬]

৭. নৌকাবাইচ

নদীতে নির্দিষ্ট দূরত্বে অনেকগুলি নৌকা একত্র করা হয়। প্রতি নৌকার ২ পাশে প্রায় ২৫-৩০ জন লোক বৈঠা বেয়ে নেবার জন্য থাকে- এদেরকে বাইছে বলে। একজন পিছনে হাইল ধরে দাঁড়ায় একজন সামনে গলুইয়ের চরাটে হাঁটু গেড়ে বসে মাথা দুলিয়ে উৎসাহ দেয় একজন মাঝখানে কাঁস পিটিয়ে তালে তালে বৈঠা টানায় উৎসাহিত করে। দুইবার কিংবা তিনবার নৌকা নির্দিষ্ট দূরত্ব পেরিয়ে লক্ষ্যস্থল অতিক্রম করে। দুইবার প্রস্তুতিমূলক নৌকাবাইচ হয় এবং একবার অর্থাৎ তৃতীয়বার চূড়ান্ত নৌকাবাইচ।

www.pathagar.com

ঘোড় দৌড়

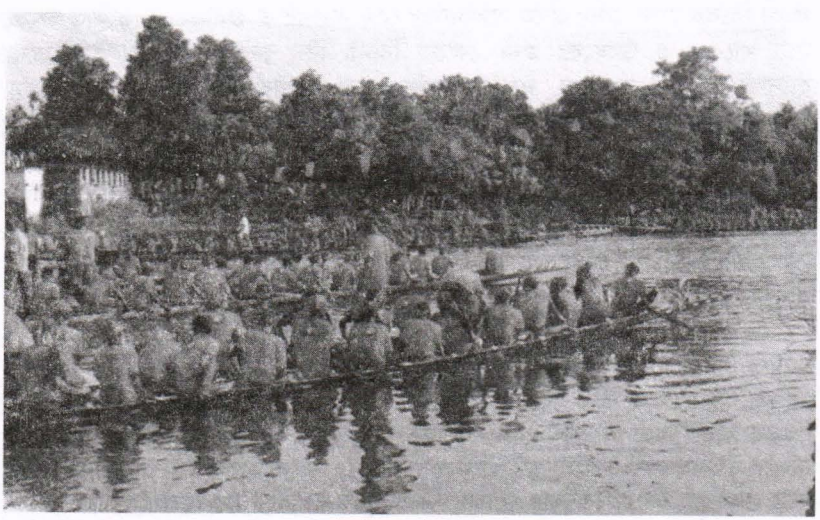

নৌকা বাইচ

www.pathagar.com

যে নৌকা আগে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবে সে নৌকা বিজয়ী। বাইচ শেষে পুরুষ মেয়ে দল বেঁধে নৌকার উপর নেচে নেচে সারিগান গায়। খুব জনপ্রিয় খেলা এবং উপভোগ্য। চিত্রা নদীতে শ্রাবণ মাসে কালিয়ার বেড়লীতে ভাদ্র মাসে ঘরলিয়ায় ভাদ্র মাসে নৌকা বাইচ হয়।

নদী বিধৌত নড়াইলের একটি অন্যতম লোকউৎসব হলো নৌকাবাইচ। প্রতি বছর শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন মাসে এ উপজেলার নবগঙ্গা ও মধুমতি নদীতে গ্রাম বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়। নৌকা দিয়ে বাইচ অনুষ্ঠিত হয় তার নাম বাইচের নৌকা। নৌকাগুলি সাধারণত ২৫ থেকে ৬০ হাত লম্বা। প্রতি নৌকায় ২০ জন থেকে ৬০ জন বাইছে (যারা নৌকা চালায়) থাকে। এবারও গোন্ডব, গাছবাড়িয়া ও বালিদিয়ায় এলাকায় বর্ষা মৌসুমে বিখ্যাত তুষখালি দোয়ায় নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়। গোন্ডব, চালিঘাট, চরবালিদিয়া, কামারগ্রাম, গাছবাড়িয়া, সরশুনাসহ বিভিন্ন গ্রামে বাইচের নৌকা রয়েছে।

এর মধ্যে কাশিপুর ইউনিয়নের চালিঘাট গ্রামের বাকা মেম্বর (৪৫) ও গোন্ডব গ্রামের শুকুর মোল্যার (৬০) বাইচের নৌকা বিখ্যাত।

নলদী ইউনিয়নের হলদা গ্রামের ইছামতি বিলে প্রতি বর্ষা মৌসুমে নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। চরবালিদিয়া, গোন্ডব, সরশুনা, চালিঘাটসহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে বাইচের নৌকা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।[৭]

৮. ষাঁড়ের বা এঁড়ে লড়াই

মুখোমুখি দুটি ষাঁড় বা এঁড়েকে দাঁড় করিয়ে মাথায় মাথায় যুদ্ধে উৎসাহিত করা হয়। ষাঁড়ের শিংগুলি ধারালো করা হয়। যে ষাঁড় কৌশলে কিংবা গায়ের জোরে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেবে সে বিজয়ী। তবে চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য একটা ষাঁড়কে ৩-৪টা ষাঁড়ের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুরধার শিং এর আঘাতে প্রতিপক্ষ ষাঁড়ের শরীরে ক্ষতসৃষ্টি হয়। অনেকক্ষেত্রে পেটে আঘাত পেয়ে অনেক ষাঁড়ের নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যায়। অনেকক্ষেত্রে বিপাকে পড়ে পা ভেঙে যায়। ষাঁড় বা এঁড়ের লড়াই খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির বা পৈশাচিক খেলা তবুও গ্রামের সাধারণ মানুষ এ খেলায় ভীষণ খুশি ও উৎসাহবোধ করে। এঁড়েকে জেতাবার জন্য এক ধরনের লোক তন্ত্রমন্ত্র ব্যবহার করে- তাদেরকে গুনিন বলে। এঁড়ের শরীরে পড়া তেল মাখানো হয় যাতে এঁড়ের রাগ বেশি হয় এবং অন্যকে আক্রমণে উৎসাহী হয়।[৮]

৯. গোল্লাছুট

দুই দলে খেলা হয়। একদলে ৩-৪ জন প্লেয়ার থাকে। যদি মোট প্লেয়ার ভাগ করলে একজন বেশি হয় বা সংখ্যা বেজোড় হয় তা হলে একজনকে খলের বুড়ি তৈরি করা হয়। খলের বুড়ি সমানভাবে উভয়দলে খেলতে সুযোগ পায়। লটারি করে যারা বিজয়ী হয় তারা আগে খেলা শুরু করে। গ্রাম্য ভাষায় বলে তাদের খল আগে। খল একদল শুরু করে এবং এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ বলে "গোল্লা পাকে" খলের দল বলবে পাকে। এরপর মূল কোট থেকে ছুটে অর্থাৎ দৌড়ে খেলার নির্দিষ্ট সীমানায় পৌঁছাতে হয়।

www.pathagar.com

খলের দলে যে কয়জন প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে চূড়ান্ত সীমায় যাবে, তারা সবাই পাকা প্লেয়ার। এরপর মূল কোট থেকে চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত মোট সাতটি কোট তৈরি করা হয় এবং এক কোট থেকে অন্য কোটে দৌড়ে পৌঁছে যেতে হয় যে কয়জন পাকা প্লেয়ার তাদের সবাইকে। যদি প্রতিপক্ষ মূল সীমানায় পৌঁছাবার আগে কাউকে ছুয়ে দিতে পারে তা হলে ঐ প্লেয়ার মারা যাবে এবং ঐবার ঐ খেলায় অংশ দিতে পারবে না। তবে মূল সীমান্তে যাবার জন্য পাকা প্লেয়াররা মোট সাত কোটে দাঁড়িয়ে অবসর যাপন কিংবা সুযোগ দিতে পারবে।[৯]

১০. কুস্তি

যারা কুস্তি করে স্থানীয় নিয়মানুযায়ী তারা পরস্পর পাল্লা লড়বে। একজন আরেকজনকে ধরাশায়ী করবে। যে অন্যকে পরাজিত করতে পারবে সে "মীর" হবে। কুস্তিগীরদের "মাল" বলা হয়।

১১. ঘুড়ি উড়ানো

কিশোর বালক কিংবা পূর্ণ মানুষ যে কোনো ধরনের লোকদের ২০-৩০ জন অথবা আরও বেশি লোক একত্রে তাদের ঘুড়ি অবশ্য ঘুড়ির নাম অনুযায়ী আকাশে ঘুড়ি উড়াবে এবং একজন অন্যজনের ঘুড়িকে হাতের কৌশলে সুতার আঘাতে নিচে নামানোর চেষ্টা করবে। সবশেষে যে ঘুড়ি আকাশে থাকবে সেটা বিজয়ী হবে।

১২. কানামাছি

৫-৬ জনের একটা দল হবে। পর পর সবাইকেই চোখ বাঁধা হবে। একজনের চোখ বেঁধে দেয়া হবে এবং অন্য সকলে চারিদিক ঘুরে ঘুরে চোখ বাঁধা জনকে খামচি দেবে। সকলে শব্দ করে বলবে "কানামাছি ভো ভো, যারে পাবি তারে ছো" চোখ বাঁধাজন যদি কাউকে ছুয়ে দিতে পারে তা হলে তার চোখ খোলা হবে এবং যাকে ছুয়ে দেয়া হবে তার চোখ বেঁধে দিতে হবে ও তাকে প্রথমজনের মতো করা হয়।[১০]

১৩. কুতকুত

কুতকুত কোট কেটে নিতে হয়। যেমন-একটা চাড়া সামনে দাঁড়িয়ে অথবা বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে মাথার উপর দিয়ে পিছনের দিকে ফেলে তারপর খেলা শুরু করতে হয়। তবে কোটের প্রথম ঘরে প্রথম চাড়া ফেলতে হয়। এরপর এক পা উঁচু করে এক পায়ে চাড়া ফেলতে হয়। এরপর এক পা উঁচু করে এক পায়ে চাড়া ঠেলে পঞ্চ ঘর পর্যন্ত যেতে হবে। পঞ্চম ঘরে গিয়ে দুই পা দিয়ে দাঁড়ানো যাবে এবং পুনরায় চাড়া একইভাবে পা দিয়ে ঠেলে প্রথম অবস্থানে এনে মোট কোটের বাইরে চাড়া আনতে পারলে এক ঘর জয় হলো। এভাবে পাঁচ ঘর জয় হলে সে আবার খেলতে পারবে। তবে খেলার সময় চাড়া যদি কোনো দাগের উপর পড়ে কিংবা কোটের বাইরে যায় তা হলে ঐ খল বাদ হয়ে যাবে ও দ্বিতীয় পক্ষ খেলা শুরু করবে।

www.pathagar.com

১৪. সাত ধাপ্পা

এ খেলায় কমপক্ষে দুইজন করে প্লেয়ার দুই পক্ষে থাকে। এক্ষেত্রে চারজন ছয়জন বা তার বেশি প্লেয়ার এক দলে থাকতে পারে। একটা নির্দিষ্ট মাঠের এক কোনায় একটা গোলঘর থাকবে। ঐ ঘর থেকে খেলা শুরু করতে হবে। লটারিতে যে দল জিতবে তাদের খল আগে। মূল কোট ছেড়ে সবাই দৌড় শুরু করে পুরো মাঠ ঘুরবে এবং কষ্ট হলে কেউ ছুয়ে দেবার আগে কোটে ফিরে দাঁড়াবে। যদি প্রতিপক্ষ কাউকে ছুয়ে দেয় তা হলে যে স্থানে ছুয়ে দেবে ঐ স্থান হতে সাতবার লাফানোর মতো ধাপ্পা দিয়ে যদি মূল কোটে প্রতিপক্ষের কেউ পৌঁছে যেতে পারে তা হলে প্রথম পক্ষ হেরে গেল এবং দ্বিতীয় পক্ষ খেলা শুরু করবে। এভাবেই জয় পরাজয় নির্ণয় করে।

১৫. পলাপলি

৫-৬ জন মিলে প্রথম গোল হয়ে হাতে হাতে ধরাধরি করে দাঁড়াবে এবং হাত দুলিয়ে হাতের পর হাত দেবে। তবে নিজের বাম হাতের পর ডান হাত দেবে। যদি হাত চিৎ করে রাখে এবং একজন উপুড় বা ভুট করে রাখে তা হলে ঐ একজন কাজে হবে অর্থাৎ খেলতে হবে না। ঐ একজন ব্যতীত অন্যরা আবার খেলবে। এভাবে সবশেষে দু'জন খেলবে এবং সেক্ষেত্রে আগে বলা হবে হাত চিৎ করলে "কাজে" ভুট করলে "কাজে না"। এভাবে সবশেষে যে প্লেয়ার "কাজে" হতে পারবে না- সে চোর হবে এবং তা খাটনি খাটতে হবে। দূরে নির্দিষ্ট একটু খুঁটি কিংবা গাছ ছুয়ে আসতে হবে পিছনে দেখা যাবে না। কিংবা চোখ বুজে ১০ পর্যন্ত গুনতে হবে। এই ফাঁকে অন্যরা পালাবে। চোর খুঁজতে শুরু করবে। যদি না পায় বলতে হবে "কুক" দাও- সবাই কুক দেবে চোর খুঁজবে। পালানো প্লেয়ার যদি চোরকে পিছনের দিক থেকে ছুয়ে দেয় সে আর পালাবে না। যদি চোর সামনাসামনি কাউকে দেখে যদি বলে "একটিপ" তা হলে যাকে দেখে "একটিপ" বলবে সে চোর হবে এবং পুনরায় গোড়া থেকে খেলা শুরু হবে।

১৬. সিঁদুর টোক্কাটুক্কি

দুই দলে ৬-৮ জন প্লেয়ার থাকবে। দুইজন প্রতিনিধি বা ক্যাপ্টেন থাকবে। সামনাসামনি ১০-১৫ হাত দুরে ২টা কোটে দুই দল বসবে। প্রত্যেক প্লেয়ারের গোপন নাম থাকবে। লটারিতে বিজয়ী দল খেলা শুরু করবে। বিজয়ী ক্যাপ্টেন প্রতিপক্ষের একজনের চোখ বন্ধ করে তার দলের প্লেয়ারকে গোপন নাম যথা- আয়রে আমার গোলাপ ফুল, এভাবে ডাকতে সে এসে চোখ বন্ধরাখা প্লেয়ারের কপালে দুই আঙ্গুলে টোক্কা দিয়ে চলে যাবে। এরপর চোখ খুলে দেয়া হবে। যদি চোখ খুলে কে টোক্কা দিয়েছে বলতে পারে তা হলে চোখ বন্ধ রাখা দলের যে কেউ লাফিয়ে সামনে যাবে এবং অন্য সবাই তার পাশে বসবে এবং পুনরায় চোখ বন্ধ করা হবে ও পুনরায় খেলা হবে। যদি না বলতে পারে তা হলে প্রতিপক্ষ লাফ দেবে এবং সবাই সামনে আসবে। এভাবে যারা লাফিয়ে অন্য কোটে পৌঁছাতে সক্ষম হবে তারা বিজয়ী। উপরোক্ত খেলাগুলি ছাড়াও লুডু, ষোলো গুটি, গাছচাম্পা ইত্যাদি খেলা মেয়েরা খেলে থাকে।[১১]

www.pathagar.com

১৭. ঢাল-সড়কি খেলা

ঢাল-সড়কি খেলা বিষয়ে কালিয়া উপজেলায় একটি ইতিহাস হয়ে আছে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পরে হিন্দু মুসলমানদের ঐক্য বজায় রাখার প্রশ্নে তখন মুসলিম লিগের জাতীয় পরিষদের সদস্য লতিফ গাজি (মৃ. ২৭ জুন, ১৯৭৭) হিন্দু ও মুসলিম জনসমষ্টির মধ্যে ঢাল-সড়কির খেলার ব্যবস্থা করেন। কালিয়া হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত এ খেলার প্রথম দিকে ছিল রণনৃত্য পরিবেশনা। আর মূল কোপাকুপির খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় কালিয়া থানার উঠোনে। এই খেলায় যাতে কোনো অঘটন ঘটতে না পারে এ জন্যে দারোগা সাহেব বিশেষ ব্যবস্থা করেন। ঢাল-সড়কির খেলায় হিন্দুদের মধ্যে নেতৃত্ব দেন কালিয়ার নলিনী চৌকিদার, আর মুসলমানদের মধ্যে নেতৃত্ব দেন বড়নাল গ্রামের তাহের উদ্দিন (উচ্চতা ছিল প্রায় ৭ ফুট)।

এ খেলা যথেষ্ট বিপজ্জনক সত্ত্বেও বিশেষ জনপ্রিয়তার কারণে তখনকার দিনে সপ্তাহে অন্তত একদিন কখনও ছোট কালিয়া গ্রামের বামাচরণ বিশ্বাসের (ফয়লা) বাড়িতে, কখনও হারান চন্দ্র রায়ের বাড়িতে, কখনও বা মির্জাপুর গ্রামের ফুলেশ্বর সরকারের (বাছাড়) বাড়িতে এই খেলার আয়োজন ও অনুশীলন হতো।[১২]

তথ্যনির্দেশ

১. গাউসুল আজম মাসুম(৩৫), ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রাম, নওয়াগ্রাম ইউনিয়ন, তারিখ : ২৫.০১.১২ শিক্ষক আব্দুল জলিল (৩০), লাহুড়িয়া, লাহুড়িয়া ইউনিয়ন, তারিখ : ০৩.০২.১২ অষ্টম শ্রেণির ছাত্র নূর জালাল খান তালবাড়িয়া গ্রাম, ও অষ্টম শ্রেণির ছাত্র জিনাল মোল্যা, দিঘলিয়া গ্রাম, দিঘলিয়া ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা , তারিখ : ০৫.০২.১২
২. আজিবর রহমান, কৃতী ক্রীড়াবিদ, বাঁশগ্রাম, নড়াইল, তারিখ : ০২.০১.১২
৩. মো. বাচ্চু মিয়া, বগুড়া, বাঁশগ্রাম, নড়াইল তারিখ : ০৯.০১.১২
৪. ডা. সন্তোষকুমার বিশ্বাস (৭২), পিতা : বাদলচন্দ্র বিশ্বাস, মাতা : রেনুকাবালা বিশ্বাস, ছোট কালিয়া, তারিখ : ২০.০৮.২০১১
৫. প্রফুল্ল সরকার (৮০), পিতা : প্রভাষচন্দ্র সরকার, মাউলী, কালিয়া, তারিখ : ০৫.০৯.২০১০
৬. মাসুম বিশ্বাস (৪০) লাহাড়িয়া পশ্চিমপাড়া, আব্দুল জলিল (৩০) লাহুড়িয়া সৈয়দপাড়া, লাহুড়িয়া ইউনিয়ন, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ০৬.০২.১২
৭. রেজাউল ইসলাম (৩৫), উপজেলা প্রতিনিধি, দৈনিক সমকাল, লোহাগড়া, তারিখ : ০৫.০২.১২
৮. অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম ও আব্দুর রশিদ মন্নু ,নড়াইল, তারিখ : ১২.০১.১২
৯. উর্মী, তারাপুর, নড়াইল, তারিখ : ১৪.০১.১২
১০. শাপলা, নবম শ্রেণি, মাইজপাড়া, নড়াইল, তারিখ : ২.০১.১২
১১. বিন্নি, পঞ্চম শ্রেণি, দুর্গাপুর, নড়াইল, তারিখ : ১৭.০১.১২
১২. নিতাই দাস বিশ্বাস (৭৭), অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, ছোট কালিয়া, নড়াইল, তারিখ : ২৮.০৮.২০১১

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

নড়াইল অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোকপেশাজীবীদের উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে যাঁরা, তাঁরা হলেন : কামার-কুমার, ধোপা, মুচি, বাগদি, মোদক, জেলে, স্বর্ণকার, সূত্রধর, পাটনি, মালি, কারিগর বা জোলা, দাই, হাজাম, বাজনদার, বাউতি বা কাহার, কলু, বেদে বা বেপারি প্রভৃতি।

১. চুনারি

নড়াইল অঞ্চলে পুকুর ডোবার পানি পরিষ্কার, ঘরের দেয়ালে চুনকাম ইত্যাদি ক্ষেত্রে শামুকের তৈরি চুন হামেশাই ব্যবহার হতে দেখা যেতো। এ চুন তৈরি হয় ভাটায়। যাঁরা চুন তৈরি করেন তাঁদেরকে চুনারি বলা হয়। নড়াইলে মাত্র দশ বছর আগেও প্রায় একশটি চুনের ভাটা পাওয়া যেতো। বর্তমান সময়ে ৮-১০টি চুনের ভাটা আছে। নড়াইল সদর উপজেলার গোবরা গ্রামে কার্ত্তিক বাউতির শামুকের চুনের ভাটা আছে এবং শামুকের তৈরি চুনের নানা-বিষয় নিয়ে কথা হয় কার্ত্তিক বাউতির সাথে। সাক্ষাৎকারটি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

তথ্য প্রদানকারী : আমার নাম কার্ত্তিক বাউতি।

তথ্য সংগ্রহকারী : আপনি কতদিন যাবত চুনের কাজ করছেন ?

তথ্য প্রদানকারী : আমি আমার জন্মের কিছুদিন পর যখন একটু আধটু কাজ করতে পারতাম তখন থেকেই বাবার সাথে চুনের কাজ করি এবং ভাটায় চুন তৈরির যাবতীয় কায়দা কানুন শিখে নেই। কারণ চুনের পেশা আমাদের পারিবারিক পেশা। আমার দাদুভাই বা তার বাবার আমল হতে চুনের ব্যবসা আছে।

তথ্য সংগ্রহকারী : চুন তৈরির প্রক্রিয়া আমায় জানাবেন কী ?

তথ্য প্রদানকারী : চুন তেরির জন্য সর্বপ্রথম দরকার হয় শামুকের খোসা। সাধারণত বর্ষাকালে শামুক বিলে সৃষ্টি হয়। তবে সারা বছরও বিলে কিংবা ডোবায় শামুক পাওয়া যায়। যাহোক শামুক সংগ্রহ করার পর ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হয়। এরপর চারিদিক মাটির প্রলেপ দিয়ে গোলাকার বেশ বড় আকারের ঢিবির ন্যায় ভাটার চুলা তৈরি করা হয়। ঢিবির মুখের একদিকে একটা মাত্র ছিদ্র রাখা হয় বাতাস ভিতরে প্রবেশ করানোর জন্য এবং ঐ ছিদ্রের মুখে একটা পাম্প মেশিন বসানো হয় যাতে ফুঁক দিলে ভিতরে বাতাস প্রবেশ করে। এরপর শুকনো জ্বালানি কাঠ ভাটার মধ্যে সুন্দরভাবে সাজিয়ে এর উপর শামুকের খোসা ছড়িয়ে দিতে হয় এবং ছড়ানো শামুকের খোসার উপর পুনরায় জ্বালানি কাঠ বিছিয়ে দিয়ে তারপর ঐ কাঠে আগুন জ্বালিয়ে দিলে

www.pathagar.com

কাঠ ও শামুকের খোসা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শামুক একবার পুড়ে যাবার পর আগুনের উত্তাপ থাকা অবস্থায় আবার কিছু শামুকের খোসা তার উপর দিয়ে দেওয়া হয় এবং এগুলিও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ভাটার চুলার উপর বেশ বড় নল বসানো হয়, যাতে ভাটার চুলার ধোঁয়া আকাশের দিকে উড়ে যায় এবং পরিবেশের কোনো প্রকার ক্ষতি না হয়। এরপর পামি মিশিয়ে চুন তৈরি করা হয়।

তথ্য সংগ্রহকারী : কতটুক শামুকে কতটুক চুন হয় ?

তথ্য প্রদানকারী : পঁচিশ বস্তা শামুকে আঠারো বস্তা বা বারো মণ চুন তৈরি করা যায়।

তথ্য সংগ্রহকারী : চুন তৈরি করে কতটুকু লাভবান হওয়া যায় ?

তথ্য প্রদানকারী : মাত্র দুই বছর আগেও এক বস্তা শামুকের দাম ছিল ৪০ থেকে ৫০ টাকা। বর্তমান এক বস্তা শামুকের দাম ১৪০ টাকা হতে ১৫০ টাকা কিন্তু চুনের মূল্য আগের তুলনায় বাড়েনি। সুতরাং বর্তমান সময়ে চুনের কাজে তেমন ব্যবসা নেই। বাপ-দাদার ব্যবসা হিসেবে এখনও আমরা দুই চারজন এ ব্যবসা ধরে রেখেছি।

তথ্য সংগ্রহকারী : কীভাবে এ ব্যবসা হতে লাভবান হওয়া যায় এবং চুন শিল্পকে টিকিয়ে রাখা যায় ?

তথ্য প্রদানকারী : চুন তৈরির কাঁচামাল শামুকের খোসা বর্ষাকালে মজুত রাখতে পারলে অপেক্ষাকৃত কম দামে ক্রয় করা যায় বলে ঐ খোসা দিয়ে বছর ভরে চুন তৈরি করতে পারলে চুন বিক্রি করে ভালোভাবে জীবন জীবিকা নির্বাহ করা যায়।

তথ্য সংগ্রহকারী : আপনারা সে ব্যবস্থা করছেন না কেন ?

তথ্য প্রদানকারী : পুঁজির অভাবে আমরা সে ব্যবস্থা করতে পারি না। এজন্য দিন দিন এ পেশা হারিয়ে যাচ্ছে। যদি সরকারিভাবে ঋণের ব্যবস্থা থাকতো, তা হলে চুন শিল্পকে রক্ষা করা যেত। ৫-১০ বছর আগেও এ গ্রামে ১৪-১৫টি কারখানা ছিল কিন্তু বর্তমানে এ সংখ্যা কমে ৬-৭-এ দাঁড়িয়েছে।

তথ্য সংগ্রহকারী : নড়াইলের কোথায় কোথায় চুন তৈরির কারখানা আছে বা ছিলো ?

তথ্য প্রদানকারী : আগে রতডাঙ্গা, ধোন্দা, ঘোড়াখালী, কলাগাছি, গাজিরহাট, কালিয়াসহ প্রায় ১০০টি কারখানা ছিলো কিন্তু প্রায় সবগুলি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং বর্তমানে ১৫-২০টি কারখানা আছে। পূর্বে প্রতিটা কারখানায় শ্রমিক, পরিবহণসহ বেশ কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হতো কিন্তু কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঐ মানুষগুলি বেকার হয়ে পড়েছে এবং তারা অন্য পেশার প্রতি ঝুঁকে যাচ্ছে। হয়তো অচিরেই এ শিল্প পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

তথ্য সংগ্রহকারী : চুন শিল্পের নানা বিষয় আমাকে জানাবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

তথ্য প্রদানকারী : আপনাকেও ধন্যবাদ।

আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে আমাদের দাবি চুনশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করলে আমরা বাঁচবো এবং চুনশিল্পও বেঁচে থাকবে।

www.pathagar.com

২. গাছি

বেশ আগে থেকেই নড়াইলের চিড়া ও খেজুর গুড়ের প্রসিদ্ধি আছে। যদিও বিশ বছর পূর্বের চেয়ে বর্তমানে খেজুর গাছ অনেক কম হয়েছে এবং আখও এলাকায় খুব বেশি চাষ হচ্ছে না সে কারণে আগের মতো গুড়ের রমরমা ভাব এখানে নেই। তবু এখন পর্যন্ত নড়াইলে যথেষ্ট খেজুরের গুড় পাওয়া যায়। খেজুরের গুড় তৈরি করার জন্য গাছিকে অনেকগুলি অবস্থা পার করতে হয়। এ বিষয় নিয়ে কথা হলো খেজুর গাছ কাটা গাছি মো. সাহিদুর রহমানের সাথে। সাক্ষাৎকারটি নিচে উদ্ধৃত করা হলো :

তথ্য সংগ্রহকারী : আপনার নাম কী ?

তথ্য প্রদানকারী : আমার নাম মো. সাহিদুর রহমান।

তথ্য সংগ্রহকারী : আপনার পিতামাতার নাম ও ঠিকানা কী?

তথ্য প্রদানকারী : আমার পিতার নাম : মৃত হোসেন সরদার, মাতার নাম : মৃত ভানু বিবি। গ্রাম : জুড়ালিয়া, ডাকঘর : শাহাবাদ, উপজেলা : নড়াইল সদর, জেলা : নড়াইল।

তথ্য সংগ্রহকারী : কতদিন যাবত আপনি খেজুর গাছ কাটেন এবং কীভাবে খেজুর গাছ কাটার প্রতি আপনার ভালোলাগা তৈরি হয়েছে ?

তথ্য প্রদানকারী : আমাদের নিজেদের অনেকগুলি খেজুর গাছ ছিলো যা থেকে প্রচুর পরিমাণ রস ও গুড় পাওয়া সম্ভব ছিলো। ফলে নিজেরাই কীভাবে রস ও গুড় পাওয়া যায় সে বিষয়ে চিন্তার পর আমার বড় ভাই মো. আতিয়ার রহমান নিজেই খেজুর গাছ হতে রস আহরণের উপায় নির্ধারণ করেন ও খেজুর গাছকাটা আরম্ভ করেন। ছোটবেলা হতে বড় ভাইয়ের সাথে রস সংগ্রহের কাজে সহায়তা দিতে দিতে আমিও ঐ কাজটির প্রতি অনুরক্ত হই এবং একসময় খেজুর গাছ কাটা শুরু করি—তাও প্রায় ২০-২৫ বছর আগে থেকে।

তথ্য সংগ্রহকারী : আপনি আমাকে জানান কীভাবে খেজুর গাছ হতে রস সংগ্রহ করেন এবং একটা সিজিনে কতদিন রস পাওয়া যায় ?

তথ্য প্রদানকারী : সাধারণত কার্তিক মাসে খেজুর গাছের ডগাগুলি ফেলে দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থাকে গাছ তোলা বলে। এরপর প্রায় ১০ দিন পর ঐ তোলা গাছের উপরের চামড়া সরিয়ে মসৃণ করা হয়—এটাকে চাচ দেওয়া বলে। চাচ দেওয়ার সাথেই বাঁশের তৈরি নলি (যেটা দিয়ে রস চুয়ে পড়ে) গাছে দিতে হয় এবং মাটির ভাড় (নড়াইলের স্থানীয় নাম ঠিলে) গাছে ঝুলিয়ে রস সংগ্রহ করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে ৭ দিন পর পর একটা গাছ পুনরায় কাটা হয়। কারণ ৭ দিনের আগে গাছ কাটলে রস ভালো হয় না বা গুড়ও পরিমাণ কম হয়। প্রতি সিজনে কার্তিক মাস হতে চৈত্র মাস পর্যন্ত খেজুর গাছ হতে রস সংগ্রহ করা যায়।

তথ্য সংগ্রহকারী : আপনারা রস দিয়ে কী করেন ?

তথ্য প্রদানকারী : নড়াইলে খেজুর রসের পায়েস খাওয়ার যথেষ্ট প্রচলন আছে। ফলে রস সঞ্চয়ের পর সাধারণত কাঁচা রস প্রতি ঠিলে ৫৫-৬০ টাকা দরে বিক্রি হয়ে যায়। অবশ্য অতিরিক্ত রস থাকলে তা দিয়ে গুড় এবং পাটালি তৈরি করা হয়।

www.pathagar.com

নড়াইলের গাছি

নড়াইলের চুনশিল্প

www.pathagar.com

তথ্য সংগ্রহকারী : গুড় বা পাটালি কীভাবে তৈরি করা হয়—আমাকে সে প্রক্রিয়াটি জানান।

তথ্য প্রদানকারী : রস প্রথমে মাটির পাত্রে বা টিনের পাত্রে আগুনে জ্বাল দেওয়া হয়। উত্তপ্ত হওয়ার এক পর্যায়ে সরিষা ফুলের রঙের ন্যায় বুড়বুড়ি উঠতে থাকে (এটাকে সরষে ফুলের অবস্থা বলে) এমন অবস্থার কিছুক্ষণ পরেই জ্বাল দেওয়া গুড়ে ফোঁট ওঠে যা গুড়ে ফোঁট নামে পরিচিত, এ সময় কাঠের তৈরি ফাওট বা ওড়ক দিয়ে গুড় নাড়াচাড়া করতে হয় এবং ঠিক এমন সময়ে যে পাত্রে রস জ্বালানো হয় সে পাত্রের একপাশে কাঠের তৈরি ঝাঙ্গি দিয়ে কিছু পরিমাণ গুড় এমনভাবে ঘষাঘষি করতে হয় যাতে ঐ গুড়টুকু ঝরঝরে হয়ে পাত্রের সব গুড়ের মাঝে পতিত হয়। তা না হলে পাত্রের গুড় কোনো অবস্থাতেই শুকাবেনা। যদি পাটালি তৈরি করার প্রয়োজন হয় তা হলে গুড় সরষে ফুলের মতো হওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ জ্বালাতে হবে এবং ঝাঙ্গি দিয়ে পাত্রের একপাশে ঘসে কিছু অংশ ঝরঝরে করার পর লম্বা কাপড়ের উপর ঢেলে রাখার পর শুকালে খণ্ড খণ্ড করে পাটালির আকার করতে হয়। গুড় নামানোর আগে নারকেলের কুঁচি এ গুড়ের মাঝে ঢেলে ভালোভাবে মিশ্রণ করে নামিয়ে কাপড়ের পর ঢেলে পাটালি করলে তা নারকেল পাটালি হয়।

তথ্য সংগ্রহকারী : গুড় বা পাটালি তৈরি করতে কোনো প্রকার মিশ্রণের প্রয়োজন আছে কী না?

তথ্য প্রদানকারী : ভালো মানের গুড়ে কোনো প্রকার মিশ্রণের প্রয়োজন হয় না। তবে কেউ কেউ শিমুল গাছের মূল শিকড়, হাইড্রোজ বা ফিটকিরি মিশ্রণ করে। এটা ভালো নয়। কারণ, ঐগুলি মিশ্রণ করলে গুড় বা পাটালির রং খানিকটা সাদা হয় কিন্তু স্বাদ ভালো হয় না।

তথ্য সংগ্রহকারী : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

তথ্য প্রদানকারী : আমিও দোয়া করি আপনি ভালো থাকুন।

৩. বাদ্যকর

বাঙালি জাতির ইতিহাস হাজার বছরের ইতিহাস। আর এই ইতিহাসের পাতা হাতড়ালে সর্বপ্রথম চোখে পড়ে আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। এখানকার মানুষ বহু পূর্ব থেকেই সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। দীনতা এখানকার মানুষকে কখনও ঘেঁষতে পারেনি। তাদের এই সুখ-শান্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটতো বিভিন্ন রকমের উৎসবের মধ্য দিয়ে। সামান্য কোনো উৎসবেও তারা ঢোল-ডগর পিটিয়ে আনন্দ ফুর্তিতে মুখরিত হয়ে উঠতো। যারা এই বিভিন্ন উৎসবাদিতে ঢোল-ডগর পিটিয়ে পরিবেশকে উৎসবমুখর করতো তাদেরকে বলা হয় বাদ্যকর। গানবাজনা, পূজা-অর্চনা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান এমনকি বিয়ে পর্যন্ত যেনো বাদ্যকরদের ছাড়া ভাবাই যেতো না। আর এরই রেশ ধরে আমাদের সমাজে গড়ে উঠেছিল বাদ্যকর সম্প্রদায়। এরা বাদ্য বাজনাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সমাজ পরিবর্তনের ধারায় আজ বাদ্যকর সম্প্রদায় হারিয়ে যেতে বসেছে। এখন আষাঢ় মাসে যেমন বৃষ্টি হয় না তেমনি কার্তিকেও নবান্ন হয় না। এভাবে অনেক উৎসবই

www.pathagar.com

আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। নামেমাত্র বাদ্যকর বাড়ি আছে, বাদ্যযন্ত্র নেই। এখন আর আগের মতো বিয়ে শাদিতে বাদক দলের ডাক পড়ে না। পূর্বে বরযাত্রীর আগে আগে বাদক দল বাদ্য বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যেতো। পরিবর্তিত সময়ের সাথে সাথে বেকার হয়ে পড়ছে আমাদের বাদক দল। বাধ্য হয়ে নেমে পড়েছে অন্য পেশায়। সম্প্রতি ২০ থেকে ২৫ বছর ধরে হিন্দু ঋষি সম্প্রদায়ের মানুষ বাদ্যকরদের জায়গাটি দখল করছে। বর্তমানে এ সম্প্রদায় বিয়ে, পূজাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাদ্য বাজিয়ে থাকে। এটাকে তারা অনেকটা উপপেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এর পাশাপাশি তারা বাঁশ-বেত শিল্প ও জুতা-স্যান্ডেল সেলাইয়ের কাজের সাথে জড়িত।

এখানে বাদ্যকর বলতে যারা বোঝায় তাদের স্থানীয়ভাবে বাজুন্দার বলে। এরা ইসলাম ধর্মের (সুন্নি) অনুসারী। এদের পৈতৃক পেশা হলো বিয়েসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাদ্য বাজানো। লোহাগড়া উপজেলায় আনুমানিক ৫০টি বাদ্যকর পরিবার রয়েছে।

তবে বর্তমানে অনেকেই এ পৈতৃক পেশা থেকে সরে এসে বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরি করছেন। যারা কমবেশি এ পেশার সাথে রয়েছেন তারা হলেন : কালু বিশ্বাস (৪৫), পিতার নাম : নগর বিশ্বাস, লোহাগড়া বাজার, লোহাগড়া পৌরসভা। ২০ বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কর্নেট বাজিয়ে থাকেন। এর পাশাপাশি তিনি ছোটখাট ব্যবসা করে থাকেন। জাফর আলী বিশ্বাস (৫৫) পিতার নাম : মো. আলী, লোহাগড়া, লোহাগড়া পৌরসভা, কর্নেট বাদক, ৩০ বছর ধরে এই পেশার সাথে রয়েছেন। খুচরা পান বিক্রির সাথে জড়িত। কালু শেখ (৪০), পিতার নাম : মনা শেখ, গ্রাম : ইতনা, ইতনা ইউনিয়ন, গাজির গীত পরিবেশন করেন এবং প্রেমজুড়ি বাজিয়ে থাকেন। হাসেম শেখ (৬০), পিতার নাম : সুরেন চৌকিদার ইতনা, ইতনা ইউনিয়ন, বাঁশি বাদক, ৪৭ বছর ধরে এ পেশার সাথে রয়েছেন। এছাড়া বাঁশ শিল্পের সাথে জড়িত। নাসির বাদ্যকর (৩৪) ও পলুন বাদ্যকর, পিতার নাম : ওমর বাদ্যকর, গ্রাম : ইতনা, ইতনা ইউনিয়ন, তারা ঢাক ও ঢোল বাজানোর পাশাপাশি বাঁশ-বেত শিল্পের সাথে জড়িত। মনি মিয়া (৪৫), পিতার নাম : বিমল বাদ্যকর, তিনি কৃষি কাজের সাথে জড়িত।

হিন্দু ঋষি সম্প্রদায়ের যারা বাদ্যযন্ত্র বাজানোর সাথে জড়িত তারা হলেন : নির্মল বিশ্বাস (৫০), রবি বিশ্বাস (৪৫), বিশ্বনাথ বিশ্বাস (৪২), স্বপন বিশ্বাস (৩৯), বিকাশ বিশ্বাস (৩৭) ও কৃষ্ণ নাথ বিশ্বাস (৩৪), পিতার নাম : মৃত সুধির বিশ্বাস, গোপিনাথপুর, লোহাগড়া পৌরসভা, এরা বাঁশি ও ক্লাইনেট বাজানোর পাশাপাশি বাঁশ-বেত ও জুতা সেলাইয়ের কাজের সাথে জড়িত। প্রমথ বিশ্বাস (৪৫) পিতার নাম : বিনোদ বিশ্বাস, লোহাগড়া বাজার, লোহাগড়া পৌরসভা। ২৫ বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঢোল বাজিয়ে থাকেন। এছাড়া তিনি খুচরা চাউলের ব্যবসা করেন। গোবিন্দ বিশ্বাস (৫৮), পিতার নাম : গুরুপদ বিশ্বাস, গ্রাম : গোপিনাথপুর, লোহাগড়া পৌরসভা, কর্নেট বাদক। এছাড়া বাঁশ-বেত শিল্পের সাথে জড়িত। সুমন বিশ্বাস (২৮), পিতার নাম : মৃত খগেন বিশ্বাস, গ্রাম : গোপিনাথপুর, লোহাগড়া পৌরসভা, ড্রাম ও ঢোলক বাদক। এছাড়া জুতা সেলাইয়ের কাজও করেন। সানাল বিশ্বাস (৫০), পিতার নাম : সুধির বিশ্বাস, লোহাগড়া বাজার, লোহাগড়া পৌরসভা, ঢোল ও কর্নেট বাদক, ২৫ বছর ধরে এই পেশার সাথে রয়েছেন। এছাড়া বাঁশ-বেত শিল্পের সাথে জড়িত।

www.pathagar.com

নিমাই বিশ্বাস (৪২), পিতার নাম : মনিন্দ্র বিশ্বাস, গোপিনাথপুর, লোহাগড়া পৌরসভা, ড্রাম বাদক। এছাড়া বাঁশ-বেত শিল্পের সাথে জড়িত। উজ্জ্বল বিশ্বাস (২৩), গোপিনাথপুর, লোহাগড়া পৌরসভা, ঢোল বাজনার পাশাপাশি জুতা সেলাইয়ের কাজ করেন। নির্মল বিশ্বাস (৫৫), পিতা : মৃত সুধির বিশ্বাস, বাঁশি ও ক্লাইনেট বাদক গোপিনাথপুর, লোহাগড়া পৌরসভা। জুতা সেলাই কাজের সাথে জড়িত।

গোবিন্দ বিশ্বাস (৪০), পিতা বাবুলাল বিশ্বাস, লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা, ঢুলি বাদক। বাঁশ শিল্পের সাথে যুক্ত। পরিতোষ বিশ্বাস (৩৫) ও পরিমল বিশ্বাস (৩০), পিতা : প্রমথ বিশ্বাস, লোহাগড়া, লোহাগড়া পৌরসভা, কর্নেট ও ক্লাইনেট বাদক। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সৌখিনভাবে যারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন যন্ত্র বাজিয়ে থাকেন তারা হলেন ননী গোপাল চক্রবর্তী (৫০) একজন তবলা বাদক, পিতা : নরেন চক্রবর্তী, গ্রাম : কুন্দশী, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা। নয়ন চক্রবর্তী (১৮), কলেজ ছাত্র, পিতা : ননী গোপাল চক্রবর্তী (৫০), গ্রাম : কুন্দশী, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা। তিনি তবলা বাজিয়ে থাকেন। আনন্দ দে (৪২), পিতা : মুকুন্দ দে, লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া উপজেলা, তবলা বাদক। বাণী চক্রবর্তী (৫৫), তবলা বাদক, পিতা : শম্ভু চক্রবর্তী, কুন্দশী, লোহাগড়া পৌরসভা, উপজেলা লোহাগড়া। সাইনবোর্ড লেখা পেশার সাথে যুক্ত। তরুণ সাহা (৪৫), পিতা : মৃত হরিপদ সাহা, খোল বাদক, মলিকপুর, মলিকপুর ইউনিয়ন। এছাড়া তিনি খুচরা চাউলের ব্যবসা করেন। গৌর সরকার (৩৫) পিতা : মৃত বাগান বিশ্বাস, খোল বাদক, কুন্দশী গ্রাম, ইতনা ইউনিয়ন, লোহাগড়া পৌরসভা। পানের ব্যবসার সাথে জড়িত। কৃষ্ণ মণ্ডল (৩২) ও অনিল মণ্ডল (৫০), পিতা : নিতাই গাছি তবলা ও আড়বাঁশি বাদক, লোহাগড়া পোদ্দারপাড়া, লোহাগড়া পৌরসভা। মুদি ব্যবসায়ী।[৩২]

নড়াইল সদর অঞ্চলে বাদ্যকর খুব বেশি দেখা যায় না। চণ্ডিবরপুর ইউনিয়নের রতডাঙ্গা গ্রামে এখনও পর্যন্ত ২৫-৩০ ঘর বাদ্যকর যাদের বংশীয় পদবি সরদার, খান, মোল্যা, বিশ্বাস ইত্যাদি। কিন্তু কারো কারো নাম শোনার পর মনে হয় না তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক। এ সম্প্রদায়ের প্রাচীন লোকগুলি কেউ এ পেশায় নেই। রতডাঙ্গা গ্রামের কালা মিয়া এলাকার নামকরা ক্লাইনেট বাঁশিওয়ালা, নগেন, হাজরা, হবি, কালু ইত্যাদি লোকযন্ত্র ব্যবহার করতো।

বর্তমান শুধু হবিবর রহমান হবি জীবিত আছে কিন্তু এ পেশায় নেই। রতডাঙ্গা গ্রামের একমাত্র আব্দুল মালেক এ পেশায় আছেন। পিতা পাগলা খাঁ, মাতা সুবাসী বেগম। ১৯৫৬ সালে আব্দুল মালেক রতডাঙ্গা গ্রামের জন্মগ্রহণ করেন। আব্দুল মালেক একজন বাঁশি বাদক, তিনি কর্নেট বাঁশি বাজিয়ে থাকেন। সিংগাশোলপুর ইউনিয়নের গোবরা গ্রামে এক সময় বাদ্যকর ছিল প্রচুর।

সময়ের বিবর্তনে পেশার পরিবর্তের জন্য তারা এদিক ওদিক ছুটে গেছে। ৩-৪ ঘর বাদ্যকর এখনও এখানে বসবাস করে। তবে গোবরা গ্রামে বর্তমান কেউ যন্ত্র বাজনার কাজে নিয়োজিত নেই। এক সময় গ্রামের ঈমানীর ঢোল কথা বলতো এমন প্রবাদ আছে। ঈমানী মারা গেছেন। জীবিতকালে ঢোলে তার চেয়ে বেশি শাস্ত্রীয় জ্ঞান এ অঞ্চলে আর কারো ছিল না। এ গ্রামের অমল বিশ্বাস এলাকার বিখ্যাত মোসলেম

www.pathagar.com

উদ্দিন বয়াতির সঙ্গে ক্লার্নেট বাঁশি বাজাতো এবং বিখ্যাত ক্লাইনেট ওয়ালা হিসেবে নাম ছিল। অতি সম্প্রতি তার মৃত্যু হয়েছে। বর্তমান সময়ে পৌরসভাধীন ভাটিয়া গ্রামে ২০-২৫ ঘর বাদ্যকর আছে। এ পেশায় যারা নিয়োজিত আছে তারা হলো অহিদ খাঁ, সাহিদ খাঁ, সাজিদ খাঁ, ওবায়দুর খান, হাজরা খাঁ, মুনজুর খাঁ, সাহেব আলী খাঁ, আবুল হোসেন মোল্যা, ইছাক সর্দার ইত্যাদি। প্রাচীন যারা এ পেশায় নামিদামি ছিলেন তারা হলো বেলায়েত সর্দার, ফকির উদ্দিন সর্দার, ইমান সর্দার, মোমিন সর্দার, মোমিন বাদ্যকর, যদন বাদ্যকর ইত্যাদি। অবশ্য বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এ অঞ্চলেও কামার, তাঁতি ছুতার ও লোকপেশাজীবীর ঐতিহ্যকে ধারণ করে এখনও টিকে আছেন।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

বিজ্ঞানের জয়রথে চড়ে আসা স্যাটেলাইটের এ যুগেও গ্রামগঞ্জ শহর-বন্দরে আজও লোকচিকিৎসার আনাগোনা দেখা যায়। ছেলেমেয়েদের জন্মলগ্নে শনির দৃষ্টি পড়েছে মনে হলে অর্থাৎ যদি দেখা যায় শিশুটি বেড়ে উঠতে দেরি হচ্ছে নানা সমস্যা– আজ এ ডাক্তার কাল ও ডাক্তার কিন্তু কাজে আসছে না; তখনই ফকির, হাফেজ সাহেব, যোগীবাবা, মাওলানা সাহেব ইত্যাদির তাবিজ বা লাল কালো সুতা পড়ায় মুশকিল আসান। বোলতা, মৌমাছি ইত্যাদি পোকায় কামড়ালে তাতে বিষক্রিয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিষক্রিয়া প্রশমিত করতে কেরোসিন তেল ব্যবহার করা হয়। বিচ্ছু জাতীয় পোকা শরীরে লাগলে চটের বস্তা দিয়ে ভালো করে ঘষামাজার পর চুন লাগিয়ে দেয়া হয়। মহিলাদের বাচ্চাগুলি যতদিন মায়ের দুধ খায় ততদিন মায়ের মধ্যে বাতাস লাগা এক ধরনের রোগের নাম গ্রামে প্রায়ই শোনা যায়। গ্রাম্য মহিলাদের অভিমত হলো মায়ের দুধে বাতাস লাগলে বাচ্চা ঐ দুধ পান করে তবে বাচ্চার পেটের পীড়া হয় এবং শরীর খারাপ হয়। মহিলাদের ধারণা কোনো প্রকার ঔষধি গুণে মায়ের দুধ বাতাস লাগা নিরাময় হয় না। এক মাত্র ঔষধ হলো পানি কিংবা ঘর পরিষ্কার করা পিছেপড়া। পিছে পানিতে ডুবিয়ে ঐ পানিতে দুধ ধুয়ে ফেলানো কিংবা সরাসরি পানিপড়া দিয়ে স্তন ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেললে দুধে বাতাসলাগা ভালো হয়ে যায়। অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার হলেও লোকচিকিৎসার প্রভাবে মানুষ উপকার পায় বলেই গ্রামীণ জনপদসহ প্রায় সর্বত্র লোকচিকিৎসা আছে। কুকুরে কামড়ালে মাটির পাত্রের চাড়াপড়ে কামড়ানো স্থানে লাগিয়ে রাখা হয় এবং সাত বাড়ি হতে লবণ চেয়ে এনে ঐ লবণ পড়ে খেতে হয়। এখানে সাত বাড়ি হতে লবণ চেয়ে আনা হলো সংস্কার। চোখ যদি খুব বেশি চুলকায় মানুষ বলে চোখে ক্ষুতক্ষুত পোকা লেগেছে। কোনো ঔষধে রোগ ভালো হয় না। কিন্তু ভোরবেলা কলাপাতা বিছিয়ে দূর্বাঘাস চোখে ঘষলে সাদা সাদা পোকা বেরিয়ে যায় এবং চোখের চুলকানো রোগ নিরাময় হয়ে যায়। দাঁতে যন্ত্রণা হলে ছোট ডাবের উপরি অংশ পানিতে সিদ্ধ করে ঐ পানিতে লবণ মিশ্রণ করে কুলকুচি করলে দাঁতের যন্ত্রণা উপশম হয়; কখনও কখনও আতাগাছের পাতার রস পানিতে সিদ্ধ করে সে পানিতে কুলকুচি করলে দাঁতের যন্ত্রণা উপশম হয়। রাতে শোয়ার কারণে ঘাড়ে ব্যথা হলে ঐ ব্যথা নিরাময়ে কোনো প্রকার ঔষধ লাগে না। বরং ঐ বালিশ রোদে শুকিয়ে রাতে ঘুমালে ব্যথা নিরাময় হয়। কারণ তুলোর সঙ্গে যে ওম থাকে আসলে সেজন্যই ব্যথার উপশম হয়। লোকচিকিৎসার ক্ষেত্রে কেবল তুকতাক কিংবা বাহ্যিক ব্যবহার্য কিছু উপাদান প্রয়োগ হয় তা নয়। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিরাজের ঔষধির ন্যায় সাধারণ মানুষ সেগুলি দেখে অভ্যস্ত কিংবা মুরব্বিদের কাছে শুনেছে সে গুলি ব্যবহারেও রোগ নিরাময় হয়। যেমন দাঁতে পোকা লাগলে শিষ আকন্দের গাছের

www.pathagar.com

শিকড় ভোরবেলা মুখ না ধুয়ে ঐ শিকড় দাঁতের পোকালাগা ক্ষতস্থানে ধরলে দাঁতের পোকা বের হয়ে যায় এবং যন্ত্রণার উপশম হয়। পাতলা পায়খানা হলে বিশেষ করে বাচ্চাদের পাতলা পায়খানা হলে কাগুজে লেবুর পাতার রস সকালে বিকেলে হালকা লবণ মিশ্রনে খাওয়ালে লুজ মোশান বন্ধ হয়ে যায়। কারো ধ্বজভঙ্গ হলে ছাগলের দুধের কাঁচাদধিসহ প্রতিদিন ভোর বেলা কালক্ষুৎকে-সুৎকে পাতার রস গোছল করার পর ১৫-২০ দিন সেবন করলে যৌন অক্ষমতা দূর হয় এবং একজন পুরুষ পুনরায় স্বাভাবিক বলবান হয়। মহিলাদের মাসিক রক্তস্রাবে গড়মিল অর্থাৎ অনিয়মিত হলে সাধারণত পানিপড়া খেলে ভালো হয়ে যায়।

এমনি করে হাজার রকমের লোকচিকিৎসা গ্রামেগঞ্জে প্রচলিত আছে। মানুষের আস্থাহীনতার জন্য নতুন নতুন বিষয়ে তাৎক্ষণিক বিশ্বাস জন্মে বলেই তুকতাক লোকচিকিৎসার ইত্যাদির প্রচলন এখনও দেখা যায়।[১]

কবিরাজি চিকিৎসা

এ অঞ্চলের মানুষ এখনও তাবিজ-কোবজ, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, গাছগাছড়া, তেল, হলুদ, সুতা, পানি পড়া, তন্ত্রেমন্ত্রে বিশ্বাস করে। মানুষের ঘাড়ে কথিত জিন-পরী আছর করলে ভুক্তভোগী পরিবার জিন-পরীর আছর ছাড়াতে গ্রামের ফকির, কবিরাজদের ওপর নির্ভর করে থাকেন। দিঘলিয়া গ্রামের কবিরাজ আবুল হোসেন (৬০), একই গ্রামের রব্বানী হুজুর, আকরাবাড়ির ফকির শিবনাথ বাইন (৫০), জয়পুর ইউনিনের কৃষ্ণপুর গ্রামের পাগল বালা, রমেশ সমাদ্দার (৪৬), কাশিপুর ইউনিয়নের চালিঘাট গ্রামের মাস্টার বলরাম বিশ্বাসসহ (৬৫) অনেকেই এসব চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। এছাড়া কাশিপুর ইউনিয়নের খোকন ডাক্তার (৬০) একজন সাপের ওঝা। তিনি সাপে কাটা রুগীদের চিকিৎসার পাশাপাশি কবিরাজিও করেন। এসব লোকচিকিৎসায় হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে কবিরাজ ফকিরদের স্মরণাপন্ন হয়। নলদি ইউনিয়নের মেম্বর লক্ষ্মী রানি বিশ্বাস (৫৫) একজন সফল ওঝা। এলাকায় তার ভীষণ সুনাম। অনেকের প্রাণ রক্ষা করেছেন। ওঝার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন রোগের জন্য তাবিজ, বিভিন্ন পড়া দিয়ে থাকেন। ইতনা ইউনিয়নের ইতনা গ্রামের কবিরাজ কাওসার মুন্সি (৭০) পৈতৃকসূত্রে কবিরাজি করেন। তিনি মানুষের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি, বিপদ-আপদে গাছগাছড়া ও ঝাড়ফুঁক দিয়ে থাকেন। লোহাগড়া এলাকার অনিল মণ্ডল (৪২) কবিরাজ ও সাপের ওঝা। মলিকপুর ইউনিয়নের কুন্দশী গ্রামের লাহু শেখ (৪৫) কথিত জিন-পরীর আছর ছাড়ান। একই গ্রামের কালিদাস বিশ্বাস (৭০) কালির সাধনা করেন এবং বিভিন্ন সমস্যা ও ব্যধিতে ঝাড়ফুঁক দিয়ে থাকেন। একই গ্রামের হেমায়েত শেখ (৩৫) কবিরাজি করে থাকেন। নলদি বাজারের পার্শ্বে এক পির আউলিয়ার দরগাহ রয়েছে। নলদি অঞ্চলের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এই দরগাহের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে থাকে। জনশ্রুতি ও বিশ্বাস রয়েছে কারো বাড়িতে উইপোকার উপদ্রব হলে এই দরগাহর এক টুকরো ইট নিয়ে বাড়ির সীমানায় পুঁতে রাখলে উইপোকার উপদ্রব বন্ধ হয়ে যায় এবং কাজ হলে আবার টুকরোটি দরগাতে ফেরত রেখে আসতে হয়।

www.pathagar.com

লোহাগড়া পৌরসভার কৃষ্ণপুর গ্রামের কবিরাজ রমেশ সমাদ্দার (৪৬) এসব চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো অর্থ নেন না। তার কাছে প্রতিদিনই শনি ও মঙ্গলবারে সকাল থেকে দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য হিন্দু, মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ নির্বিশেষে চিকিৎসা নিতে আসেন। বেশি আসে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। তিনি চিকিৎসা শুরু করেন এভাবে : যে চিকিৎসা নিতে আসে তার নাম প্রথমে উচ্চারণ করে পূর্বদিকে মুখ করে বসে গাছটি তোলেন। তারপর বলেন :

সত্য যুগে ধর্মের গাছ তুমি ওঠ,
তোমাকে যে কাজে খাটাই
তুমি সেই কাজে খাইট।
এরপর মন্ত্র পড়ে আনুষঙ্গিক আরও কিছু ক্রিয়া করে চিকিৎসা দেন।[২]

খ. তন্ত্রমন্ত্র

গ্রাম সমাজে বিভিন্ন কাজকর্মে এখনও কিছুটা হলেও তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন : যে কোনো রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে, কেউ কোনো সমস্যায় পড়লে বা সাপে কাটা রোগীকে ভালো করতে, কারো অনিষ্ট করতে বাড়ির বিভিন্ন কর্নারে তাবিজ পুঁতে রাখা, গ্রাম্য ভাষায় বান মারা, কাউকে তাবিজ-কোবজে তন্ত্রমন্ত্রের ব্যবহার শোনা যায়। আবার বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানেও তন্ত্রমন্ত্রের কথা শোনা যায়। যেমন : প্রতি বছর চৈত্রসংক্রান্তির শেষ দিন সন্ন্যাসীদের নানারকম শারীরিক কসরত চলে আসছে সুদীর্ঘকাল ধরে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে খেজুর গাছে উঠে খেজুর সন্ন্যাসী, আগুন সন্ন্যাসী, কাঁটা বিছিয়ে তাঁর উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এগুলো করে যে সন্ন্যাসীর গায়ে আগুন বা কাঁটার আঁচড় না লাগে তাঁরাই খাঁটি সন্ন্যাসী বলে বিবেচিত হবে। কথিত রয়েছে, তন্ত্রমন্ত্র পড়ে একটি খেজুর গাছে পূজা দেওয়া হয় (যে গাছ থেকে কোনো দিন খেজুরের রস সংগ্রহ করা হয়নি সেই ধরনের গাছ) পরে সন্ন্যাসীরা ঐ গাছে ওঠেন এবং গাছের মাথায় উঠে বিষাক্ত কাঁটার ওপর দিয়ে নৃত্য করে ঘুরে ঘুরে গাছকে লন্ডভন্ড করেন এবং খেজুর ভাঙ্গেন। সেই খেজুর গাছের নিচে দণ্ডায়মান ভক্তরা খেয়ে থাকেন পুণ্যের আশায়।

লোহাগড়ার জয়পুর ইউনিয়নে, নওয়াগ্রাম ইউনিয়নের রায়গ্রামে একসময় প্রতি বছর খেজুর সন্ন্যাসী হতো। বর্তমানেও কমবেশি হয়। চৈত্রসংক্রান্তিতে মাসের শেষ দিনে হিন্দু নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিভিন্ন গ্রামে আগুন সন্ন্যাসী করে।

যেখানে আগুন সন্ন্যাসী করে সে জায়গায় কিছু নিম অথবা বেলের কাঠে আগুন দেওয়া হয়। আগুন নেভার একপর্যায়ে কয়লা যখন লাল টকটকে হয়ে যায় তখন এই কয়লায় মন্ত্র পড়ে ধূপ দেয় এবং আগুনের কয়লাগুলি উঠানে মেলে দিয়ে এর ওপর সবাই হেঁটে বেড়ায়। এ অবস্থায় কারো পায়ে আগুন স্পর্শ করবে না বলে সবার বিশ্বাস থাকে। এটাকেই আগুন সন্ন্যাসী বলে। লোহাগড়া পৌরসভার মোচড়া এলাকার সাংবাদিক অমল দত্ত (৫৫), একই পৌরসভার সর্দার পাড়ায় পরেশ কর্মকারের বাড়িতে এই আগুন সন্ন্যাসী হয়ে থাকে। এছাড়া লোহাগড়ার কালনা গ্রামের ঠাকুর বাড়ি ও লোহাগড়ার কাড়াল পাড়ায় এ আগুন সন্ন্যাসী হয়।[৩]

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. আবদুস সামাদ বাউল, তারাপুর, নড়াইল, তারিখ : ১৯.০১.১২

২. রমেশ সমাদ্দার (৪৬) পেশা : কীর্তন গায়ক, কৃষ্ণপুর গ্রাম, লোহাগড়া পৌরসভা, তারিখ : ০২.০২.১২, লক্ষ্মী রানি বিশ্বাস (৫৫), ৩নং ওয়ার্ড মেম্বর, নলদি ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ০৩১.০১.১২ । কবিরাজ কাওসার মুন্সি (৭০), ইতনা গ্রাম, ইতনা ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ০৩.০২.১২

৩. জাফর খাঁ (৫০), গোপিনাথপুর গ্রাম, লক্ষ্মীপাশা পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা। তারিখ ১০.০২.১২ । সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শিক্ষক, মিতালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, লোহাগড়া, (৫০), সাংবাদিক অমল দত্ত (৫৫), মোচড়া, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ২০.০১.১২

www.pathagar.com

ধাঁধা/হেয়ালি ও শ্লোক

লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ধাঁধা এখনও লোকসমাজে প্রচলিত। প্রাচীনকালে ধাঁধা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে জীবন আচারে ব্যবহৃত হতো। ধাঁধার মধ্যে পাওয়া যায় বুদ্ধির অনুশীলন এবং মানুষিক ক্রীড়া। ধাঁধায় প্রয়োজন হয় জিজ্ঞাসাকারী ও উত্তরদাতার। বিয়ের আসরে এখনও ধাঁধা বা হেঁয়ালি বা শ্লোক পরিবেশিত হয়।

ধাঁধা

১. যারে আমি আনতি গিলাম
তারে দেহে ফিরে এলাম
সে যখন চলে গেল
তারে নিয়ে চলে এলাম।
অর্থ : বৃষ্টির পানি।

২. আলির ধারে দুটি ভাই
কারোর সাথে কারো দেখা নাই।
অর্থ : দুটি চোখ।[১]

৩. হাত আছে তার মাথা নাই
পেট আছে তার ভূড়ি নাই
চক্ষু কর্ণ নাসিকা নাই।
অর্থ : শার্ট বা জামা।

৪. সকালে চার পা
দুপুরে দুই পা
বিকেলে তিন পা
রাতে চার পা।
অর্থ : মানুষের চার কাল ।[২]

৫. নোলদে পাখি।
অর্থ : জমির মাপ (স্থানীয়)

৬. সবুজ বুড়ি হাটে যায়
হাটে গিয়ে চিমটি খায়
উত্তর : লাউ।

৭. তিন অক্ষরে নাম যার পানিতে ভেসে চলে
মাঝের অক্ষর কেটে দিলে আকাশে উড়ে চলে।

www.pathagar.com

উত্তর : চিতল মাছ ও চিল পাখি।[৩]

হেয়ালি

১. হাসতি হাসতি গেলো নারী–পর পুরুষের কাছে
দিয়ার সময় উড়ামুড়া–মধ্যি গেলে হাসে। —চুড়ি।
যুবতীর হাতে কাচের চুড়ি পরতে গেলে সাধারণত চুরি বিক্রেতা ফেরিওয়ালার কাছে যেতে হয় এবং চুড়ি পরানোকে কেন্দ্র করেই শ্লোকের কথা।

২. ছয় পায়ে আসে–চার পায়ে বসে–দুই পা ঘসে। —মাছি।

৩. চার পায়ে বসতে পারে–আট পায়ে চলে,
বাঘও নয় কুমিরও নয়–আস্ত মানুষ গেলে। —পালকি।

৪. চালালী চলে না, না চালালী চলে। —কেন্নো পোকা।

৫. শুতি গিলি দিতি হয়, না দিলি ক্ষতি হয়। —দরজা।

৬. হয়নি বা হবে না দেখিনি কোনো কালে,
কথায় কথায় সকল মানুষ তবু নামটি বলে। —ঘোড়ার ডিম।

৭. নতুন কাপড় হাতে নিয়ে দুই রমণী চলে,
সম্পর্কে কি, কাপড় কত- যে পার দাও বলে। —দুই সতীন।

৮. দুই ঠাং ধরে- মধ্যি দিলাম ভরে,
দিলাম এক ঠাসা- পুরলো মনের আশা। —যাতি ও সুপারি।

৯. দুই পাশেতে ঢাল- মধ্যিখানে খাল,
সেথায় দেখি লাল, যা ভাবছ তা নয়- মধ্যি খানে রয়॥ —সিঁথির সিঁদুর।

১০. হাত আছে তার পাও নাই, গলা আছে মাথা নাই। —জামা বা শার্ট ।

১১. চোখে চোখে রাখে সব পুরুষ রমণী,
সকলের শেষে মোর আছেন জননী। —চশমা।

১২. ষোলো কুড়ি- তিনটে হাঁড়ি- ভাগ করে দাও তাড়াতাড়ি। —১৯ ভাগ ১৭টা করে।

১৩. রাতে আসে রাতে যায়, মানুষ, গরু, বাঘও খায়। —মশা।

১৪. দিলি ফাঁক করে, না দিলি রাগ করে। —ভিক্ষুক ও ভিক্ষার থলি ।

১৫. কায়েস্ত-র য়েস্ত বাদে, পাঠা-র বাদে পা,
লবঙ্গ-র বঙ্গ বাদে- কিনে আনো তা। —কাঁঠাল।

১৬. পুরুষ লোকের ধড়ে, শীতকালে যায় ছোট হয়ে-
গরম পালি বাড়ে। —অণ্ড কোষ।[৪]

শ্লোক

[শ্লোক গ্রামে সুমিস্যে নামে পরিচিত।]

১

ও বুলু বুলু
তোর বোলে বিয়ে

www.pathagar.com

গায় হলদি দিয়ে
এ কয় ও কয়
আমি কলি দোষ অয়

অর্থ : কয়-বলে, অয়-হয়। এই ছড়া সাধারণত কারও সাথে দুষ্টুমি করার জন্য বলা হয়।

২

আমার নাম তাল পাখা
বাতাস আমার মধু মাখা
শীতকালে দেয় না দেখা
গরমকালের পরম সখা।[৫]

৩

বুড়োরে করব গুড়ো
জুয়নে ধরব দাড়ি
গুড়োর সাথে পারি কিনা পারি।

অর্থ-বুড়োরে-বৃদ্ধকে, জুয়নে-যুবক, গুড়ো-শিশু। শীত বলছে যারা বয়স্ক তাদের কাহিল করবো। যুবকদের চেষ্টা করবে এবং ছোটদের সাথে পারতেও পারি নাও পারি।

৪

তিন টাহা কামাই করলাম
চোদ্দ সিয়ে খাইয়ে
গাজির গীত গাইয়ে।

অর্থ : তিনটাহা-তিন-টাকা, কামাই-আয় করা, চোদ্দ সিয়ে-সাড়ে তিন টাকা, গাইয়ে-গেয়ে, খাইয়ে-খেয়ে। সাধারণত কোনো কাজে কেউ ঠকে গেলে বা প্রতারিত হলে এ শ্লোকটি বলে।

৫

বন্ধু কাইলও আইস
অর্থ : অযৌক্তিক দাবি।

ছন্দ

১

কোকিল ডিম পাড়ে কাকেরই বাসায়
আমি শুধু চেয়ে থাকি তোমারই আশায়।

২

আজ যার পরিণতি কাল তার ইতি
ফোটা ফুল ঝরে যায় দুনিয়ার রীতি।

উপরের ছন্দগুলি গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন কাপড়ের বোনা হাতপাখা ও কাপড় দিয়ে কার্পেট তৈরি করে দেওয়ালে বাঁধাই করে রাখার রেওয়াজ ছিল। গ্রামের এই ঐতিহ্যটি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. শীতল চক্রবর্তী (৫০), লোহাগড়া কলেজপাড়া, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ২৩.০১.১২
২. নজরুল ইসলাম (৬০), কুন্দশী, মলিকপুর ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ২৩.০১.১২
৩. ডলি বেগম (৩৭), মঠবাড়ি, দেবী সরশুনা, নওয়াগ্রাম ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ০৫.০২.১২
৪. আনজুমান আরা লাভলী, তারাপুর, নড়াইল, তারিখ : ১৮.১০.১১
৫. নজরুল ইসলাম (৬০), কুন্দশী, মলিকপুর ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা : তারিখ : ২৩.০১.১২

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

লোকসংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়ের মতো প্রবাদ-প্রবচনও একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্যবহারিক প্রয়োজনেই সাধারণ মানুষ প্রবাদ-প্রবচন প্রয়োগ করে থাকেন। প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যেই মানব জীবনের বাস্তব ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে। প্রবাদ-প্রবচনে থাকে রূপক ও অলংকার। যা গভীরভাবে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা হতেই প্রবাদের উৎপত্তি। এক একটি প্রবাদ অনেকখানি অভিজ্ঞতার নির্যাস।

সংগৃহীত প্রবাদ-প্রবচন

১. অত গুড়ি (পরিমাণজ্ঞাপক) আইচ্ছোর না। (ইচ্ছে করলেই সব করা যায় না)
২. আগলা পায় চিনে মলে না। (অসতর্ক না থাকা)
৩. আবে ঢং নরে চিৎপটাং। (অকর্মণ্য রমণী)
৪. আপন শালা ভাত পায় না ভাই বাড়ার বাল। (স্বার্থপর অর্থলোভী)
৫. আমও গেলো ছালাও গেলো। (বেশি চাইলে কিছু পাওয়া যায় না)
৬. বোলে আমার প্যাটের ছাও, আমারে খাতি দাও। (মুরব্বিদের সামনে শিশু কিশোরের অসামঞ্জস্য কথার ক্ষেত্রে)
৭. আলো চাল দেখলি ভেড়ার মুখ চুলোয়। (লোভী মানুষ যা পায় তাই গ্রহণ করে)
৮. আহেনা, আম্বলে না, বিয়েই তামুক খায়ে যাও। (স্বার্থের খাতিরে অযাচিত আপ্যায়ন।)
৯. উট্টিতি জোর নেই - কুট্টিতি জোর আছে। (কর্মহীন মানুষ অর্থহীন কথা বলে)
১০. এমনি যায় না ত্যানা জড়ায়। (ক্ষমতার চেয়ে বেশি বোঝা চাপিয়ে দেয়া)
১১. ওজু কুলুকুলু নামাজ ফকাফক। (লোক দেখানো ধর্ম পালন)
১২. কপালের যদি মারে গুদ-এক সের চালি তিন পোয়া খুদ। (বিপদের সময় ধৈর্য্যহারার বক্তব্য)
১৩. কাঙ্গালের কথা বাসি হলি ফলে। (সাধারণ লোকের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ হলে গ্রহণ করা উচিৎ)
১৪. কাচির ধার আছাড়ে গেছে। (অযোগ্য সম্মান পেলে– সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত)
১৫. কাজ করার কেউ না যাও খাওয়ার গাইড়ে। (অকর্মণ্য কিন্তু সুযোগ গ্রহণকারী)
১৬. কাজ শ্যাষ হয়ে গিলি বাড়ই (কর্মকার) বাড়ার বাল। (স্বার্থপরের ন্যায় কার্যসিদ্ধি শেষে কর্মীকে অবহেলা করা অর্থে ব্যবহৃত)

www.pathagar.com

১৭. কাপড় নেই চোপড় নেই হাঁটু সুমান হোল। (যার যেটা সাজে না তার নেই কর্ম করা)
১৮. কানার আবার রাতদিন। (সমাজে গ্রহণযোগ্যতাহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে)
১৯. কাজের কেউ না অকাজের মাইসো। (অকারণ সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে)
২০. কাশ দিয়ে পাদ (বায়ু) ঢাকা। (ভণিতা করে সত্যকে অস্বীকার)
২১. কিডা (কে) কইছে কি পান্থা ভাতে ঘি (অসামঞ্জস্য বিষয়)
২২. কুঁড়ে গরুর আঠালীর সার। (অকর্মণ্য কিন্তু কথার ক্ষেত্রে বড় মিয়া)
২৩. খায় দায় জব্বারে মোটা হয় চাঁনমিয়া। (অন্যকে কাজে লাগিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার)
২৪. খাদুমি কিছু না বুচনোয় পাঙ্গাস। (সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে)
২৫. গরিব মানসের সুন্দরী বউ গ্রামের সকলের (সবাই) ভাবী। (দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার)
২৬. কুত্তার ল্যাজে ত্যাল মাহালী সুজা হয় না। (স্বভাবের দোষ ত্যাগ করা যায় না)
২৭. কুতে হাগে না প্যাট খালি হয়ে যাবে। (কৃপণ স্বভাব বুঝাতে)
২৮. গাইন দেখতি অভক্তি গান শোনাবে কি? (চেহারা দেখে জ্ঞানের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না)
২৯. গা-গতরে (শরীর) গোস্ত নেই হোলডা পাঁচ স্যার (যে যা পারে না তা করার চেষ্টা)
৩০. গাছে নাই উঠতি এই কাইন (কাঁধি)। (কাজের আগেই ফলের আশা)
৩১. গিরেস্তো ভাত পায় না কুপুর (কুকুর) কয় বারেন্দায় শোবো। (অনাহূত ঝামেলা বোঝাতে)
৩২. গুদ (পায়ুপথ) মাইরে নমস্কার। (ক্ষতি করে অযথা সান্ত্বনা প্রদান)
৩৩. গুদমারানি পাইছো কোন্ জাগায়। (বেহিসাবি কাজের প্রতিবাদ)
৩৪. গুদি (পায়ুপথ) বাঁশ হাতে হ্যারিকেন। (অসতর্কতার জন্য বড় ক্ষতি হয়)
৩৫. গুয়োয় রং নেই ছোবলায় রং। (বিষয়বস্তুহীন অনর্থক কাজ)
৩৬. ঘন কথা যার চুপো আম তার (কর্মহীন বক্তব্য অসার)
৩৭. ঘি মাখন দিলিও কুত্তায় ঘু খায় (স্বভাবের পরিবর্তন কঠিন)
৩৮. চাচা খায় আচায় পানি ঘটি আছে তিন বাড়া (সম্পদহীনের ধনীর ন্যায় আচরণ)
৩৯. চাচির ছালুনে জাগায় জাগায় ঝাল। (ব্যক্তি স্বার্থপরের চতুরতা)
৪০. চাটামে কাটাম ফাঁটে দিতি না হাতে ওঠে। (গল্পে আছে বাস্তবে নেই)
৪১. চাল ডাল তোমার ম্যাজবানি আমার। (অপরের সুনামকে নিজের করতে চাওয়া)
৪২. চিনা বাওনের (বামুন) পৈতে লাগে না। (গুণির সমাদর সর্বত্র)
৪৩. চুনা (ছোট মারবেল) দিয়ে ড্যাগা বাধানু। (স্বার্থ হাসিলের কূটকৌশল)
৪৪. চোরের মন পুলিশ পুলিশ। (অপরাধীর আচরণে অপরাধ প্রমাণিত)
৪৫. ছাই ফেলতি ভাঙ্গা কুলোও লাগে। (কাউকেই অবহেলা করা উচিত নয়)
৪৬. ছাও কুপুরদে (কুকুর) ঘু খাইয়ে না। (সঠিক কাজ সঠিকভাবে করা উচিত)

www.pathagar.com

৪৭. ছুচতি (পানি খরচ) আঙ্গুল গুদি (পায়ুপথ) গেছে। (অন্যকে ঝামেলায় ফেললে নিজের ক্ষতি হয়)

৪৮. মানুষ আবানে (অভাবে) ভাগ্নে পোষে, জমি আবানে উঠান চলে। (বেহিসেবি সিদ্ধান্ত গ্রহণ উচিত নয়)

৪৯. জাইলের (জেলে) কামে কুষ্টা কাটা না। (সকলের দ্বারা সবকিছু হয় না)

৫০. জানে না তিরিখিরি করতি চায় মৌরিগিরি। (যে যা পারে তার সেটাই করা শ্রেয়)

৫১. জানের ক্ষয়, মানের ক্ষয়, আরো মাগি পয়সা চায়। (উপকার করলে প্রতিদানে কষ্ট বাড়ে)

৫২. জুতা মাইরে গরু দান। (অপমান করে সান্ত্বনা প্রদান)।

৫৩. জ্বরে কি অরে ফিলেইতি (লিভার) গাইড় মারে। (মূল বিষয়ের চেয়ে অলংকার মূল্যবান হলে ক্ষতি হয়)

৫৪. জ্বালার জ্বালায় বাঁচিনে মার পিঠি দুই ছুয়াল। (অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে)।

৫৫. ঝাঝোরি সুজরে কয় তোর গুদি এক ফুটো। (ঘৃণিত অপরাধীর সাধারণ দোষের বিচার করতে গেলে)

৫৬. হোলের বিচিরও জুড়া ঝুনো নারকেলেরও জোড়া। (যোগ্যতা-অযোগ্যতা প্রমাণ করতে)

৫৭. ঝোলের (তরকারি) লাউ অম্বলের (টক) কদু (দুষ্ট চরিত্র বোঝাতে)

৫৮. টাহা দিয়ে মারবো গুদ কিসির বালের বুনপুত। (স্বার্থবাদীর মানবিক সম্পর্ক নেই)

৫৯. টাকা নেই পয়সা নেই বন্ধু কাইলও আইসো। (না বুঝে জ্ঞানীর ন্যায় আচরণ)

৬০. ঠেলার নাম বাবাজি। (বিপদ বুঝাতে)

৬১. ডহের কাঁঠাল রসেও ভালো। (সুন্দর দেখতে সকলে ভালোবাসে)

৬২. ডিম পাড়ে মুরগিতি খায় দারোগা বাবু। (সুবিধাভোগীর চরিত্র বোঝাতে)

৬৩. ঢেঁকি স্বর্গে গিলিও ভারা ধানে। (সাধারণের কষ্ট বোঝাতে)

৬৪. তালতলায় বিয়েইছে গাই, সে সম্বন্ধে খালাত ভাই। (সুবিধাভোগীর কৌশল প্রয়োগ বোঝাতে)

৬৫. তিন টাহায় চাড়াল চৌধুরী। (বেহিসাবি যা খুশি করতে পারে)

৬৬. তিনদিনের বৈরেগী - ভাতেরে কয় অন্ন। (যার যেটা সাজে না তার সেটা করা)

৬৭. ত্যাল ঠাপায় না খেল বারো আনা। (মূল্যহীনকে বেশি মূল্য দিলে সেক্ষেত্রে)

৬৮. দাঁতালের (ভয়ংকর) কাছে আয়তাল কুরসি। (লোভী ধর্মকথা মানে না)

৬৯. দাড়ি কাইটে রাহে মোচ - তারে কয় বাওছোচ। (সমাজে সুন্দর হতে সামাজিক বিধি মানতে হয়)

৭০. দায় ঠেকলি ছুচোয়ও নামাজ পড়ে। (বিপদে ভালোমানুষি দেখানো)

৭১. দায়ে ধার নেই আছাড়ে জুত আছে। (আসল কাজে অমনোযোগী–কিন্তু অর্থহীন কাজে অগ্রসর)

www.pathagar.com

৭২. দ্যাট টাহার কুড়ো গেলো গেলো শিয়েলের মনতো বুঝা গেল। (বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক প্রমাণে)

৭৩. ধান খায়া কই যাচ্ছে কুহানে। (লোভীকে বশে আনা সহজ)

৭৪. ভাত ছিটেলী - কাইওর অভাব হয় না। (অর্থের দম্ভ প্রকাশ করতে বলা হয়)

৭৫. ধীরে রাইন্ধে সুইস্তে খাও জুড়ালী তার আশ্বাদ পাও। (সুচিন্তিত মতামত সঠিক হয়)

৭৬. নতুন সাওই (নারীর গুপ্তাঙ্গ) বাল গজাইছে চেরন কিনে দে। (অযোগ্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিলে ক্ষতি হয়)

৭৭. খানকি বুড়ো হলি পাঠা পোষে। (দুষ্টলোক খারাপ কাজ বোঝাতে)

৭৮. আমার শীল আমার নুড়া - ভাংতি চাস আমার দাঁতের গুড়া। (উপকারীর ক্ষতির চেষ্টা)

৭৯. ইজ্জেত যায় না ধুলি (পরিষ্কার) খাসলেত (স্বভাব) যায় না মলি। (সম্ভব হানি কঠিন এবং স্বভাব পরিবর্তন আরও কঠিন)

৮০. দাদা ছেলো দাঁড়ায়ে - সে দেলো বাড়াইয়ে। (অনাহূত ভাবে তৈলমর্দনকারী)

৮১. না পাতি, নাতি ভাতার (স্বামী) (অপরিণামদর্শী সম্পর্ক)

৮২. প্যাটে ভাত নেই মাজায় ঝিল্লে। (অসম কার্যকলাপ)

৮৩. পান্তা দাঁত নিয়ে গাজিরহাট আইসে না। (যে যা পারে না তার সেটা করতে যাওয়া)

৮৪. পাছায় কাপড় নেই মাথায় ঘুমটা। (বকধার্মিক)

৮৫. ফোটে না চড়াৎ করে। (শূন্য কলস বাজে বেশি)

৮৬. ফোটেনারে মিয়াভাই ঘটে আর বারুদ নাই। (যে যা পারে না তা করতে চাওয়া)

৮৭. বন্দির বড়ি খাইয়ে মরা ভালো। (সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা উচিত)

৮৮. বাঁশের চাইয়ে কুঞ্চি মোটা। (তোষামোদি পারিষদগণ ঝামেলা বাড়ায়)

৮৯. বাগের খাবার জ্বর গতরে খাবো। (স্বার্থপর নিজের কথা ভাবে)

৯০. বাড়িওয়ালার বাড়ি না-ফাজিলওয়ালার বাড়ি। (মালিকের চেয়ে কর্মচারীর বাড়াবাড়ি বেশি)

৯১. বান্দির গলায় চান্দি সোনা। (যাকে যেটা শোভা পায় না তার সেটা করা)

৯২. বাবা কও চাচা কও ক্যালা এট্টা এক টাহা। (মোসাহেবি করে সৎলোকের সিদ্ধান্ত পাল্টানো যায় না।

৯৩. বারেন্দার খোঁজ নেই তার আবার ফোঁইটে চালা। (প্রাপ্য বস্তুর চেয়ে ফ্রি বস্তুর আকর্ষণ বেশি)

৯৪. বারো হাত কদুর (লাউ) মধ্যি তেরো হাত বিচি। (অন্যায় আচরণকারী ক্ষমতাবান বোঝাতে)

৯৫. বাহাত্তর বছরের আগে জ্বালে সাবালক হয় না। (সহজ-সরল মানুষের বোকামি বোঝাতে)

www.pathagar.com

৯৬. বিটা মানুষ আবার খালু। (চরিত্রহীনকে নির্দেশ করা)

৯৭. ভাত খাতি খাতি চিড়ের নুচ অইছে। (অসম্ভব বিষয়ের চাহিদা)

৯৮. ভারানীর (যে ধান মাড়ায় করে) শাকে আদা। (অবাস্তব নির্দেশ করা)

৯৯. মাইয়ে নাং করুক দেখতি হবে স্বভাব। (শক্তিশালী সমাজপতির দোষ ঢাকা)

১০০. মাচা নেই তার বুধবার। (কপর্দকশূন্য বেশি পাঁয়তারা করে)

১০১. যার বাপ যাইনি গাজিরহাটে সে যাতি চায় ফুলতলা। (যার যেটা সাজে না তাই করতে চাওয়া)

১০২. যার বাপের সাথে কথা কইনে তার ছুয়াল (পুত্র সন্তান) কয় তাওই তামুক খাইয়ে যাও। (অযোগ্য সমাজপতির কর্ম বোঝাতে)

১০৩. যত ডাহে (হাকডাক) অত ডহে না (বর্ষে না) (অকর্মণ্য অনর্থক কথা বলে)

১০৪. যার ভুইর ধারে ভুই (জমি) নেই সে বড় কিষেন। (অজানা বিষয়ে অবজ্ঞা দেখানো)

১০৫. যে গাছটা বাড়ে তার পাতা দেখলি বুঝা যায়। (বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষায় সতর্ক দৃষ্টি জরুরি)

১০৬. ল্যাপ নেই ক্ষ্যাতা নেই মদ্দি শুয়ার আউস। (যে যা না পারে তাই সে করতে চায়)

১০৭. হক কথার ভাত নেই। (সত্য বললে অপ্রিয় হয়)।[১]

লোহাগড়া উপজেলা প্রবাদ-প্রবচন

১. পিঁড়েয় বসে পেড়োয় খবর (সংক্ষেপে খবর নেওয়া, পেড়োয়-পাড়ার খবর, পিঁড়ে-বসার জন্য কাঠ দিয়ে তৈরি।)

২. ভিক্ষের চাল কাড়া আর আকাড়া (দান সহজে গ্রহণ করা, কাড়া-পরিষ্কার করা।)[২]

৩. সতীন নেই সতীনের পিঁড়ে আছে, তয়সেন সতীন খাড়া আছে (শত্রুতা বোঝাতে, তয়সেন-তারপরেও, খাড়া-দাঁড়ানো।)

৪. বুঝলিনারে ফেলি, বুঝবিরে দিন গেলি (সময়ের কাজ সময়ে করতে বোঝাতে)।[৩]

৫. হাইসে না বুড়োর দুঃখ দেহে, এ বুড়োর সাত ছুয়াল (বেহিসাব বোঝাতে, হাইসে না-না হাসা, দেহে-দেখা।)[৪]

৬. দেবি কাইও। (ব্যঙ্গক্তি, অর্থ দেবি-গ্রামের নাম, কাইও-কাক।)

৭. রায়গার স্যার (বে-হিসেবি ওজন মাপার যন্ত্র, স্যার-বেতের তৈরি মাপের যন্ত্র।)[৫]

৮. তিন বিটি যে জাগায়, রায়গার হাট সেই জাগায় (একাধিক মহিলা কোলাহল তৈরি করে, বিটি-মহিলা, রায়গা-রায়গ্রাম।)[৬]

৯. বেলটের দুলো মিয়া (অকর্মণ্য বুঝাতে, বেলটে-গ্রামের নাম। দুলো মিয়া-জামাই।)[৭]

১০. সাপ, শালা, জমিদার তিন নয় আপনার (সতর্কতা বুঝাতে)[৮]

১১. কুটুমের মধ্যে মামা, ধানের মধ্যে খামা (উত্তম সম্পর্ক বুঝাতে, খামা-দেশজ ধান।)[৯]

www.pathagar.com

১২. আত্মীয়ের মদ্যি ভাইরা, মাছের মদ্যি খয়রা (মজার সম্পর্ক বুঝাতে, মদ্যি-মধ্যে, খয়রা-এক জাতীয় মাছের নাম।[১০]

তথ্যনির্দেশ

১. গোলাম রহমান, কালিয়া, নড়াইল; বাবর আলী দারোগা, বড়দিয়া, কালিয়া, নড়াইল; শুকুরোন বিবি, কলাবাড়িয়া, কালিয়া, নড়াইল; লাইলী বেগম, স্বামী- মৃত আব্দুর রহমান সরদার, রঘুনাথপুর, কালিয়া, নড়াইল; নিলুয়ার রহমান, বাগডাঙ্গা, সদর, নড়াইল, আঞ্জুমান আরা লাভলী, তারাপুর, সদর, নড়াইল; মতিয়ার রহমান, বিলডুমুরতলা, সদর, নড়াইল; সাহিদুল হক, বাগডাঙ্গা, সদর, নড়াইল; আব্দুস সত্তার বয়াতি, সিংগে, লক্ষীপাশা, নড়াইল; রাজীব আহমেদ মিনা, ইতনা, লোহাগড়া, নড়াইল; বকতিয়ার হোসেন, তারাপুর, সদর, নড়াইল; আব্দুর রহমান শেখ, তারাপুর সদর, নড়াইল; ছুট্টু বিবি, স্বামী মৃত জিনাতুল্লা বিশ্বাস, বড়াল সদর, নড়াইল; নিলুফা ইয়াসমিন, রূপগঞ্জ, নড়াইল।

২. সাংবাদিক রিফাত-বিন-ত্বহা, লক্ষীপাশা, লোহাগড়া পৌরসভা, তারিখ : ১৩.০২.১২

৩. নজরুল জমাদ্দার (৫০), চেয়ারম্যান, লাহুড়িয়া ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ১১.০২.১২

৪. জাফর খাঁ (৫০), গোপিনাথপুর গ্রাম, লোহাগড়া পৌরসভা, তারিখ : ২৭.০১.১২

৫. কাঙ্গাল কবি সামসুর রহমান (৬৫), মঠবাড়ি, নলদী ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ০৭.০২.১২

৬. জাফর খাঁ (৫০), গপিনাথপুর গ্রাম, লক্ষীপাশা পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ১০.০২.১২

৭. লোকশিল্পী সরদার গোলাম মোস্তফা (৫৮), কামঠানা, লোহাগড়া ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ০৪ .০২.১২

৮. জাকির হোসেন (৩৯), জয়পুর, লোহাগড়া পৌরসভা, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ০৩.০২.১২

৯. গাউসুল আজম মাসুম (৩৫), ব্রাহ্মণডাঙ্গা, নওয়াগ্রাম ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ২৯.০১.১২

১০. মশিয়ার রহমান (৪৮), মিঠাপুর, নলদী ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ২৫.০১.১২

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে মনোজ ব্যাপার। বস্তু কিংবা বিষয় গুণের ধারণা থেকে বিশ্বাসের সূত্রপাত। বস্তু বিষয়ের কার্যকরণ সম্পর্কে প্রতীতি বা ধারণা যখন সত্য অভিহিত, কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্কে অজ্ঞাত মন যখন বস্তু ভাব বিষয় বা ঘটনার গুণধর্মে অমূলক আস্থা স্থাপন করে এবং তার অলৌকিক ফলাফল সম্পর্কে ধারণা পোষণ করে তখনই এক একটি অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম হয়। কুশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মনই এরূপ বিশ্বাসের ধারক। মনের গভীরে অস্পৃশ্য অবস্থায় কত বিশ্বাসই এমনি করে ভেসে বেড়ায় যেগুলি জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে মানুষের মনকে, জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। কতক লোকবিশ্বাস মানুষের নিত্য জীবনাচরণের সহায়তা পেয়ে স্থায়ী প্রথায় স্বীকৃতি পায়। তবে এগুলি যাই-ই হোক না কেন একেবারে অমূলক নয়। বরং প্রকৃতির নিয়ম ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন বর্ষাকালে মেঘ হতে ২-৪ ঘণ্টা কিংবা ২/১ দিন বর্ষা শেষে আকাশে রংধনু দেখা গেলে লোকের ধারণা হয় যে আর বৃষ্টি হবে না। রংধনু বৃষ্টি প্রতিহত করে না বরং মেঘের জলকনা লঘু হয়ে এলে তাতে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে রামধনুর সৃষ্টি করে। ঘন মেঘে তা দেখা যায় না। এটা বিজ্ঞানসিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম। লোকবিশ্বাসের সঙ্গে এর একটা মিল আছে। গ্রামের মহিলারা অন্ধ বিশ্বাস করেন বাচ্চা প্রসবকালে গর্ভবতী মা নারী যে ঘরে থাকেন সে ঘরের দরজা বন্ধ থাকতে হবে। তা না হলে শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচো পাঁচি রোগে (এক ধরনের ভূতে ধরা) আক্রান্ত হবে। সে জন্য প্রসবিনীকে যে ঘরে প্রসবকালে রাখা হয় অবশ্যই সে ঘরের দরজা বন্ধ রাখা হয়। জন্মের পর যদি কোনো ক্রমে ঐ শিশুর কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় তা হলে পুত্র হলে বলা হয় পাঁচো এবং কন্যা হলে বলা হয় পাঁচতে ধরেছে। সে জন্য ঐ ঘরের আলোবাতাস ঢোকার রাস্তাগুলি কাপড় দিয়ে বন্ধ করে ধুয়ায় ঘর ভর্তি করা হয় এবং তান্ত্রিকের ঝাড়ফুঁকের দ্বারা পাঁচো কিংবা পাঁচিকে তাড়িয়ে শিশুকে সুস্থ করা হয়।

আবার দৈনন্দিন জীবনে নানা প্রয়োজনে মানুষকে বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়, স্থানান্তরে গমনাগমন করতে হয়। সংস্কারপ্রবণ মনে যাত্রা শুভ, কি যাত্রা নাস্তি বিচার করা হয় কতকগুলি জাগতিক বস্তু ও মানবিক ক্রিয়ার চিহ্ন দেখে। মানব মনের বিচিত্র রহস্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে শুভাশুভ বাছবিচার মূল্যবান উপাদান হিসেবে গণ্য হতে পারে। বাঙালির জীবনে কিছু ঘটনা এবং কতক বস্তু শুভাশুভ হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন যাত্রাকালে শূন্য পাত্র দেখা, প্যাঁচার ডাক, কাকের কর্কশ শব্দ ইত্যাদি অশুভ চিহ্ন। আরও বিষয় যেমন আঁটকুড়ে পুরুষ ও রমণীকে দেখা যাত্রা অশুভ। যাত্রাকালে ধান, দূর্বা, কলা হিন্দু রমণীর শাখা সিন্দূর ইত্যাদি দেখলে যাত্রা শুভ হিসেবে গণ্য করা হয়।

সংসার জীবনযাত্রার পথে ঘরের বাইরে আশ্রয়হীন মানুষের চোর ডাকাতের উপদ্রব, হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শ্রম, ক্লান্তি, অসুখ-বিসুখ, দৈব–

www.pathagar.com

দুর্বিপাক, আকস্মিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি নিত্য জীবনের অভিজ্ঞতার বিষয়। এ ক্ষেত্রে মানুষ মানসিক জোর সঞ্চয়ে দৈবনির্ভর হয় এবং ঘর হতে বের হবার সময় কারো মা কিংবা স্ত্রী কাপড়ের কোনো অংশে কয়লা বেঁধে দেয় বিশ্বাস হলো কয়লা থাকলে খারাপ ওয়াসওয়াসা থেকে মানুষ নিষ্কৃতি পাবে। কিংবা যাত্রী নিজেই স্রষ্টার নাম স্মরণ করে তিনবার বুকে ফুঁক দিয়ে বাইরে পা বাড়ায়। বিশ্বাস হলো তার শরীর বিপদমুক্ত হলো। রাতে কাক ডাকলে কারো না কারো মৃত্যু নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া হয়। দিনের বেলা শৃগাল ডাকলে অনিবার্য বিপদের আশঙ্কা হয়। কুকুর যদি কান্নার স্বরে ডাকাডাকি করে তবে অনিবার্য বিপদ আশঙ্কা করা হয়।

নতুন চাঁদ উদয় কালে চন্দ্র যদি বামদিকে হেলে ওঠে তা হলে আগামী বছর কষ্টে যাবে আমন ফসল ভালো হবে না ইত্যাদি আশঙ্কা করা হয়। রাতের বেলা প্যাঁচার ডাকে শিশু সন্তানের নিশ্চিত অমঙ্গলের আশঙ্কা বলে ধরা হয়। এমনি করে লোক বিশ্বাস সম্পর্কে গ্রামের মানুষের মাঝে অনেক শ্লোক প্রচলিত আছে। পর্যায়ক্রমে সেগুলি আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো। তবুও বলা যায় লোক সংস্কার বিজ্ঞানের পথ ধরে চলে না। দুর্বল মন অমূলকভাবে তা বিশ্বাস করে এবং অকারণেই তা মনে লালন করে। এসবই মানুষের লোক জীবনের অংশ। সে কারণেই এগুলি অকারণ হলেও প্রয়োজন বলে মানুষের গ্রহণ বর্জনের ধারাবাহিকতার ইতিহাসের এ পর্যায়ে বর্ণনা না পেলে পরবর্তী পর্যায় নিরূপণ করা কঠিন।[১]

লোকসংস্কার

এ অঞ্চলে প্রধানত হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অনুসারীরা বসবাস করে। এখানে এ দুটি ধর্মের মানুষ তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি, বিধিনিষেধ পালন করলেও নিজেদেরও কিছু লোকবিশ্বাস রয়েছে এবং এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে কিছু কার্যাদি সম্পন্ন করে। এখানকার হিন্দু মুসলমান ধর্মের মানুষ জীবন-জীবিকার প্রশ্নে মাছ ধরা, ধান কাটার সময় দূর্বা, ধান, ফুল, আগুন জ্বালানো, মাঙ্গলিক গানসহ একই ধরনের আচার অনুষ্ঠান পালন করে, যাকে লোকধর্ম বলা যেতে পারে। লক্ষ্মীপাশার রামপুরা এলাকায় পির ফেজু দেওয়ান শাহ্-এর মাজারের পাশে একটি বট গাছে হিন্দু ও মুসলমানেরা রোগব্যাধি ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সুতা বা দড়িতে ইটের টুকরা বা ভারী জাতীয় কিছু বেঁধে পিরের নামে মানত করে। রোগব্যাধি সেরে গেলে তারা একটি মোরগ বা মুরগি পিরের মাজারে দান করবে। যদি কোনো মানতকারী এই মুরগি আনার সময় অন্য কোনো ব্যক্তি এই মোরগ বা মুরগি কিনতে চায় বা দাবি করে তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে তা দান করতে হবে। ভক্তবৃন্দের বিশ্বাস এতেই তার পুণ্যি হবে। আবার এড়েন্দাসহ কয়েকটি অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনসা পূজার দিন কোনো কোনো মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ হিন্দু বাড়িতে একটি ঘট বা পাত্রে দুধ দিয়ে যেত মনসার পূজার জন্য বা সাপকে সন্তুষ্টি করার জন্য। এখনও এ অঞ্চলে বিভিন্ন ওরস অনুষ্ঠানে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদের পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষও অংশগ্রহণ করে থাকেন।

নলদী ইউনিয়নের নলদী বাজারের সামান্য পশ্চিমে একটি ঈদগাহ, গোরস্থান ও একটি দরগাহের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। জানা যায়, চার শতাধিক বছর পূর্বে খান জাহান

www.pathagar.com

আলী পিরের সঙ্গী সাথীদের গাজি উপাধিধারী জনৈক ব্যক্তি এই নলদীতে তার আবাসস্থল নির্মাণ করে বসবাস করতেন। দীর্ঘকাল তার বংশধরেরা এই স্থানে বসবাস করার পর তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এসময় গাজির শেষ বংশধর নলদী গ্রামে বসবাসরত এক হিন্দু কুরি (ভৌমিক) পরিবারকে ঈদগাহ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে চলে যান এবং এর জন্য কিছু নিষ্কর জমি দিয়ে যান। আজও কুরি (ভৌমিক) পরিবার নিষ্ঠার সাথে প্রতি বছর এই ঈদগাহে ঈদের নামাজের পর মুসল্লিদের সিন্নি খাইয়ে থাকেন। বর্তমানে এ দায়িত্ব পালন করছেন মৃত লক্ষ্মীনারায়ণ কুরির কন্যা সন্ধ্যা রানি ভৌমিক (৬০)। এটাও অনেকটা লোকধর্মের মধ্যেই পড়ে। লাহুড়িয়া ইউনিয়নের লাহুড়িয়া ফাজিল মাদ্রাসার সামনে জনৈক পাগল পিরের মাজারে হিন্দু-মুসলিম সবাই বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সমস্যা ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পিরের নামে মানত করে।[২]

লোহাগড়া উপজেলার লোকবিশ্বাস

এখানকার গ্রামীণ মানুষের জীবনযাপনে এখনও অসংখ্য লোকবিশ্বাস রয়েছে। ঘর থেকে এক পা ফেলতে গেলেই এখানকার মানুষ কমবেশি সংস্কার বা লোকবিশ্বাস মেনে চলে। যেমন : ফলবান শাকসবজি ও শস্য ক্ষেতে কঙ্কালের ছবি এঁকে, (স্থানীয়ভাবে অনেকে কাকতাড়ুয়া বলে) মৃত গরুর চোয়াল বা শ্বাসনালি বা হাড় ঝুলিয়ে রাখার রেওয়াজ আছে। বিশ্বাস রয়েছে এসব ঝুলিয়ে রাখলে কেউ এসব গাছে কুনজর দিতে পারবে না। যাত্রাপথে পেছন থেকে কাউকে ডাকতে নেই। ডাহুক (এক প্রকার নিশাচর পাখি), বুতুম পেঁচা, কুকুর করুণ সুরে ডাকলে বাড়ির অমঙ্গল হয়। দাঁড়কাক ডাকলে অমঙ্গল হয়। রাতে গৃহস্থালীর কোনো জিনিস যেমন-বটি, লবণ, চাউল, হলুদ কাউকে দেওয়া নিষেধ। রাতে ঘর ঝাড়ু দিতে হয় না। এঁটো খাবার, এঁটো পানি ফেলতে নেই। ভোরে কাউকে ভিক্ষা দিতে নেই। শনি ও মঙ্গলবারে কোথাও যাত্রা, বিবাহ বা শুভ কাজ সবাই এড়িয়ে চলে। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় কিছু খাওয়া ঠিক নয়। বিশেষ করে গর্ভবতী নারীরা এসময় তরিতরকারি, মাছ, মাংস কোনো কিছু কোটা-বাটা করে না। এক শালিক দেখলে দুর্ঘটনা, দুই শালিক দেখলে যাত্রা শুভ, তিন শালিক দেখলে বাড়িতে আত্মীয় আসে। বেড়ালে বেড়ালে মুখ চুলকালে, চুল আঁচড়াতে গিয়ে চিরুনি পড়ে গেলে, কুটুম (অর্থ : আত্মীয়) পাখি (এক প্রকার হলুদ পাখি) ডাকলে বাড়িতে আত্মীয় আসে। অনেকে ভয় পেলে লোহা গরম করে সেই পানি খাওয়ায়। আবার অনেকে বুকে থু থু দেয়।

সংস্কার রয়েছে রাতের বেলায় ঘর ঝাড়ু বা পরিষ্কার করতে হয় না এবং ময়লা বাইরে ফেলতে হয় না। এতে পরিবারের অমঙ্গল হয়। খাওয়ার সময় প্লেটের দুই স্থানে ভুল করে লবণ নিলে বাড়িতে আত্মীয় আসার সম্ভাবনা থাকে। বৃহস্পতিবারে গ্রামের মুসলমানেরা এই দিন বিয়ে বা শুভ কাজ করে না। আবার বাঁশও কাটে না। তবে ফকির, তান্ত্রিক, কালীর সাধক, কবিরাজরা তদ্বির, ঝাড়ফুঁক দেয় শনি ও মঙ্গলবারে। আবার পৌষ মাসের শেষের দিন কোনো কোনো গ্রামে নতুন ধানের চাউল কুটে সেই গুড়ো নরম করে গরুর গায়ে ছাপ দেওয়া হয়। এখানকার মানুষের বিশ্বাস এই ছাপ দিলে সারা বছর গরুর আর কোনো অসুখ হবে না। নোয়াগ্রাম, কাশিপুর অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা সপ্তাহে শুক্র, সোম ও বুধবারে বাঁশ কাটে। এছাড়া অন্য দিনে বাঁশ কাটে না।

www.pathagar.com

চৈত্র মাসে গাছ লাগানো যায় না। লাগালে অশুভ হয়। আবার আষাঢ় মাসে কলা গাছ লাগানো যায় না। ইতনাসহ কয়েকটি গ্রামের মানুষ পৌষ মাসের শেষ দিন থেকে পলো নিয়ে বিভিন্ন বিলে মাছ ধরা শুরু করে। তবে মাছ ধরতে যাওয়ার পূর্বে তারা কিছু লোকবিশ্বাস পালন করেন। যেমন-ঘরের চারকোনার চাল থেকে চারবার চার নিশ্বাসে কিছু ছন তুলে উঠানের মাঝখানে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং পলোগুলো আগুনে ছেঁক দেয়। তাদের বিশ্বাস এতে প্রচুর মাছ ধরা পড়বে। প্রতি বছর লাহুড়িয়া, নওয়াগ্রম ও নলদী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে এঁড়ে লড়াই ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। মজার ব্যাপার হলো প্রত্যেক ঘোড়া ও এঁড়ে মালিক লড়াইয়ের সময় একজন করে ফকির রাখেন। ফকিরের কাজ হলো নিজ ঘোড়া ও এঁড়েকে তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে আরও বেশি শক্তি বৃদ্ধি করা এবং অন্য কোনো ফকির তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে যাতে তাদের পক্ষের ঘোড়া ও এঁড়েকে বান বা জাদু-টোনা করতে না পারে বা ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য মন্ত্র পাঠ ও ঝাড়ফুঁক দেওয়া। এসব লড়াইয়ে হার-জিতের পেছনে ফকিরদের তন্ত্রমন্ত্রের হাত রয়েছে বলে ঘোড়া ও এঁড়ে মালিকদের বিশ্বাস রয়েছে।[৩]

কালিয়া উপজেলার লোকাচার

জন্মমৃত্যু-বিবাহকে নিয়ে যে জীবন সে জীবনে জন্মকে নিয়ে যেমন লোকাচার আছে, তেমনি মৃতের সৎকার অর্থাৎ শবদাহ করা বিষয়েও আছে লোকাচার। আগে শবদেহকে নগ্ন করে চিতায় তুলে দেয়া হতো এবং হাঁটু ভেঙে দেয়া হতো। এখন শবদেহকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে বর কিংবা বধূবেশে চিতায় তুলে দেয়া হয়। পা আর ভাঙা হয় না। প্রতিবেশী অন্য ধর্মের মানুষদের কাছ থেকে এ বিষয়টি হিন্দুদের মধ্যে সংক্রমণ ঘটে থাকবে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে পূর্বোক্ত নমশূদ্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘোষ সম্প্রদায়ের একটা ভিন্নতা হলো তাঁরা দিনে তিনবার খাদ্য গ্রহণ করেন।

তিল বপনের সময় একটি নতুন হাঁড়ির গলায় ফুলের মালা দিয়ে তার মধ্যে তিল রেখে ছড়ানো হয়। বীজ বপন শেষে কেউ হাঁড়িটি ভেঙে ফেলে, কেউ বা রেখে দেয়। এ লোকাচারটি আরও অনেক জনসমষ্টির মধ্যে প্রচলিত আছে।

তথ্যনির্দেশ

১. রেজা কবিরাজ, মির্জাপুর, নড়াইল, তারিখ : ২২.০১.১২

২. মলয় নন্দী (৫২), সহকারী অধ্যাপক, আব্দুল হাই ডিগ্রি কলেজ, নড়াইল। স্থায়ী ঠিকানা : এড়েন্দা গ্রাম, কাশিপুর ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা। (বর্তমান ঠিকানা : মহিষখোলা নড়াইল শহর, নড়াইল)। রেজাউল ইসলাম (৩৮), উপজেলা প্রতিনিধি, দৈনিক সমকাল, লোহাগড়া, সন্ধ্যা রানি ভৌমিক (৬০), পিতা : মৃত লক্ষ্মী নারায়ণ কুরি, নলদী গ্রাম, নলদী ইউনিয়ন, লোহাগড়া উপজেলা, সংগ্রহের তারিখ : ২৬.০১.১২

৩. শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস (৫২), ইতনা, ইতনা ইউনিয়ন, লোককবি ইউনুস শেখ, দিঘলিয়া, দিঘলিয়া ইউনিয়ন, নিখিল বাইন (৫০), গ্রাম : চালিঘাট, কাশিপুর ইউনিয়ন, সাংবাদিক সিদ্দিকুর রহমান (৪৩) লোহাগড়া বাজার, লোহাগড়া পৌরসভা লোহাগড়া উপজেলা, তারিখ : ২২.০১.১২

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

সৃষ্টির প্রথম থেকে যখন মানুষের আবির্ভাব তখন হতে মানুষ ব্যক্তিগত, সংসার, সমাজের প্রয়োজনে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহারে যত্নবান। কোনো প্রযুক্তি যখন সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে তখন তা লোকপ্রযুক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। সাধারণত সংসারের কাজে, কৃষিকাজে, মাছ ধরার কাজে, সাধারণ পোশাক নির্মাণের কাজসহ বিভিন্ন কাজে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় নড়াইলেও বিভিন্ন ধরনের লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার দেখা যায়। তবে সাধারণত কাঠ, লোহা, বাঁশ, বেত, মাটি ইত্যাদি উপকরণে তৈরি বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র নড়াইলের লোকসমাজে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

নৌকা

নড়াইল উপজেলায় নৌকার ব্যবহার প্রায় উঠে গেছে। তারপরও মাছ ধরা বা কিছু আমন ধান কাটার কাজে এখনও কিছু নৌকা লোকপ্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যবহৃত নৌকাগুলোকে ডিঙি নৌকা বলে। ভদ্রবিলা ইউনিয়নের রামসিদ্ধি গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু লোক বর্ষা মৌসুম আসার আগে আগে সাধারণ কিছু গাছের কাঠ দিয়ে নৌকা তৈরি করে এবং এগুলি স্থানীয় পেড়লী, গাজিরহাট, আবালগাতি ইত্যাদি হাটে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এ যন্ত্রটি বা হাতিয়ারকে রায়দা বলে। প্রথমে গাছ কেটে ছয় ফুট, সাত ফুট, আট ফুট, আড়াই ফুট ইত্যাদি প্রয়োজনীয় মাপের তক্তা তৈরি করা হয়। এ গাছ থেকে দুই পাশের তক্তাগুলিকে সংযুক্ত রাখার কাজে ব্যবহৃত গুরো-এর সাইজ কাঠ, গলাই এর জন্য সাইজ কাঠ এবং নৌকার দুই পাশের ডালির জন্য সাইজ কাঠ তৈরি করা হয়। বিশেষ করে ডালির সাইজ কাঠ দুইপাশে মাথা বেঁধে প্রয়োজনমতো বাঁকা করে ২-৪ দিন রাখা হয়। এটাকে স্থানীয়ভাবে যাতা দিয়ে রাখা বলে। কাঁচা কাঠের রস কোনোরকম একটু শুকালে রায়দা দিয়ে একজন পিছনে একজন সামনে থেকে টেনে তক্তা ও সাইজ কাঠগুলি মোটামুটি উপরের ছোবড়া ছাড়িয়ে সমান করা হয়। এরপর সবচেয়ে বড় সাইজ কাঠটি যেটি নৌকার নিচে সেট করে পিছনের দিক এবং সামনের দিকে গলাই সেট করে দুই পার্শ্বই টিক দিয়ে উঁচু করে রেখে দেয়া হয়। এই প্রথম স্থাপিত কাঠটির নাম দাঁড়ার কাঠ। এরপর লোহার পাতাম দিয়ে দাঁড়ার কাঠের সঙ্গে কাঠের তক্তা জুড়ে দেয়া হয়। পর পর তক্তা জুড়ে দিতে অনেক পাতামের ব্যবহার হয়। পাতাম ব্যবহারের জন্য তক্তায় গ্রুপকাটা হয়। এটাকে বাইন কাটা বলে। তক্তা জুড়ে জুড়ে উপরের দিকে আগা মাথায় ৮-১০টা গুরো আড়াআড়ি গ্রুপ কেটে সেট করা হয়। এরপর নৌকা তৈরি হলে ডালির সাথে অতিরিক্ত একটা কাঠ সংযুক্ত করা হয়। পিছনে ও সামনে গলাইয়ের পাশে তক্তা দিয়ে পাটাতন তৈরি করা হয়। এভাবেই একটা নৌকা সম্পূর্ণ হয়।

www.pathagar.com

নৌকা

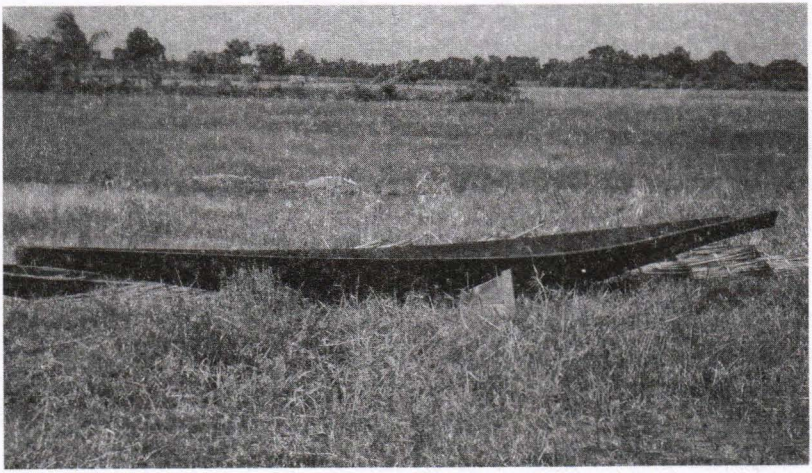

ছবিতে ডিঙ্গি নৌকা দেখা যাচ্ছে

www.pathagar.com

২. তাঁতে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তি

ক. মাকু
তাঁত তৈরির জন্য সাধারণত মাকু (সুতাকে আড়াআড়ি ভাবে চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়)।

খ. বোয়া
বোয়া (সুতাকে উপর নিচে করার কাজে ব্যবহৃত হয়)।

গ. সানা
সানা (তাঁতের মাঝে এদিক ওদিক ঘুরে কাপড় তৈরি করে)।

ঘ. নারাজ
নারাজ (তাঁতকে ধরে রাখে)।

ঙ. চরকা
চরকা (সূতা গোছানোর কাজে ব্যবহৃত হয়)।

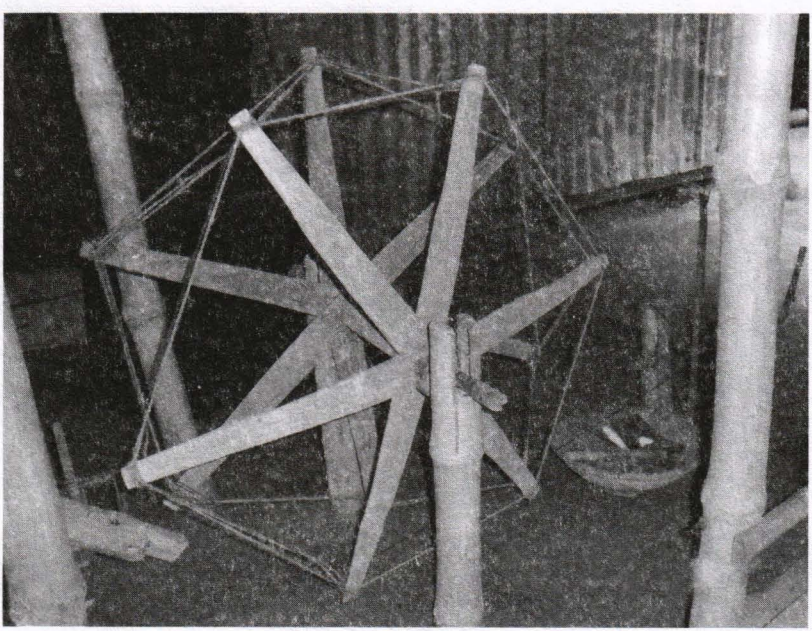

তাঁত শিল্পে ব্যবহৃত সূতা গোছানোর চরকা

www.pathagar.com

৩. ঢেঁকি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে ধান ভাঙার বৈদ্যুতিক বাল্‌ব আবিষ্কার হলেও, প্রাচীনকাল থেকে বাংলার মানুষ ধান ভাঙাসহ পিঠার গুড়ির জন্যে ঢেঁকি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অল্প খরচে সুতাররা এই প্রযুক্তির আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত। এখনও সুতাররা ঢেঁকি তৈরি করে থাকে। এক সময় গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরেই ঢেঁকি ব্যবহৃত হতো।

কাঠের তৈরি ঢেঁকি

৪. মাছ ধরার লোকপ্রযুক্তি

মাছ ধরার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে।

ফাইড়ো, দুয়াড়, ঘুনি, চারো ইত্যাদি হাটে বিক্রয়ের অপেক্ষা

www.pathagar.com

বিভিন্ন প্রকারের মাছ ধরার লোক প্রযুক্তি

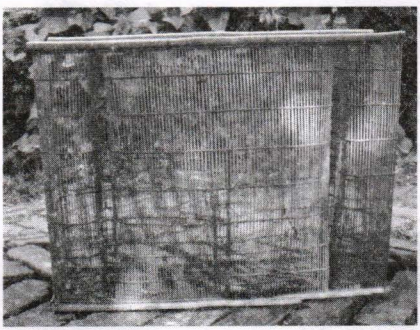

মাছ ধরার ঘুনি

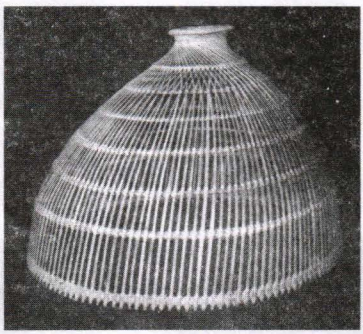

মাছ ধরা পলো

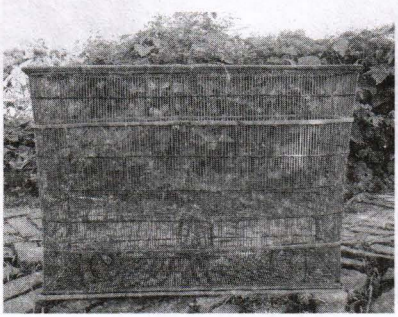

মাছ ধরার ফাইড়ো

মাছ ধরার খাদুম

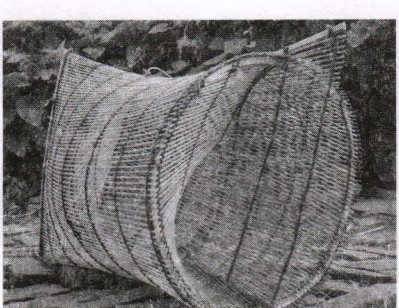

মাছ ধরার দুয়োড়

মাছ জিইয়ে রাখার গাইজে

www.pathagar.com

৫. লৌহজাত লোকপ্রযুক্তি

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে লৌহজাত লোকপ্রযুক্তি। নড়াইলেও ব্যতিক্রম নয়। এ অঞ্চলেও চাষাবাদসহ নিত্যনৈমিত্তিক কাজে ব্যবহারের জন্যে রয়েছে কামারের তৈরি কোদাল, দা-সহ বিভিন্ন ধরনের লোকপ্রযুক্তি।

দা, কাচি, কোদাল, কুড়াল বাটি, সাবল, শিকল, ফুলকুচি
ইত্যাদি বিক্রির জন্য রাখা

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী